শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ

(সাধকভাব)

স্বামী সারদানন্দ প্রণীত।

১৫ই ফাল্গুন, ১৩২০

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

কলিকাতা
১২, ১৩ নং গোপাল চন্দ্র নিয়োগীর লেন,
উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে
ব্রহ্মচারী কপিল
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা
৬৪-১, ৬৪-২নং সুকিয়া ষ্ট্রীট
লক্ষ্মীপ্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

গ্রন্থ পরিচয়।

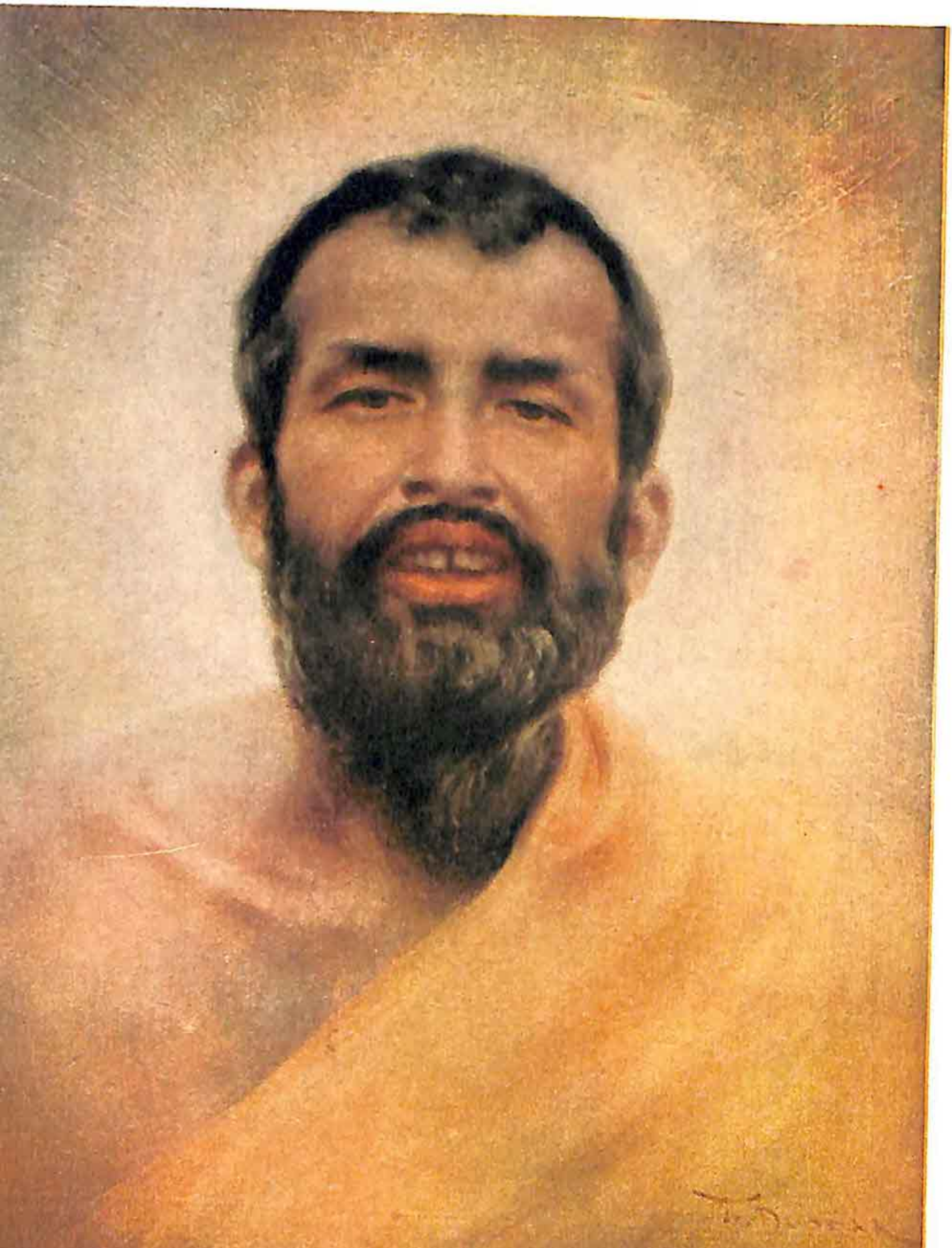
ঈশ্বরেচ্ছায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক সাধকভাবের আলোচনা সম্পূর্ণ হইল। ইহাতে আমরা তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধনানুরাগ এবং সাধনতত্ত্বের দার্শনিক আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই। কিন্তু সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ঠাকুরের জীবনের সকল প্রধান ঘটনাগুলির সময় নিরূপণপূর্ব্বক ধারাবাহিক ভাবে পাঠককে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। অতএব সাধকভাবকে ঠাকুরের সাধক-জীবনের এবং স্বামী শ্রীবিবেকানন্দপ্রমুখ তাঁহার শিষ্যসকল তাঁহার শ্রীপদ-প্রান্তে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত জীবনের ইতিহাস বলা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া আমরা ঠাকুরের জীবনের সকল ঘটনার সময় নিরূপণ করিতে পারিব কি না তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দিহান ছিলাম। ঠাকুর তাঁহার সাধক-জীবনের কথাসকল আমাদিগের অনেকের নিকটে বলিলেও, উহাদিগের সময় নিরূপণ করিয়া ধারাবাহিক ভাবে কাহারও নিকটে বলেন নাই। তজ্জন্য তাঁহার ভক্তসকলের মনে তাঁহার জীবনের ঐকালের কথাসকল দুর্ব্বোধ্য ও জটিল হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু অনু-সন্ধানের ফলে আমরা তাঁহার কৃপায় এখন অনেকগুলি ঘটনার যথার্থ সময়নিরূপণে সমর্থ হইয়াছি।

ঠাকুরের জন্ম-সাল লইয়া এতকাল পর্য্যন্ত গণ্ডগোল চলিয়া আসিতে-ছিল। কারণ, ঠাকুর আমাদিগকে নিজ মুখে বলিয়াছিলেন, তাঁহার যথার্থ জন্মপত্রিকাখানি হারাইয়া গিয়াছিল এবং পরে যে খানি করা হইয়াছিল, সেখানি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। একশত বৎসরেরও অধিক কালের পঞ্জিকাসকল সন্ধানপূর্ব্বক আমরা এখন ঐ বিরোধ মীমাংসা করিতেও সক্ষম হইয়াছি, এবং ঐজন্য ঠাকুরের জীবনের ঘটনাগুলির সময় নিরূপণ করা আমাদের পক্ষে সুসাধ্য হইয়াছে। ঠাকুরের ৺ষোড়শী পূজা সম্বন্ধে সত্যঘটনা কাহারও এতদিন জানা ছিল না। বর্ত্তমান গ্রন্থপাঠে পাঠকের ঐ ঘটনা বুঝা সহজ হইবে।

পরিশেষে, শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থখানি লোক-কল্যাণ সাধন করুক, ইহাই কেবল তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা। ইতি—

প্রণত,—গ্রন্থকার।

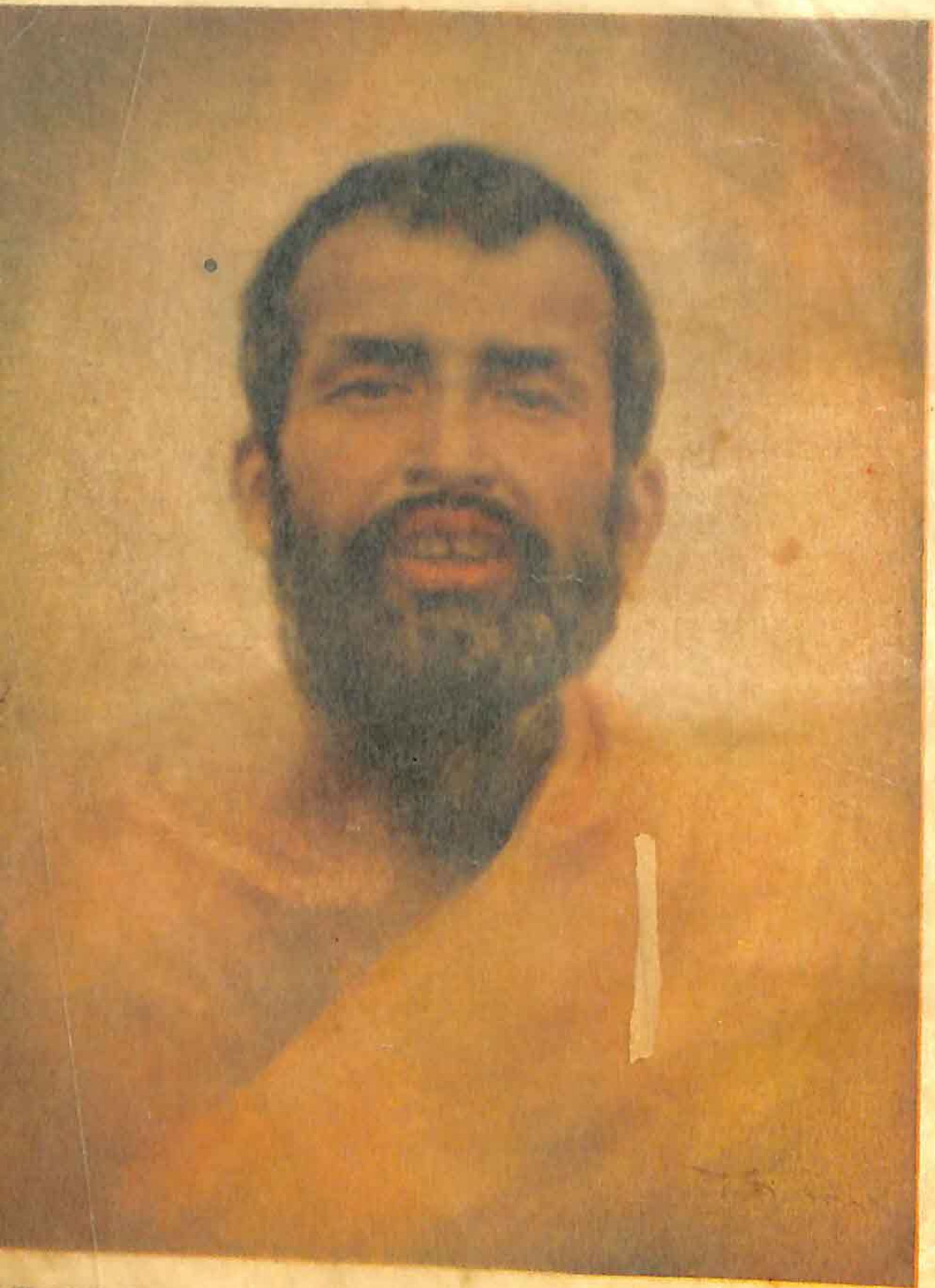


MR. FRANT. DVORAK

PRAGUE.

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।



MR. FRANT. DUSHER
PRAGUE

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিষয় | পৃঃ পৃঃ পৃঃ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

বিষয়। পৃঃ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

অবতরণিকা।

সাধকভাবালোচনার প্রয়োজন।

আচার্য্যদিগের সাধক-ভাব লিপিবদ্ধ পাওয়া যায় না।

জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসপাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, লোকগুরু বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য ভিন্ন অবতার-পুরুষসকলের জীবনে সাধকভাবের কার্য্যকলাপ বিস্তৃত লিপিবদ্ধ নাই। যে উদ্দাম অনুরাগ ও উৎসাহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহারা জীবনে সত্যলাভে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যে আশা, নিরাশা, ভয়, বিস্ময়, আনন্দ, ব্যাকুলতার তরঙ্গে পড়িয়া তাঁহারা কখনও উল্লসিত এবং কখনও মুহ্যমান হইয়াছিলেন অথচ নিজ গন্তব্যলক্ষ্যে নিয়ত দৃষ্টি স্থির রাখিতে বিস্মৃত হন নাই, তদ্বিষয়ের বিশদ আলোচনা তাঁহাদিগের জীবনেতিহাসে পাওয়া যায় না। অথবা, জীবনের শেষভাগে অনুষ্ঠিত বিচিত্র কার্য্যকলাপের সহিত তাঁহাদিগের বাল্যাদি কালের শিক্ষা, উদ্যম ও কার্য্যকলাপের একটা স্বাভাবিক পূর্ব্বাপর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে—

বৃন্দাবনের গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাপক দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণে পরিণত হইলেন তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না। ঈশার মহদুদার জীবনে ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বের কথা দুটা, একটা মাত্রই জানিতে পারা যায়। আচার্য্য শঙ্করের দিগ্বিজয়কাহিনীমাত্রই সবিস্তার লিপিবদ্ধ। এইরূপ, অন্যত্র সর্ব্বত্র।

তাঁহারা কোনও কালে অসম্পূর্ণ ছিলেন এ কথা ভক্ত মানব ভাবিতে চাহে না।

ঐরূপ হইবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। ভক্তদিগের ভক্তির আতিশয্যেই বোধ হয় ঐ সকল কথা লিপিবদ্ধ হয় নাই। নরের অসম্পূর্ণতা দেব-চরিত্রে আরোপ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াই তাঁহারা বোধ হয় ঐ সকল কথা লোক-নয়নের অন্তরালে রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন। অথবা হইতে পারে—মহাপুরুষ-চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ মহান্ ভাবসকল সাধারণের সম্মুখে উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়া তাহাদিগের যতটা কল্যাণ সাধিত করিবে, ঐ সকল ভাবে উপনীত হইতে তাঁহারা যে অলৌকিক উদ্যম করিয়াছেন, তাহা ততটা করিবে না ভাবিয়া উহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা তাঁহারা অনাবশ্যক বোধ করিয়াছেন।

ভক্ত আপনার ঠাকুরকে সর্ব্বদা পূর্ণ দেখিতে চাহেন। নর-শরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাতে যে নরসুলভ দুর্ব্বলতা, দৃষ্টি ও শক্তিহীনতা কোনকালে কিছুমাত্র বর্ত্তমান ছিল তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। বালগোপালের মুখগহ্বরে তাঁহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত দেখিতে সর্ব্বদা প্রয়াসী হন এবং বালকের অসম্বদ্ধ চেষ্টাদির ভিতরে পরিণতবয়স্কের বুদ্ধি ও বহুদর্শিতার পরিচয় পাইবার কেবলমাত্র প্রত্যাশা রাখেন না, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং বিশ্বজনীন উদারতা ও প্রেমের সম্পূর্ণ প্রতি-

কৃতি দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠেন। অতএব, নিজ ঐশ্বরিকস্বরূপে সর্ব্বসাধারণকে ধরা না দিবার জন্যই অবতার-পুরুষেরা সাধনভজনাদি মানসিক চেষ্টা এবং আহার, নিদ্রা, ক্লান্তি, ব্যাধি এবং দেহত্যাগ প্রভৃতি শারীরিক অবস্থানিচয়ের মিথ্যা ভাণ করিয়া থাকেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা তাঁহাদিগের পক্ষে বিচিত্র নহে। আমাদের কালেই আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি কত বিশিষ্ট ভক্ত ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি সম্বন্ধে ঐরূপে মিথ্যা ভাণ বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন।

নিজ দুর্ব্বলতার জন্যই ভক্ত ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

ঐরূপ ভাবিলে ভক্তের ভক্তির হানি হয়, এ কথা যুক্তিযুক্ত নহে।

বিপরীত সিদ্ধান্ত করিলে তাঁহার ভক্তির হানি হয় বলিয়াই, বোধ হয় তিনি নরসুলভ চেষ্টা ও উদ্দেশ্যাদি অবতারপুরুষে আরোপ করিতে চাহেন না। অতএব, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। তবে এ কথা ঠিক যে, ভক্তির অপরিণত অবস্থাতেই ভক্তে ঐরূপ দুর্ব্বলতা পরিলক্ষিত হয়। ভক্তির প্রথমাবস্থাতেই ভক্ত ভগবানকে ঐশ্বর্য্যবিরহিত করিয়া চিন্তা করিতে পারেন না। ভক্তি পরিপক্ক হইলে, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ কালে গভীর ভাব ধারণ করিলে, ঐরূপ ঐশ্বর্য্য-চিন্তা ভক্তিপথের অন্তরায় বলিয়া বোধ হইতে থাকে, এবং ভক্ত তখন উহা যত্নে দূরে পরিহার করেন। সমগ্র ভক্তিশাস্ত্র ঐ কথা বারম্বার বলিয়াছেন। দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণমাতা যশোদা গোপালের দিব্য বিভূতিনিচয়ের নিত্য পরিচয় পাইয়াও তাঁহাকে নিজ বালকবোধেই লালন তাড়নাদি করিতে-ছেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে জগৎকারণ ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াও তাঁহাতে কান্তভাব ভিন্ন অন্যভাবের আরোপ করিতে পারিতেছেন না। এইরূপ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

নিকট যাইলেই ঐ অষ্টাবক্র-সংহিতাখানি বাহির করিয়া পড়িতে বলিতেন! অথবা অদ্বৈতভাবপূর্ণ আধ্যাত্মিক-রামায়ণের কোন অংশ পাঠ করিতে বলিতেন। যদি বলিতাম—কখনও কখনও স্পষ্ট বলিয়াছি—"ও বই পড়ে কি হবে? 'আমি ভগবান্', একথা মনে করাও পাপ। ঐ পাপ কথা এই পুস্তকে লেখা আছে। ও বই পুড়িয়ে ফেলা উচিত।" ঠাকুর তাহাতে হাসিতে হাসিতে বলিতেন—'আমি কি তোকে পড়তে বল্‌ছি? একটু পড়ে আমাকে শুনাতে বল্‌ছি। খানিক পড়ে আমাকে শুনা না। তাতে ত আর তোকে মনে করতে হবে না, তুই ভগবান্। কাজেই অনুরোধে পড়িয়া অল্পবিস্তর পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতে হইত।

আবার, স্বামিজীকে ঐভাবে গঠিত করিতে থাকিলেও ঠাকুর, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ তাঁহার অন্যান্য বালকদিগের মধ্যে কাহাকেও সাকারোপাসনা, কাহাকেও নিরাকার সগুণ ঈশ্বরোপাসনা, কাহাকেও শুদ্ধভক্তির ভিতর দিয়া, আবার কাহাকেও বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ভিতর দিয়া, অন্য নানাভাবে ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর করাইয়া দিতেছিলেন; এইরূপে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ বালক ভক্তগণ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট একত্র শয়ন উপবেশন, আহার বিহার ও ধর্ম্মচর্চ্চা প্রভৃতি করিলেও ঠাকুর অধিকারিভেদে তাহাদিগকে নানাভাবে গঠিত করিতেছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর গলরোগে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অদম্য উৎসাহে সকল ভক্তদিগের ধর্ম্মজীবন গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের। আবার, স্বামিজীকে সাধনমার্গের উপদেশ দিয়া এবং তদনুযায়ী

অনুষ্ঠানে সহায়তা মাত্র করিয়াই ঠাকুর ক্ষান্ত ছিলেন না। নিত্য সন্ধ্যার পর অপর সকলকে সরাইয়া দিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া একাদিক্রমে দুই তিন ঘণ্টাকাল ধরিয়া তাঁহার সহিত অপর বালক ভক্তদিগকে সংসারে পুনরায় ফিরিতে না দিয়া কি ভাবে পরিচালিত ও একত্র রাখিতে হইবে তদ্বিষয়ে আলোচনা ও শিক্ষা প্রদান করিতেছিলেন। ভক্তদিগের প্রায় সকলেই ঠাকুরের কথা ও ব্যবহারে ভাবিতেছিলেন ঠাকুর নিজ সঙ্ঘ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই গলরোগরূপ একটা মিথ্যা ভাণ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন—ঐ কার্য্য সুসিদ্ধ হইলেই আবার পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইবেন। কেবল স্বামী বিবেকানন্দ দিন দিন প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছিলেন ঠাকুর যেন ভক্তদিগের নিকট হইতে বহুকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিবার মত সকল আয়োজন ও বন্দোবস্ত করিতেছেন। তিনিও ঐ কথা সকল সময়ে ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

সাধনবলে স্বামিজীর ভিতর তখন স্পর্শসহায়ে অপরে ধর্ম্ম-শক্তি-সংক্রমণ করিবার ক্ষমতার ঈষৎ উন্মেষ হইয়াছে। তিনি মধ্যে মধ্যে নিজের ভিতর ঐরূপ শক্তির উদয় স্পষ্ট অনুভব করিলেও কাহাকেও ঐভাবে স্পর্শ করিয়া ঐ বিষয়ের সত্যাসত্য এপর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করেন নাই। কিন্তু নানাভাবে প্রমাণ পাইয়া বেদান্তের অদ্বৈতমতে বিশ্বাসী হইয়া, তিনি তর্কযুক্তিসহায়ে ঐ মত বালক ও গৃহস্থ ভক্তদিগের ভিতর প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তুমুল আন্দোলনে ঐ বিষয় লইয়া ভক্তদিগের ভিতর কখন কখন বিষম গণ্ডগোল চলিতেছিল। কারণ স্বামিজীর স্বভাবই ছিল, যখনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন তখনি তাহা হাঁকিয়া ডাকিয়া সকলকে বলিতেন এবং তর্কযুক্তিসহায়ে

জোর করিয়া উহা অপরকে গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিতেন। ব্যবহারিক জগতে সত্য যে, অবস্থা ও অধিকারিভেদে নানা আকার ধারণ করে বালক স্বামিজী তাহা তখনও বুঝিতে পারেন নাই।

আজ ফাল্গুনী শিবরাত্রি। বালক-ভক্তদিগের মধ্যে তিন চারি-জন স্বামিজীর সহিত স্বেচ্ছায় ব্রতোপবাস করিয়াছে। পূজা ও জাগরণে রাত্রি কাটাইবার তাহাদের অভিলাষ। গোলমালে ঠাকুরের পাছে আরামের ব্যাঘাত হয় এজন্য বসতবাটী হইতে কিঞ্চিদ্দূরে পূর্ব্বে অবস্থিত, রন্ধনশালারূপে নির্ম্মিত একটী গৃহে পূজার আয়োজন হইয়াছে। সন্ধ্যার পরে বেশ এক পশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং নবীন মেঘে সময়ে সময়ে মহাদেবের জটা-পটলের ন্যায় বিদ্যুৎপুঞ্জের আবির্ভাব দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইয়াছে।

দশটার পর প্রথম প্রহরের পূজা জপ ও ধ্যান সাঙ্গ করিয়া স্বামিজী পূজার আসনে বসিয়াই বিশ্রাম ও কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন তাঁহার নিমিত্ত তামাকু সাজিতে বাহিরে গমন করিল এবং অপর একজন কোন প্রয়োজন সারিয়া আসিতে বসতবাটীর দিকে চলিয়া গেল। এমন সময় স্বামিজীর ভিতর সহসা পূর্ব্বোক্ত দিব্য বিভূতির তীব্র অনুভবের উদয় হইল এবং তিনিও উহা অদ্য কার্য্যে পরিণত করিয়া উহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বাসনায় সম্মুখোপবিষ্ট স্বামী অ*—কে বলিলেন—'আমাকে খানিকক্ষণ ছুঁয়ে থাক্‌ত।' ইতিমধ্যে তামাকু লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বালক দেখিল স্বামিজী স্থিরভাবে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন এবং অ— চক্ষু মুদ্রিত করিয়া

* অভেদানন্দ।

নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ও তাহার ঐ হস্ত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। দুই এক মিনিটকাল ঐভাবে অতিবাহিত হইবার পর স্বামিজী চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন—'বস্, হয়েছে। কিরূপ অনুভব কর্‌লি ?'

অ। ব্যাটারি (Electric Battery) ধর্‌লে যেমন কি একটা ভিতরে আস্‌ছে জান্‌তে পারা যায় ও হাত কাঁপে ঐ সময়ে তোমাকে ছুঁয়ে সেইরূপ অনুভব হতে লাগল। অপর ব্যক্তি অ—কে জিজ্ঞাসা করিল "স্বামিজীকে স্পর্শ ক'রে তোমার হাত আপনা আপনি ঐরূপ কাঁপ্‌ছিল ?"

অ। "হাঁ, স্থির করে রাখতে চেষ্টা করেও রাখতে পার্‌ছিলুম না !"

ঐ সম্বন্ধে অন্য কোন কথাবার্ত্তা তখন আর হইল না। স্বামিজী তামাকু খাইলেন। পরে সকলে দুই প্রহরের পূজা ও ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। অ— ঐকালে গভীর ধ্যানস্থ হইল। ঐরূপ গভীরভাবে ধ্যান করিতে আমরা তাহাকে ইতিপূর্ব্বে আর কখন দেখি নাই। তাহার সর্ব্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া গ্রীবা ও মস্তক বাঁকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণের জন্য বহির্জগতের সংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইল। উপস্থিত সকলের মনে হইল স্বামিজীকে ইতিপূর্ব্বে স্পর্শ করার ফলেই তাহার এখন ঐরূপ গভীর ধ্যান উপস্থিত হইয়াছে। স্বামিজীও তাহার ঐরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া জনৈক সঙ্গীকে ইঙ্গিত করিয়া উহা দেখাইলেন।

রাত্রি চারিটায় চতুর্থ প্রহরের পূজা শেষ হইবার পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পূজাগৃহে উপস্থিত হইয়া স্বামিজীকে বলিলেন

—ঠাকুর ডাকিতেছেন। শুনিয়াই স্বামিজী বসতবাটীর দ্বিতলগৃহে ঠাকুরের নিকট চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের সেবা করিবার জন্য রামকৃষ্ণানন্দও সঙ্গে যাইলেন।

স্বামিজীকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন—"কিরে? একটু জম্‌তে না জম্‌তেই খরচ? আগে নিজের ভিতরে ভাল ক'রে জম্‌তে দে, তখন কোথায় কি ভাবে খরচ কর্‌তে হবে তা বুঝতে পার্‌বি—মা-ই বুঝিয়ে দেবেন। ওর ভিতর তোর ভাব ঢুকিয়ে ওর কি অপকারটা কল্লি বল দেখি? ও এতদিন একভাব দিয়ে যাচ্ছিল সেটা সব নষ্ট হয়ে গেল!—ছমাসের গর্ভ যেন পাত হল! যা হবার হয়েছে; এখন হ'তে হঠাৎ অমনটা আর করিস্ নি। যা হোক ছোঁড়াটার অদেষ্ট ভাল।

স্বামিজী বলিতেন—"আমি ত একেবারে অবাক্। পূজার সময় নীচে আমরা যা যা করেছি ঠাকুর সমস্ত জান্‌তে পেরেছেন! কি করি—তাঁর ঐরূপ ভর্ৎসনায় চুপ করে রইলুম্।"

ফলে দেখা গেল অ— যে ভাবসহায়ে পূর্ব্বে ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইতেছিল তাহার ত একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাইলই, আবার অদ্বৈতভাব ঠিক্ ঠিক্ ধরা ও বুঝা কালসাপেক্ষ হওয়ায় বেদান্তের দোহাই দিয়া নাস্তিকের মত অযোগ্য বিপরীত অনুষ্ঠান সকল সে কখনও কখনও করিয়া ফেলিতে লাগিল! ঠাকুর তাহাকে এখন হইতে অদ্বৈতভাবের উপদেশ করিতে ও সস্নেহে তাহার ঐরূপ কার্য্যকলাপের ভুল দেখাইয়া দিতে থাকিলেও অ-র ঐভাবপ্রণোদিত হইয়া জীবনের প্রত্যেক কার্য্যানুষ্ঠানে যথাযথভাবে অগ্রসর হওয়া ঠাকুরের শরীর ত্যাগের বহুকাল পরে সাধিত হইয়াছিল।

সত্যলাভ অথবা জীবনে উহার পূর্ণাভিব্যক্তির জন্য অবতার-পুরুষকৃত চেষ্টা সকলকে মিথ্যা ভাণ বলিয়া যাঁহারা গ্রহণ করেন ঐ শ্রেণীর ভক্তদিগকে আমাদিগের বক্তব্য যে, ঠাকুরকে তাঁহাদিগের ন্যায় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আমরা কখনও শুনি নাই। বরং অনেক সময় তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি—'নরলীলায় সমস্ত কার্য্যই সাধারণ নরের ন্যায় হয়; নরশরীর স্বীকার করিয়া ভগবানকে নরের ন্যায় সুখ দুঃখ ভোগ করিতে এবং নরের ন্যায় উদ্যম, চেষ্টা ও তপস্যা দ্বারা সকল বিষয়ে পূর্ণত্ব লাভ করিতে হয়।' জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসও ঐ কথা বলে এবং যুক্তিসহায়ে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐরূপ না হইলে কৃপায় ঈশ্বরকৃত নরবপুধারণের কোন সার্থকতা থাকে না।

নরলীলায় সমস্ত কার্য্য সাধারণ নরের ন্যায় হয়।

ভক্তগণকে ঠাকুর যে সকল উপদেশ দিতেন তাহার ভিতর আমরা দুই ভাবের কথা দেখিতে পাই। তাঁহার কয়েকটী উক্তির উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। দেখা যায়, একদিকে তিনি তাঁহার ভক্তগণকে বলিতেছেন, "(আমি) ভাত রেঁধেছি, তোরা বাড়া ভাতে বসে যা," "ছাঁচ তৈয়ারী হয়েছে তোরা সেই ছাঁচে নিজের নিজের মনকে ফ্যাল্ ও গ'ড়ে তোল্," "কিছুই যদি না পার্‌বি ত আমার উপর বকল্‌মা দে," ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে বলিতেছেন, "এক এক ক'রে সব বাসনা ত্যাগ কর্, তবে ত হবে," "ঝড়ের আগে এঁটো পাতার মত হয়ে থাক," "কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করে ঈশ্বরকে ডাক," "আমি ষোল টাং (ভাগ) করেছি, তোরা এক টাং (ভাগ বা অংশ) কর," ইত্যাদি। আমাদের বোধ হয় ঠাকুরের ঐ দুই ভাবের কথার অর্থ অনেক সময় না বুঝিতে

দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে ঠাকুরের মত।

পারিয়াই আমরা দৈব ও পুরুষকার, নির্ভর ও সাধনের কোন্‌টা ধরিয়া জীবনে অগ্রসর হইব তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন আমরা জনৈক বন্ধুর* সহিত মানবের স্বাধীনেচ্ছা কিছুমাত্র আছে কিনা, এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর উহার যথার্থ মীমাংসা পাইবার নিমিত্ত ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হই। ঠাকুর বালকদিগের বিবাদ কিছুক্ষণ রহস্য করিয়া শুনিতে লাগিলেন, পরে গম্ভীরভাবে বলিলেন—"স্বাধীন ইচ্ছা ফিচ্ছা কারও কিছু কি আছে রে? ঈশ্বরেচ্ছাতেই চিরকাল সব হচ্চে ও হবে। মানুষ ঐকথা শেষকালে বুঝ্‌তে পারে। তবে কি জানিস্ যেমন গরুটাকে লম্বা দড়ি দিয়ে খোঁটায় বেঁধে রেখেছে। গরুটা খোঁটার এক হাত দূরে দাঁড়াতে পারে, আবার দড়ি গাছটা যত লম্বা ততদূরে গিয়েও দাঁড়াতে পারে—মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাটাও ঐরূপ জান্‌বি। গরুটা এতটা দূরের ভিতর যেখানে ইচ্ছা বসুক, দাঁড়াক্ বা ঘুরে বেড়াক্ মনে করেই মানুষে তাকে বাঁধে। তেমনি ঈশ্বরও মানুষকে কতকটা শক্তি দিয়ে তার ভিতরে সে যেমন ইচ্ছা যতটা ইচ্ছা ব্যবহার করুক বলে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই মানুষ মনে কর্‌চে সে স্বাধীন। দড়িটা কিন্তু খোঁটায় বাঁধা আছে। তবে কি জানিস্ তাঁর কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা কল্লে তিনি নেড়ে বাঁধতে পারেন, দড়িগাছটা আরও লম্বা করে দিতে পারেন, চাই কি গলার বাঁধন একেবারে খুলেও দিতে পারেন।"

কথাগুলি শুনিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে মহাশয়,

---

* স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারে ইহাঁর শরীর, ত্যাগ হয়।

সাধন ভজন করাতে ত মানুষের হাত নাই? সকলেই ত বলিতে পারে, "আমি যাহা কিছু করিতেছি সব তাঁহার ইচ্ছাতেই করিতেছি?"

ঠাকুর—মুখে শুধু বল্লে কি হবে রে? কাঁটা নেই খোঁচা নেই মুখে বল্লে কি হবে? কাঁটায় হাত পড়লেই কাঁটা ফুটে 'উঃ' করে উঠতে হবে। সাধন ভজন করাটা যদি মানুষের হাতে থাক্‌ত তবে ত সকলেই তা কর্‌তে পার্‌ত—তা পারে না কেন? তবে কি জানিস্, যতটা শক্তি তিনি তোকে দিয়েছেন ততটা ঠিক্ ঠিক্ ব্যবহার না কর্‌লে তিনি আর অধিক দেন্ না। ঐ জন্যই পুরুষকার বা উদ্যমের দরকার। দেখ্ না, সকলকেই কিছু না কিছু উদ্যম ক'রে তবে ঈশ্বরকৃপার অধিকারী হতে হয়। ঐরূপ কর্‌লে তাঁর কৃপায় দশ জন্মের ভোগটা এক জন্মেই কেটে যায়। কিন্তু (তাঁর উপর নির্ভর করে) কিছু না কিছু উদ্যম কর্‌তেই হয়। ঐ বিষয়ে একটা গল্প শোন—

ঐ বিষয়ে শ্রীবিষ্ণু ও নারদ সংবাদ।

গোলোক-বিহারী বিষ্ণু একবার নারদকে কোন কারণে অভিশাপ দেন যে, তাকে নরক ভোগ কর্‌তে হবে। নারদ ভেবে আকুল। নানা রূপে স্তব স্তুতি করে তাঁকে প্রসন্ন করে বল্লে—আচ্ছা ঠাকুর নরক কোথায়, কিরূপ, কত রকমই বা আছে আমার জান্‌তে ইচ্ছা হচ্চে, কৃপা করে আমাকে বলুন। বিষ্ণু তখন ভুঁয়ে খড়ি দিয়ে স্বর্গ, নরক, পৃথিবী যেখানে যেরূপ আছে এঁকে দেখিয়ে বল্লেন—'এইখানে স্বর্গ, আর এইখানে নরক।' নারদ বল্লে—'বটে? তবে আমার এই নরক ভোগ হল'—বলেই ঐ আঁকা নরকের উপর গড়াগড়ি দিয়ে উঠে ঠাকুরকে প্রণাম কল্লে। বিষ্ণু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, 'সেকি? তোমার নরক ভোগ হ'ল

কৈ ?' নারদ বল্লে—'কেন ঠাকুর তোমারই সৃজন ত স্বর্গ নরক ? তুমি এঁকে দেখিয়ে যখন বল্লে—'এই নরক'—তখন ঐ স্থানটা সত্য সত্যই নরক হ'ল, আর আমি তাতে গড়াগড়ি দেওয়াতে আমার নরক ভোগ হয়ে গেল।' নারদ কথাগুলি প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বল্লে কি না ?—বিষ্ণুও তাই 'তথাস্তু' বল্লেন। নারদকে কিন্তু তাঁর উপর ঠিক ঠিক বিশ্বাস ক'রে ঐ আঁকা নরকে গড়াগড়ি দিতে হ'ল, (ঐ উদ্যমটুকু করে) তবে তার ভোগ কাটল।" এইরূপে কৃপার রাজ্যেও যে উদ্যম ও পুরুষকারের স্থান আছে তাহা ঠাকুর ঐ গল্পটী সহায়ে কখনও কখনও আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন।

মানবের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিয়া অবতার-পুরুষের মুক্তির পথ আবিষ্কার করা।

নরদেহ ধারণ করিয়া নরবৎ লীলায় অবতারপুরুষদিগকে আমাদিগের ন্যায় অনেকাংশে দৃষ্টিহীনতা, অল্পজ্ঞতা প্রভৃতি অনুভব করিতে হয়। আমাদিগেরই ন্যায় উদ্যম করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ সকলের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পথ আবিষ্কার করিতে হয়, এবং যতদিন না ঐ পথ আবিষ্কৃত হয় ততদিন তাঁহাদিগের অন্তরে নিজ দেবস্বরূপের আভাস কখনও কখনও অল্পক্ষণের জন্য উদিত হইলেও উহা আবার প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপে 'বহুজনহিতায়' মায়ার আবরণ স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে আমাদিগেরই ন্যায় আলোক-আঁধারের রাজ্যের ভিতর পথ হাঁত্‌ড়াইতে হয়। তবে, স্বার্থসুখচেষ্টার লেশমাত্র তাঁহাদের ভিতরে না থাকায় তাঁহারা জীবনপথে আমাদিগের অপেক্ষা অধিক আলোক দেখিতে পান এবং অভ্যন্তরীণ সমগ্র শক্তিপুঞ্জ সহজেই একমুখী করিয়া অচিরেই জীবনসমস্যার সমাধানকরতঃ লোককল্যাণসাধনে নিযুক্ত হয়েন।

নরের অসম্পূর্ণতা যথাযথভাবে অঙ্গীকার করিয়াছিলে• ১৭
দেব-মানব ঠাকুরের মানবভাবের আলোচনায় আমাদিগের প্র প্রমু-
কল্যাণ সাধিত হয়, এবং ঐ জন্যই আমরা তাঁহার মানব ভাব সকল সর্ব্বদা পুরোবর্ত্তী রাখিয়া তাঁহার দেবভাবের আলোচনা করিতে পাঠককে অনুরোধ করি। আমাদেরই মত একজন বলিয়া তাঁহাকে না ভাবিলে তাঁহার সাধন কালের অলৌকিক উদ্যম ও চেষ্টাদির কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মনে হইবে, যিনি নিত্য পূর্ণ তাঁহার আবার সত্যলাভের জন্য চেষ্টা কেন? মনে হইবে, তাঁহার জীবনপাতী চেষ্টাটা একটা 'লোক দেখানো' ব্যাপার মাত্র। শুধু তাহাই নহে, ঈশ্বরলাভের জন্য উচ্চাদর্শসমূহ নিজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার উদ্যম, নিষ্ঠা ও ত্যাগ আমাদিগকে ঐরূপ করিতে উৎসাহিত না করিয়া হৃদয় বিষম উদাসীনতায় পূর্ণ করিবে এবং ইহজীবনে আমাদিগের আর জড়ত্বের অপনোদন হইবে না।

মানব বলিয়া না ভাবিলে অবতার-পুরুষের জীবন ও চেষ্টার অর্থ পাওয়া যায় না।

ঠাকুরের কৃপালাভের প্রত্যাশী হইলেও আমাদিগকে তাঁহাকে আমাদিগেরই ন্যায় মানবভাবসম্পন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, ঠাকুর আমাদিগের দুঃখে সমবেদনাভাগী হইয়াই ত আমাদিগের দুঃখমোচনে অগ্রসর হইবেন? অতএব যে দিক দিয়াই দেখ, তাঁহাকে মানবভাবাপন্ন বলিয়া চিন্তা করা ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর নাই। বাস্তবিক, যতদিন না আমরা সর্ব্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নির্গুণ দেব-স্বরূপে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব ততদিন পর্য্যন্ত জগৎকারণ ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরাবতারদিগকে মানবভাবাপন্ন

বদ্ধ মানব, মানব-ভাবে মাত্রই বুঝিতে পারে।

কৈ ?' না
নরক ?
ঐ ~

আমাদিগকে ভাবিতে ও গ্রহণ করিতে হইবে। "দেবো দেবং যজেৎ"—কথাটী ঐরূপে বাস্তবিকই সত্য! তুমি যদি স্বয়ং সমাধিবলে নির্ব্বিকল্প ভূমিতে পৌঁছাইতে পারিয়া থাক, তবেই তুমি ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি ও ধারণা করিয়া তাঁহার যথার্থ পূজা করিতে পারিবে। আর, যদি তাহা না পারিয়া থাক, তবে তোমার পূজা উক্ত দেবভূমিতে উঠিবার ও যথার্থ পূজাধিকার পাইবার চেষ্টামাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে এবং জগৎ-কারণ ঈশ্বরকে বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন মানব বলিয়াই তোমার ধারণা হইতে থাকিবে।

ঐজন্য মানবের প্রতি করুণায় ঈশ্বরের মানব-দেহ ধারণ, সুতরাং মানব ভাবিয়া অবতার-পুরুষের জীবনালোচনাই কল্যাণকর।

দেবত্বে আরূঢ় হইয়া ঐরূপে ঈশ্বরের দেবস্বরূপের যথার্থ পূজা করিতে সমর্থ ব্যক্তি বিরল। আমাদিগের মত দুর্ব্বল অধিকারী উহা হইতে এখনও বহুদূরে অবস্থিত! সেজন্য আমাদিগের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির প্রতি করুণাপরবশ হইয়া আমাদিগের হৃদয়ের পূজা গ্রহণ করিবার জন্যই ঈশ্বরের মানবভূমিতে অবতরণ—মানবীয় ভাব ও দেহ স্বীকার করিয়া দেব-মানব-রূপধারণ! পূর্ব্বপূর্ব্বযুগাবিভূর্ত দেব-মানবদিগের সহিত তুলনায় ঠাকুরের সাধনকালের ইতিহাস আলোচনা করিবার আমাদের অনেক সুবিধা আছে। কারণ, ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার জীবনের ঐ কালের কথা সময়ে সময়ে আমাদিগের নিকট বিস্তৃতভাবে আলোচনা করায় সে সকলের জলন্ত চিত্র আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আবার, আমরা তাঁহার নিকট যাইবার স্বল্পকাল পূর্ব্বেই তাঁহার সাধক-জীবনের বিচিত্রাভিনয় দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীর লোক সকলের চক্ষুসম্মুখে সংঘটিত হইয়াছিল। এবং ঐ সকল ব্যক্তিদিগের

অনেকে তখনও ঐ স্থানে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রমুখাৎ ঐ বিষয়ে কিছু কিছু শুনিবারও আমরা অবসর পাইয়াছিলাম। সে যাহা হউক ঐ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সাধনতন্ত্রের মূলসূত্রগুলি একবার সাধারণভাবে আমাদিগের আবৃত্তি করিয়া লওয়া ভাল। অতএব ঐ বিষয়ে আমরা এখন কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

প্রথম অধ্যায়।

সাধক ও সাধনা।

ঠাকুরের জীবনে সাধকভাবের পরিচয় যথাযথ পাইতে হইলে আমাদিগকে সাধনা কাহাকে বলে তদ্বিষয় প্রথমে বুঝিতে হইবে। অনেকে হয়ত এ কথায় বলিবেন, ভারত ত চিরকাল কোনও না কোনও ভাবে ধর্ম্মসাধনে লাগিয়া রহিয়াছে তবে ঐ কথা আবার পাড়িয়া পুঁথি বাড়ান কেন? আবহমানকাল হইতে ভারত আধ্যাত্মিক রাজ্যের সত্যসকল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে নিজ জাতীয় শক্তি যতদূর ব্যয় করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও করিতেছে পৃথিবীর অপর কোন্ দেশের কোন্ জাতি এতদূর করিয়াছে? কোন্ দেশে ব্রহ্মজ্ঞ অবতারপুরুষসকলের আবির্ভাব এত অধিক পরিমাণে হইয়াছে? অতএব সাধনার সহিত চিরপরিচিত আমাদিগকে ঐ বিষয়ের মূলসূত্রগুলি পুনরাবৃত্তি করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

কথা সত্য হইলেও ঐরূপ করিবার প্রয়োজন আছে। কারণ, সাধনা সম্বন্ধে অনেক স্থলে জনসাধারণের একটা কিম্ভূতকিমাকার

ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য বা গন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য হারাইয়া তাহারা অনেক সময় কেবলমাত্র শারীরিক কঠোরতায়, দুষ্প্রাপ্য বস্তুসকলের সংযোগে, স্থানবিশেষে ক্রিয়াবিশেষের নিরর্থক অনুষ্ঠানে, শ্বাসপ্রশ্বাসরোধে এবং এমন কি অসম্বন্ধ মনের বিসদৃশ চেষ্টাদিতেও সাধনার বিশিষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকে। আবার এরূপও দেখা যায় যে, কুসংস্কার এবং কুঅভ্যাসে বিকৃতপূর্ব্ব মনকে প্রকৃতিস্থ ও সহজভাবাপন্ন করিয়া আধ্যাত্মিক পথে চালিত করিতে মহাপুরুষগণ কখন কখন যে সকল ক্রিয়া বা উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন সেই সকলকেই সাধনা বলিয়া ধারণা পূর্ব্বক সকলের পক্ষেই ঐ সমূহের অনুষ্ঠান সমভাবে প্রয়োজন বলিয়া অনেক স্থলে প্রচারিত হইতেছে! বৈরাগ্যবান্ না হইয়া—সংসারের ক্ষণস্থায়ী রূপরসাদি ভোগের জন্য সমভাবে লালায়িত থাকিয়াও মন্ত্র বা ক্রিয়াবিশেষের সহায়ে জগৎকারণ ঈশ্বরকে মন্ত্রৌষধি-বশীভূত সর্পের ন্যায় নিজ কর্ত্তৃত্বাধীন করিতে পারা যায়, এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেককে বৃথা চেষ্টায় কালক্ষেপ করিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অতএব যুগযুগান্তরব্যাপী অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলে ভারতের ঋষিমহাপুরুষগণ সাধন সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন তাহার সংক্ষেপ আলোচনা এখানে বিষয়-বিরুদ্ধ হইবে না।

সাধনা সম্বন্ধে সাধারণ মানবের ভ্রান্ত ধারণা।

ঠাকুর বলিতেন, "সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন শেষকালের কথা"—সাধনার চরম উন্নতিতেই উহা মানবের ভাগ্যে উপস্থিত হয়। হিন্দুর সর্ব্বোচ্চ প্রামাণ্য শাস্ত্র বেদোপনিষৎ ঐ কথাই বলিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলেন জগতে স্থূল সূক্ষ্ম, চেতন অচেতন যাহা কিছু তুমি দেখিতে পাইতেছ—ইট, কাঠ, মাটী, পাথর,

মানুষ, পশু, গাছ পালা, জীব জানোয়ার, দেব উপদেব—সকলই এক অদ্বয় ব্রহ্মবস্তু। ঐ ব্রহ্মবস্তুকেই তুমি নানারূপে নানাভাবে দেখিতেছ, শুনিতেছ, স্পর্শ, ঘ্রাণ ও আস্বাদ করিতেছ। তাঁহাকে লইয়া তোমার সকল প্রকার দৈনন্দিন ব্যবহার আজীবন নিষ্পন্ন হইলেও তুমি তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতেছ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির সহিত তুমি ঐরূপ করিতেছ! কথাগুলি শুনিয়া আমাদের মনে যে সন্দেহপরম্পরার উদয় হইয়া থাকে এবং ঐ সকল নিরসনে শাস্ত্র যাহা বলিয়া থাকেন, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাহার মোটামুটি ভাবটী পাঠককে এখানে বলিলে উহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা।

সাধনার চরম ফল, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন।

প্র। ঐ কথা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে না কেন?

উ। তোমরা ভ্রমে পড়িয়াছ। যতক্ষণ না ঐ ভ্রম দূরীভূত হয় ততক্ষণ কেমন করিয়া ঐ ভ্রম ধরিতে পারিবে? যথার্থ বস্তু ও অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা বাহিরের ও ভিতরের ভ্রম ধরিয়া থাকি। পূর্ব্বোক্ত ভ্রম ধরিতে হইলেও তোমাদের ঐরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন।

প্র। আচ্ছা ঐরূপ ভ্রম হইবার কারণ কি, এবং কবে হইতেই বা আমাদের এই ভ্রম আসিয়া উপস্থিত হইল?

উ। ভ্রমের কারণ সর্ব্বত্র যাহা দেখিতে পাওয়া যায় এখানেও তাহাই—অজ্ঞান। ঐ অজ্ঞান কখন যে উপস্থিত হইল তাহা কিরূপে জানিবে বল? অজ্ঞানের ভিতর যতক্ষণ পড়িয়া রহিয়াছ ততক্ষণ উহা জানিবার চেষ্টা বৃথা। স্বপ্ন যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয়। নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রদবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই

ভ্রম বা অজ্ঞানবশতঃ সত্য প্রত্যক্ষ হয় না। অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া অজ্ঞানের কারণ বুঝা যায় না।

উহাকে মিথ্যা বলিয়া ধারণা হয়। বলিতে পার—স্বপ্ন দেখিবার কালে কখনও কখনও কোন কোন ব্যক্তির 'আমি স্বপ্ন দেখিতেছি' এইরূপ ধারণা থাকিতে দেখা যায়। সেখানেও জাগ্রদবস্থার স্মৃতি হইতেই তাহাদের মনে ঐ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। জাগ্রদবস্থায় জগৎ প্রত্যক্ষ করিবার কালে কাহারও কাহারও অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর স্মৃতি ঐরূপে হইতে দেখা যায়।

প্র। তবে উপায়?

উ। উপায়—ঐ অজ্ঞান দূর কর। ঐ ভ্রম বা অজ্ঞান যে, দূর করা যায় তাহা তোমাদের নিশ্চিত বলিতে পারি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ উহা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া দূর করিতে হইবে তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

প্র। আচ্ছা; কিন্তু ঐ উপায় জানিবার পূর্ব্বে আরও দুই একটী প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমরা এত লোকে যাহা দেখিতেছি প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাকে তুমি ভ্রম বলিতেছ, আর অল্পসংখ্যক ঋষিরা যাহা বা যেরূপে জগৎটাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই সত্য বলিতেছ—এটা কি সম্ভব হইতে পারে না যে, তাঁহারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহাই ভুল?

জগৎকে ঋষিগণ যেরূপ দেখিয়াছেন তাহাই সত্য। উহার কারণ।

উ। বহুসংখ্যক ব্যক্তি যাহা বিশ্বাস করিবে তাহাই যে সর্ব্বদা সত্য হইবে এমন কিছু নিয়ম নাই। ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ সত্য বলিতেছি কারণ, ঐ প্রত্যক্ষসহায়ে তাঁহারা সর্ব্ববিধ দুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকারে ভয়শূন্য ও চিরশান্তির অধিকারী হইয়াছিলেন এবং নিশ্চিত-মৃত্যু মানবজীবনের সকল প্রকার ব্যবহারচেষ্টাদির একটা উদ্দেশ্যেরও সন্ধান পাইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন যথার্থজ্ঞান, মানবমনে সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা, সন্তোষ, করুণা, দীনতা

প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজির বিকাশ করিয়া উহাকে অদ্ভুত উদারতাসম্পন্ন করিয়া থাকে; ঋষিদিগের জীবনে ঐরূপ অসাধারণ গুণ ও শক্তির পরিচয় আমরা শাস্ত্রে পাইয়া থাকি, এবং তাঁহাদিগের পদানুসরণে চলিয়া যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন তাঁহাদিগের ভিতরে ঐ সকলের পরিচয় এখনও দেখিতে পাই।

অনেকের একরূপ ভ্রম হইলেও ভ্রম কখনও সত্য হয় না।

প্র। আচ্ছা। কিন্তু আমাদের সকলেরই ভ্রম একপ্রকারের হইল কিরূপে? আমি যেটাকে পশু বলিয়া বুঝি তুমিও সেটাকে পশু ভিন্ন মানুষ বলিয়া বুঝ না; এইরূপ, সকল বিষয়েই। এত লোকের ঐরূপে সকল বিষয়ে একই কালে একই প্রকার ভুল হওয়া অল্প আশ্চর্য্যের কথা নহে। পাঁচ জনে একটা বিষয়ে ভুল ধারণা করিলেও অপর পাঁচ জনের ঐ বিষয়ে সত্যদৃষ্টি থাকে, সর্ব্বত্র এইরূপই ত দেখা যায়। এখানে কিন্তু ঐ নিয়মের একেবারে ব্যতিক্রম হইতেছে। এজন্য তোমার কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না!

বিরাট মনে জগৎরূপ কল্পনা বিদ্যমান বলিয়াই মানবসাধারণের একরূপ ভ্রম হইতেছে। বিরাট মন কিন্তু ঐজন্য ভ্রমে আবদ্ধ নহে।

উ। অল্পসংখ্যক ঋষিদিগকে জনসাধারণের মধ্যে গণনা না করাতেই তুমি নিয়মের ব্যতিক্রম এখানে দেখিতে পাইতেছ। নতুবা পূর্ব্ব প্রশ্নেই এ বিষয়ের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। তবে যে, জিজ্ঞাসা করিতেছ সকলের একপ্রকারের ভ্রম হইল কিরূপে?—তাহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন—এক অসীম অনন্ত সমষ্টি-মনে জগৎরূপ কল্পনার উদয় হইয়াছে। তোমার আমার এবং জনসাধারণের ব্যষ্টি-মন ঐ বিরাট মনের অংশ ও অঙ্গীভূত হওয়ায় আমাদিগকে ঐ একই প্রকার কল্পনা অনুভব করিতে হইতেছে। এ জন্যই আমরা

প্রত্যেকে পশুটাকে পশু ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া ইচ্ছামত দেখিতে বা কল্পনা করিতে পারি না। ঐজন্যই আবার যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া আমাদের মধ্যে একজন সর্ব্বপ্রকার ভ্রমের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিলেও অপর সকলে যেমন ভ্রমে পড়িয়া আছে সেইরূপই থাকে। আর এক কথা, বিরাট পুরুষের বিরাট মনে জগৎরূপ কল্পনার উদয় হইলেও তিনি আমাদিগের মত অজ্ঞানবন্ধনে জড়ীভূত হইয়া পড়েন না। কারণ সর্ব্বদর্শী তিনি অজ্ঞানপ্রসূত জগৎ-কল্পনার ভিতরে ও বাহিরে অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুকে ওতঃপ্রোতঃভাবে বিদ্যমান দেখিতে পাইয়া থাকেন। উহা করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের কথা স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। ঠাকুর যেমন বলিতেন—"সাপের মুখে বিষ রয়েছে; সাপ ঐ মুখ দিয়ে নিত্য আহারাদি কর্‌চে; সাপের তাতে কিছু হচ্চে না! কিন্তু সাপ যাকে কামড়ায় ঐ বিষে তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু!"

জগৎরূপ কল্পনা, দেশ-কালের বাহিরে বর্ত্তমান। প্রকৃতি অনাদি।

অতএব শাস্ত্রদৃষ্টে দেখা গেল বিশ্ব-মনের কল্পনাসম্ভূত জগৎটা একভাবে আমাদেরও মনঃকল্পিত। কারণ, আমাদিগের ক্ষুদ্র ব্যষ্টি-মন, সমষ্টীভূত বিশ্ব-মনের সহিত শরীর ও অবয়বাদির ন্যায় অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে নিত্য অবস্থিত। আবার ঐ জগৎ-রূপ কল্পনা যে, এককালে বিশ্বমনে ছিল না পরে আরম্ভ হইল, এ কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ, নাম ও রূপ বা দেশ ও কালরূপ পদার্থদ্বয়,—যাহা না থাকিলে কোনরূপ বিচিত্রতার সৃষ্টি হইতে পারে না—জগৎরূপ কল্পনারই মধ্যগত বস্তু অথবা ঐ কল্পনার সহিত উহারা অবিচ্ছেদ্যভাবে নিত্য বিদ্যমান। স্থিরভাবে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন এবং বেদাদি শাস্ত্র যে কেন সৃজনীশক্তির মূলীভূত কারণ প্রকৃতি বা

মায়াকে অনাদি বা কালাতীত বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইবে। জগৎটা যদি মনঃকল্পিতই হয় এবং ঐ কল্পনার আরম্ভ যদি আমরা 'কাল' বলিতে যাহা বুঝি তাহার ভিতরে না হইয়া থাকে, তবে কথাটা দাঁড়াইল এই যে, কালরূপ কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই জগৎরূপ কল্পনাটা তদাশ্রয় বিশ্ব-মনে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদিগের ক্ষুদ্র ব্যষ্টি-মন বহুকাল ধরিয়া ঐ কল্পনা দেখিতে থাকিয়া জগতের অস্তিত্বেই দৃঢ়ধারণা করিয়া রহিয়াছে এবং জগৎরূপ কল্পনার অতীত অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎদর্শনে বহুকাল বঞ্চিত থাকিয়া জগৎটা যে মনঃকল্পিত বস্তুমাত্র এ কথা এককালে ভুলিয়া গিয়া আপনার ভ্রম এখন ধরিতে পারিতেছে না। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি—যথার্থ বস্তু ও অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা বাহিরের ও ভিতরের ভ্রম ধরিতে সর্ব্বদা সক্ষম হই।

দেশকালাতীত জগৎ-কারণের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টাই সাধনা।

এখন বুঝা যাইতেছে যে, জগৎ সম্বন্ধে আমাদিগের ধারণা ও অনুভবাদি বহুকাল-সঞ্চিত অভ্যাসের ফলে বর্ত্তমানাকার ধারণ করিয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানে উপনীত হইতে হইলে আমাদিগকে এখন নাম রূপ, দেশ কাল, মন বুদ্ধি প্রভৃতি জগদন্তর্গত সকল বিষয়ের অতীত পদার্থের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। ঐ পরিচয় পাইবার চেষ্টাকেই বেদপ্রমুখ শাস্ত্র 'সাধন' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং ঐ চেষ্টা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যে স্ত্রী বা পুরুষে বিদ্যমান তাঁহারাই ভারতে সাধক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, জগদতীত বস্তু অনুসন্ধানের পূর্ব্বোক্ত চেষ্টা, দুইটী প্রধান পথে এতকাল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। প্রথম শাস্ত্র যাহাকে "নেতি, নেতি" বা জ্ঞান-মার্গ

বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং দ্বিতীয়, যাহা 'ইতি, ইতি' বা ভক্তি-মার্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানমার্গের সাধক চরম-লক্ষ্যের কথা প্রথম হইতে হৃদয়ে ধারণা ও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া জ্ঞাতসারে তদভিমুখে দিন দিন অগ্রসর হইতে থাকেন। ভক্তিপথের পথিকেরা চরমে কোথায় উপনীত হইবেন তদ্বিষয়ে অনেক স্থলে অজ্ঞ থাকেন এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্যান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চরমে জগদতীত অদ্বৈতবস্তুর সাক্ষাৎপরিচয় লাভ করিয়া থাকেন। নতুবা জগৎসম্বন্ধে সাধারণ জনগণের যে ধারণা আছে তাহা উভয় পথের পথিকগণকেই ত্যাগ করিতে হয়। জ্ঞানী উহা প্রথম হইতেই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন; এবং ভক্ত উহার কতক ছাড়িয়া কতক রাখিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও পরিণামে জ্ঞানীর ন্যায়ই উহার সমস্ত ত্যাগ করিয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ং' তত্ত্বে উপস্থিত হন। জগৎ সম্বন্ধে উল্লিখিত স্বার্থপর, ভোগসুখৈকলক্ষ্য সাধারণ ধারণার পরিহারকেই শাস্ত্র 'বৈরাগ্য' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'নেতি, নেতি' ও 'ইতি ইতি' সাধনপথ।

নিত্যপরিবর্ত্তনশীল নিশ্চিত-মৃত্যু মানবজীবনে জগতের অনিত্যতাজ্ঞান সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। তজ্জন্য জগৎসম্বন্ধীয় সাধারণ ধারণা ত্যাগ করিয়া 'নেতি, নেতি'-মার্গে জগৎকারণের অনুসন্ধান করা প্রাচীন যুগে মানবের প্রথমেই উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। সে জন্য ভক্তি ও জ্ঞান উভয় মার্গ সমকালে প্রচলিত থাকিলেও ভক্তিপথের সকল বিভাগের সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি হইবার পূর্ব্বেই উপনিষদে জ্ঞানমার্গের সম্যক্ পরিপুষ্টি হওয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

'নেতি নেতি'—নিত্যস্বরূপ জগৎকারণ ইহা নহে, উহা নহে—করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইয়া মানব স্বল্প-কালেই যে, অন্তর্মুখী হইয়া পড়িয়াছিল উপ-নিষৎ এবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। মানব বুঝিয়াছিল বাহিরের অন্য সকল বস্তু অপেক্ষা তাহার নিজ দেহ-মনই তাহাকে সর্ব্বাগ্রে জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে; অতএব, অন্য বস্তু সকলের সহায়ে জগৎ কারণের অন্বেষণে অগ্রসর হইলে যতকালে সে উহার সন্ধান পাইবে, নিজ দেহ-মনাবলম্বনে অগ্রসর হইলে তদপেক্ষা অধিক শীঘ্র ঐ বিষয়ের সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা। "হাঁড়ির একটা ভাত টিপিয়া দেখিয়া যেমন বুঝিতে পারা যায়, ভাত-হাঁড়িটা সুসিদ্ধ হইয়াছে কি না," তদ্রূপ আপনার ভিতরে নিত্য-কারণ-স্বরূপের অনুসন্ধান পাইলেই অপর বস্তু ও ব্যক্তিসকলের অন্তরে উহার অন্বেষণ পাওয়া যাইবে। এজন্য জ্ঞানপথের পথিকের নিকট "আমি কোন্ পদার্থ" এই বিষয়ের অনুসন্ধানই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে।

'নেতি, নেতি' পথের লক্ষ্য, 'আমি' কোন্ পদার্থ তদ্বিষয় সন্ধান করা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জগৎসম্বন্ধীয় সাধারণ ধারণা, জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়বিধ সাধককেই ত্যাগ করিতে হয়। ঐ ধারণার একান্ত ত্যাগেই মানব-মন সর্ব্ববৃত্তি-রহিত হইয়া সমাধির অধিকারী হয়। ঐরূপ সমাধিকেই শাস্ত্র নির্ব্বিকল্পসমাধি আখ্যা প্রদান কয়িয়াছেন। জ্ঞানপথের সাধক, 'আমি বাস্তবিক কোন্ পদার্থ' এই তত্ত্বের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়া কিরূপে নির্ব্বিকল্প-সমাধিতে উপনীত হন এবং ঐ কালে তাঁহার কীদৃশ অনুভব উপস্থিত হয়, তাহা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি * অতএব ভক্তিপথের পথিক ঐ সমাধির অনুভবে

নির্বিকল্প সমাধি।

* গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ ২য় অধ্যায় দেখ।

কিরূপে উপস্থিত হইয়া থাকেন পাঠককে এখন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা কর্ত্তব্য।

ভক্তিমার্গকে 'ইতি ইতি'-সাধনপথ বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি। কারণ, ঐ পথের পথিক জগতের অনিত্যতা প্রত্যক্ষ করিলেও জগৎ-কর্ত্তা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া তৎকৃত জগৎরূপ কার্য্য সত্য বর্ত্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ভক্ত, জগৎ ও তন্মধ্যগত সর্ব্ব বস্তু ও ব্যক্তিকে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেখিয়া আপনার করিয়া লন। ঐ সম্বন্ধ দর্শন করিবার পথে যাহা অন্তরায় বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হয় তাহাকে তিনি তৎক্ষণাৎ দূর পরিহার করেন। তদ্ভিন্ন, ঈশ্বরের কোন এক রূপের † প্রতি অনুরাগে ও ধ্যানে তন্ময় হওয়া এবং তাঁহারই প্রীতির নিমিত্ত সর্ব্বকার্য্যানুষ্ঠান করা ভক্তের আশু লক্ষ্য হইয়া থাকে।

'ইতি ইতি' পথে নির্বিকল্প সমাধিলাভের বিবরণ।

রূপের ধ্যানে তন্ময় হইয়া কেমন করিয়া জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া নির্ব্বিকল্প অবস্থায় পৌঁছিতে পারা যায় এইবার আমরা তাহার অনুশীলন করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভক্ত, ঈশ্বরের কোন এক রূপকে নিজ ইষ্ট বলিয়া পরিগ্রহ করিয়া তাহারই চিন্তা ও ধ্যান করিতে থাকেন। প্রথম প্রথম, ধ্যান করিবার কালে, তিনি ঐ ইষ্টমূর্ত্তির সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণ ছবি মানস-নয়নের সম্মুখে আনিতে পারেন না; কখন উহার হস্ত, কখন পদ এবং কখন বা মুখখানিমাত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়; উহাও আবার দর্শন মাত্রেই যেন লয়

---

† ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকেও আমরা রূপের ধ্যানের মধ্যেই গণনা করিতেছি। কারণ, আকার-রহিত সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তিত্বের ধ্যান করিতে যাইলে আকাশ, জল, বায়ু বা তেজ প্রভৃতি পদার্থনিচয়ের কোন পদার্থই মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে।

হইয়া যায়, সম্মুখে স্থির ভাবে অবস্থান করে না। অভ্যাসের ফলে ধ্যান গভীর হইলে ঐ মূর্ত্তির সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণ ছবি, মানস-চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়। ধ্যান ক্রমে গভীরতর হইলে ঐ ছবি, যতক্ষণ না মন চঞ্চল হয় ততক্ষণ, স্থির ভাবে সম্মুখে অবস্থান করে। পরে, ধ্যানের গভীরতার তারতম্যে ঐ মূর্ত্তির চলা ফেরা, হাসা, কথাকহা এবং চরমে উহার স্পর্শ পর্য্যন্তও ভক্তের উপলব্ধি হয়। তখন ঐ মূর্ত্তিকে সর্ব্ব প্রকারে জীবন্ত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং ভক্ত, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বা খুলিয়া থাকুন না কেন, ধ্যান করিলেই ঐ মূর্ত্তির ঐ প্রকার চেষ্টাদি সমভাবে প্রত্যক্ষ করেন। পরে, "আমার ইষ্টই ইচ্ছামত নানারূপ ধারণ করিয়া-ছেন"—এই বিশ্বাসের ফলে ভক্ত-সাধক আপন ইষ্টমূর্ত্তি হইতে নানাবিধ দিব্যরূপ সকলের সন্দর্শন লাভ করেন। ঠাকুর বলিতেন —"যে ব্যক্তি একটী রূপ ঐ প্রকার জীবন্ত ভাবে দর্শন করিয়াছে তাহার অন্য সব রূপের দর্শন সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়।"

ইতিপূর্ব্বে যে সকল কথা বলা হইল তাহা হইতে একটি বিষয় আমরা বুঝিতে পারি। ঐরূপ জীবন্ত মূর্ত্তিসকলের দর্শন-লাভ যাঁহার ভাগ্যে উপস্থিত হয় তাঁহার নিকট জাগ্রৎকালে দৃষ্ট পদার্থ সকলের ন্যায়, ধ্যানকালে দৃষ্ট ভাবরাজ্যগত ঐ সকল মূর্ত্তির সমান অস্তিত্ব অনুভব হইতে থাকে। ঐরূপে বাহ্য জগৎ ও ভাবরাজ্যের সমানাস্তিত্ববোধ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততই তাঁহার মনে, বাহ্য জগৎটাকে মনঃ-কল্পিত বলিয়া ধারণা হইতে থাকে। আবার গভীর ধ্যানকালে ভাবরাজ্যের অনুভব, ভক্তের মনে এত প্রবল হইয়া উঠে যে সেই সময়ের জন্য তাঁহার বাহ্য জগতের অনুভব ঈষন্মাত্রও থাকে না। ভক্তের ঐ অবস্থাকেই শাস্ত্র সবিকল্প-সমাধি নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ প্রকার সমাধিকালে মানসিক

শক্তিপ্রভাবে ভক্তের মনে বাহ্য জগতের বিলয় হইলেও ভাবরাজ্যের বিলয় হয় না। জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের সহিত ব্যবহার করিয়া আমরা নিত্য যেরূপ সুখদুঃখাদির অনুভব করিয়া থাকি, আপন ইষ্টমূর্ত্তির সহিত ব্যবহারে ভক্ত তখন, ঠিক তদ্রূপ অনুভব করিতে থাকেন। কেবলমাত্র ইষ্টমূর্ত্তিকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার মনে তখন যত কিছু সংকল্প-বিকল্পের উদয় হইতে থাকে। এক বিষয়কে মুখ্যরূপে অবলম্বন করিয়া ভক্তের মনে ঐ সময়ে বৃত্তি-পরম্পরার উদয় হওয়ার জন্য শাস্ত্র, তাঁহার ঐ অবস্থাকে সবিকল্পক বা বিকল্পসংযুক্ত সমাধি বলিয়াছেন।

এইরূপে ভাবরাজ্যের অন্তর্গত বিষয় বিশেষের চিন্তায় ভক্তের মনে স্থূল বাহ্য জগতের, এবং এক ভাবের প্রাবল্যে অন্য ভাবসকলের, বিলয় সাধিত হয়। যে ভক্তসাধক এতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহার নিকট নির্ব্বিকল্পভূমি-লাভ অধিক দূরবর্ত্তী নহে। জগতের বহুকালাভ্যস্ত অস্তিত্ব-জ্ঞান যিনি এতদূর দূরীকরণে সক্ষম হইয়াছেন তাঁহার মন যে সমধিক শক্তিসম্পন্ন ও দৃঢ় সংকল্প হইয়াছে, একথা বলিতে হইবে না। মনকে এককালে নির্ব্বিকল্প করিতে পারিলে ঈশ্বর-সম্ভোগ অধিক ভিন্ন অল্প হয় না, একথা একবার ধারণা হইলেই তাঁহার সমগ্র মন ঐদিকে সোৎসাহে ধাবিত হয় এবং শ্রীগুরু ও ঈশ্বরকৃপায় তিনি অচিরে ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে আরোহণ করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থানপূর্ব্বক চিরশান্তির অধিকারী হন। অথবা বলা যাইতে পারে, প্রগাঢ় ইষ্টপ্রেমই তাঁহাকে ঐ ভূমি দেখাইয়া দেয় এবং ব্রজগোপিকাগণের ন্যায় উহার প্রেরণায় তিনি আপন ইষ্টের সহিত তখন একত্বানুভব করেন।

জ্ঞানী এবং ভক্ত সাধককুলের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার

ঐরূপ ক্রম শাস্ত্রনির্দ্ধারিত। অবতারপুরুষসকলে কিন্তু দেব এবং মানব উভয় ভাবের একত্র সম্মিলন আজীবন বিদ্যমান থাকায় সাধন-কালেই তাঁহাদিগকে কখন কখন সিদ্ধের ন্যায় প্রকাশ ও শক্তি-সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দেব এবং মানব উভয় ভূমিতে তাঁহাদিগের স্বভাবতঃ বিচরণ করিবার শক্তি থাকাতে ঐরূপ হইয়া থাকে; অথবা, ভিতরের দেবভাব তাঁহাদিগের সহজ স্বাভাবিক অবস্থা হওয়ায় উহা তাঁহাদিগের মানব-ভাবের বাহিরাবরণকে সময়ে সময়ে ভেদ করিয়া ঐরূপে স্বতঃ প্রকাশিত হয়। ঐ বিষয়ের মীমাংসা যাহাই হউক না কেন, ঐরূপ ঘটনা কিন্তু অবতারপুরুষ সকলের জীবন মানববুদ্ধির নিকটে দুর্ভেদ্য জটিলতাময় করিয়া রাখিয়াছে। ঐ জটিল রহস্য কখনও যে, সম্পূর্ণ ভেদ হইবে, বোধ হয় না। কিন্তু শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উহার অনুশীলনে মানবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, এ কথা ধ্রুব। প্রাচীন পৌরাণিক যুগে অবতার-চরিত্রের মানবভাবটী চাপিয়া ঢাকিয়া দেবভাবটীর আলোচনাই করা হইয়াছিল—সন্দেহশীল বর্ত্তমান যুগে ঐ চরিত্রের দেবভাবটী সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া মানবভাবটীর আলোচনাই চলিয়াছে—বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা ঐ চরিত্রের আলোচনায় উহাতে তদুভয় ভাব যে একত্র একই কালে বিদ্যমান থাকে এই কথাই পাঠককে বুঝাইতে প্রয়াস করিব। বলা বাহুল্য, দেব-মানব ঠাকুরের পুণ্যদর্শন জীবনে না ঘটিলে অবতারচরিত্র ঐরূপে দেখিতে আমরা কখনই সমর্থ হইতাম না।

অবতার পুরুষে, দেব ও মানব উভয় ভাব বিদ্যমান থাকায় সাধনকালে তাঁহাদিগকে সিদ্ধের ন্যায় প্রতীতি হয়। দেব ও মানব উভয় ভাবে তাঁহাদিগের জীবনালোচনা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অবতার জীবনে সাধক ভাব।

পুণ্য-দর্শন ঠাকুরের দিব্যসঙ্গলাভে কৃতার্থ হইয়া আমরা তাঁহার জীবন ও চরিত্রের যতই অনুধ্যান করিয়াছি ততই তাঁহাতে দেব ও মানব উভয়বিধ ভাবের বিচিত্র সম্মিলন দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। মধুর সামঞ্জস্যে ঐরূপ বিপরীত ভাবসমষ্টির একত্র একাধারে বর্ত্তমান যে সম্ভবপর একথা তাঁহাকে না দেখিলে আমাদের কখনই ধারণা হইত না। ঐরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই আমাদিগের ধারণা, তিনি দেব-মানব,—পূর্ণ দেবত্বের ভাব ও শক্তিসমূহ মানবীয় দেহ ও ভাবাবরণে প্রকাশিত হইলে যাহা হয়, তিনি তাহাই। ঐরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই বুঝিয়াছি যে, ঐ উভয় ভাবের কোনটীই তিনি বৃথা ভাণ করেন নাই এবং মানব ভার তিনি লোকহিতায় যথার্থই স্বীকার করিয়া উহা হইতে দেবত্বে উঠিবার পথ আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। আবার, ঐরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই একথা বুঝিতে পারিয়াছি যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সকল অবতার-পুরুষের জীবনেই ঐ উভয় ভাবের ঐরূপ বিচিত্র প্রকাশ নিশ্চয় উপস্থিত হইয়াছিল।

ঠাকুরে দেব ও মানব ভাবের মিলন।

শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া অবতার প্রথিত পুরুষসকলের মধ্যে কাহারও জীবনকথা আলোচনা করিতে যাইলেই আমরা ঐরূপ দেখিতে পাইব। দেখিতে পাইব, কি এক অদ্ভুত, অজ্ঞাত শক্তিবলে তাঁহারা কখন আমাদের ন্যায় সাধারণ ভাব-ভূমিতে থাকিয়া জগতস্থ যাবতীয় বস্তু ও ব্যক্তির সহিত আমাদিগেরই ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন—আবার,

কখন বা উচ্চ দিব্য ভাব-ভূমিতে বিচরণ করিয়া আমাদিগের অজ্ঞাত, অপরিচিত ভাব ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া এক নূতন রাজ্যের সংবাদ আমাদিগকে আনিয়া দিতেছেন!— তাঁহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও কে যেন সকল বিষয়ের যোগাযোগ করিয়া তাঁহাদিগকে ঐরূপ করাইতেছে! আশৈশবই ঐরূপ। তবে, শৈশবে সময়ে সময়ে ঐ শক্তির পরিচয় পাইলেও উহা যে তাঁহাদিগের নিজস্ব এবং অন্তরেই অবস্থিত একথা তাঁহারা অনেক সময়ে ধরিতে বুঝিতে পারেন না; অথবা, ইচ্ছামাত্রেই ঐ শক্তিপ্রয়োগে উচ্চ-ভাব-ভূমিতে আরোহণ করিয়া দিব্যভাব সহায়ে জগদন্তর্গত সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতে ও তাহাদিগের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন না। কিন্তু দিনের পর দিন ঐ শক্তির পরিচয় তাঁহারা জীবনে বারম্বার যত প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন, উহার সহিত সম্যক পরিচিত হইতে তাঁহাদের মনোমধ্যে তত প্রবল বাসনা জাগিয়া উঠে এবং ঐ বাসনাই তাঁহাদিগকে অলৌকিক অনুরাগসম্পন্ন করিয়া সাধনে নিযুক্ত করে।

সকল অবতার পুরুষেই ঐরূপ।

তাঁহাদিগের ঐরূপ বাসনায় কিন্তু স্বার্থপরতার নাম গন্ধ থাকে না। নিজের জন্য কোন প্রকার ভোগ-সুখ লাভ ত দূরের কথা, "পৃথিবীস্থ অপর অপর সকল ব্যক্তির যাহা হইবার হউক আমি নিজে মুক্তিলাভ করিয়া ভূমানন্দে থাকি"—এই প্রকারের ভাবও তাঁহাদিগের ঐ বাসনায় দেখা যায় না। কেবল, যে অজ্ঞাত দিব্য শক্তির নিয়োগে তাঁহারা জন্মাবধি অসাধারণ দিব্যভাব সকল অনুভব করিতেছেন এবং স্থূল জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তি সকলের ন্যায় ভাবরাজ্যগত সকল বিষয়ের সমসমান অস্তিত্ব সময়ে সময়ে

অবতার পুরুষে স্বার্থ-সুখের বাসনা থাকেনা।

প্রত্যক্ষ করিতেছেন সেই শক্তি কি বাস্তবিকই জগতের অন্তরালে অবস্থিত অথবা স্বকপোলকল্পনাবিজৃম্ভিত তদ্বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান তাঁহাদিগের ঐ বাসনার মূলে পরিলক্ষিত হয়। কারণ, অপর সাধারণের প্রত্যক্ষ ও অনুভবাদির সহিত আপনাদিগের প্রত্যক্ষ সকলের তুলনা করিয়া একথা তাঁহাদিগের স্বল্পকালেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তাঁহারা আজীবন জগতস্থ বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে যে ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন অপরে তদ্রূপ করিতেছে না—ভাব-রাজ্যের উচ্চভূমি হইতে জগৎটা দেখিবার সামর্থ্য তাহাদের এক প্রকার নাই বলিলেই হয়।

তাঁহাদিগের করুণা ও পরার্থে সাধন ভজন।

শুধু তাহাই নহে। পূর্ব্বোক্ত তুলনায় তাঁহাদের আর একটী কথাও সঙ্গে সঙ্গে ধারণা হইয়া পড়ে। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, সাধারণ ও দিব্য দুই ভূমি হইতে জগতটাকে দুই ভাবে দেখিতে পান বলিয়াই প্রতি মূহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল দুই দিনের নশ্বর জীবনে আপাতমনোরম রূপরসাদি তাঁহাদিগকে মানব-সাধারণের ন্যায় প্রলোভিত করিতে পারে না, এবং অনিত্য সংসারের নানা অবস্থাবিপর্য্যয়ে, অশান্তি ও নৈরাশ্যের নিবিড় ছায়া তাঁহাদিগের মনকে আবৃত করিতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শক্তিকে সম্যকপ্রকারে আপনার করিয়া লইয়া কেমন করিয়া ইচ্ছামাত্র উচ্চ উচ্চতর ভাব-ভূমি সকলে স্বয়ং আরোহণ এবং যতকাল ইচ্ছা তথায় অবস্থান করিতে পারিবেন, এবং আপামর সাধারণকে ঐরূপ করিতে শিখাইয়া শান্তির অধিকারী করিবেন, এই চিন্তাতেই তাঁহাদের করুণাপূর্ণ মন এককালে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। এজন্যই দেখা যায়, সাধনা ও করুণার দুইটী প্রবল প্রবাহ তাঁহাদিগের জীবনে নিরন্তর পাশাপাশি

প্রবাহিত হইতেছে! বলিতে পার, মানবসাধারণের সহিত আপনাদিগের অবস্থার তুলনায় তাঁহাদিগের অন্তরের করুণা শতধারে বৰ্দ্ধিত হইতে পারে; কিন্তু ঐরূপ অসাধারণ করুণার উৎপত্তি তাঁহাদিগের অন্তরে কোথা হইতে হইল তাহা ত নির্দ্দিষ্ট হইল না? উত্তরে বলিতে হয়, উহা সঙ্গে লইয়াই তাঁহারা সংসারে জন্মিয়া থাকেন—উহা ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। ঠাকুরের ঐ বিষয়ক একটী দৃষ্টান্ত স্মরণ কর—

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'তিন বন্ধুর আনন্দ-কানন দর্শন' সম্বন্ধে ঠাকুরের গল্প।

"তিন বন্ধুতে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে মাঠের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে দেখ্‌লে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা একটা জায়গা—তার ভিতর থেকে গান বাজনার মধুর আওয়াজ আস্‌ছে! শুনে মোহিত হয়ে ইচ্ছা হোলো, ভিতরে কি হচ্চে দেখ্‌বে। চারিদিকে ঘুরে দেখ্‌লে, ভিতরে ঢোক্‌বার একটীও দরজা নাই। কি করে?—একজন কোন রকমে একটা মৈ যোগাড় করে পাঁচিলের উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌লো ও অপর দুই জন নীচে দাঁড়িয়ে রইলো। প্রথম লোকটী পাঁচিলের উপরে উঠে ভিতরের ব্যাপার দেখে আনন্দে অধীর হয়ে হাঃ হাঃ করে হাস্‌তে হাস্‌তে লাফিয়ে প'ড়্‌লো—কি যে ভিতরে দেখ্‌লে তা নীচের দুজনকে বল্‌বার জন্য একটুও অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না! তারা ভাব্‌লে বাঃ, বন্ধু ত বেশ্‌, একবার বল্‌লেও না—কি দেখ্‌লে!—যা হোক্‌ দেখ্‌তে হোলো। ভেবে—আর একজন ঐ মৈ বেয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। উপরে উঠে সেও কিন্তু প্রথম লোকটীর মত হাঃ হাঃ করে হেসে ভিতরে লাফিয়ে পড়্‌লো। তৃতীয় লোকটী তখন কি করে—মৈ বেয়ে উপরে উঠ্‌লো ও ভিতরের আনন্দের মেলা দেখ্‌তে পেলে। দেখে

প্রথমে তার মনে খুব ইচ্ছা হোলো সেও উহাতে যোগ দেয়। পরেই ভাবলে—কিন্তু আমি যদি এখনি উহাতে যোগদান করি তা হোলে বাহিরের অপর দশজনে ত জান্‌তে পার্‌বে না, এখানে এমন আনন্দ উপভোগের জায়গা আছে; একলা এই আনন্দটা ভোগ ক'র্‌বো? ঐ ভেবে, সে জোর ক'রে নিজের মনকে ফিরিয়ে নেবে এলো ও দুচোকে যাকেই দেখ্‌তে পেলে তাকেই হেঁকে বল্‌তে লাগ্‌লো—ওহে এখানে এমন আনন্দের স্থান রয়েছে, চল চল সকলে মিলে ভোগ করি! এইরূপে সকলকে সঙ্গে নিয়ে সেও ঐ স্থানে যোগ দিলে।" এখন বুঝ, তৃতীয় ব্যক্তির মনে দশজনকে সঙ্গে লইয়া একত্র আনন্দোপভোগের ইচ্ছার কারণ যেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তদ্রূপ অবতার পুরুষসকলের মনে লোককল্যাণসাধনের ইচ্ছা কেন যে আশৈশব বিদ্যমান থাকে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না।

অবতার পুরুষদিগকে সাধারণ মানবের ন্যায় সংযম অভ্যাস করিতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত কথায় কেহ কেহ হয়ত স্থির করিবেন যে, তবে বুঝি অবতার পুরুষসকলকে আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় সকলের সহিত কখনও সংগ্রাম করিতে হয় না; শিষ্ট শান্ত বালকের ন্যায় উহারা বুঝি আজন্ম তাঁহাদিগের বশে নিরন্তর উঠিতে বসিতে থাকে এবং সেই জন্য সংসারের রূপরসাদি হইতে মনকে ফিরাইয়া তাঁহারা সহজেই উচ্চ লক্ষ্যে চালিত করিতে পারেন। উত্তরে আমরা বলি, তাহা নহে, ঐ বিষয়েও নরবৎ নরলীলা হইয়া থাকে; এখানেও তাঁহাদিগকে সংগ্রামে জয়ী হইয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হয়।

মানব মনের স্বভাব সম্বন্ধে যিনি কিছুমাত্র জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন তিনিই দেখিতে পাইয়াছেন স্থূল হইতে আরম্ভ হইয়া

সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম, অনন্ত বাসনান্তরসমূহ উহার ভিতরে কত বিদ্যমান রহিয়াছে! একটীকে যদি কোনরূপে অতিক্রম করিতে তুমি সমর্থ হইয়াছ তবে আর একটী আসিয়া তোমার পথরোধকরিল—সেটীকে পরাজিত করিলে ত আর একটি আসিল—স্থূলকে পরাজিত করিলে ত সূক্ষ্ম আসিল—তাহাকে পশ্চাৎপদ করিলে ত সূক্ষ্মতর বাসনাশ্রেণী তোমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হইল! যদি কাম ছাড়িলে ত কাঞ্চন আসিল; স্থূলভাবে কাম-কাঞ্চন গ্রহণে বিরত হইলে ত বাহ্যিক সৌন্দর্য্যানুরাগ, লোকৈষণা মান-যশাদি সম্মুখে উপস্থিত হইল; অথবা মায়িক সম্বন্ধ সকল যদি তুমি যত্নপূর্ব্বক পরিহার করিলে তবে আলস্য বা করুণাকারে মায়ামোহ আসিয়া তোমার হৃদয় অধিকার করিল!

মনের অনন্ত বাসনা।

মনের ঐরূপ স্বভাবের উল্লেখ করিয়া বাসনাজাল হইতে দূরে থাকিতে ঠাকুর আমাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক করিতেন। নিজ জীবনের ঘটনাবলী* ও চিন্তাপর্য্যন্ত সময়ে সময়ে দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিয়া তিনি ঐ বিষয় আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন। পুরুষভক্তদিগের ন্যায় স্ত্রীভক্তদিগকেও তিনি ঐ কথা বারম্বার বলিয়া তাঁহাদিগের অন্তরে ঈশ্বরানুরাগ উদ্দীপিত করিতেন। তাঁহার একদিনের ঐরূপ ব্যবহার এখানে বলিলেই পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন।

বাসনা ত্যাগ সম্বন্ধে ঠাকুরের প্রেরণা।

স্ত্রী বা পুরুষ ঠাকুরের নিকট যে কেহই যাইতেন সকলেই তাঁহার অমায়িকতা, সদ্ব্যবহার, ও কামগন্ধরহিত অদ্ভুত ভালবাসার

* "গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ" ১ম অধ্যায় ২৬ পৃষ্ঠা এবং ২য় অধ্যায় ৫৫ ও ৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

আকর্ষণ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন এবং সুবিধা হইলেই পুনরায় তাঁহার পুণ্যদর্শন ও সঙ্গসুখলাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। ঐরূপে তাঁহারা যে নিজেই তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা নহে, নিজের পরিচিত সকলকে ঠাকুরের নিকট লইয়া যাইয়া তাহারাও যাহাতে তাঁহার দর্শনে বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারে তজ্জন্য বিশেষ-ভাবে চেষ্টা করিতেন। আমাদিগের পরিচিতা জনৈকা ঐরূপে একদিন তাঁহার বৈমাত্রেয়া ভগ্নী ও তাহার স্বামীর সহোদরাকে সঙ্গে লইয়া অপরাহ্ণে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে ঠাকুর তাঁহাদের পরিচয় ও কুশল প্রশ্নাদি করিয়া, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগবান্ হওয়াই মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ এই বিষয়ে কথা পাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

ঐ বিষয়ে স্ত্রী ভক্ত-দিগকে উপদেশ।

"ভগবানের শরণাপন্ন কি সহজে হওয়া যায় গা? মহামায়ার এমনি কাণ্ড—হতে কি দেয়? যার তিনকুলে কেউ নেই তাকে দিয়ে একটা বিড়াল পুষিয়ে সংসার করাবে!—সেও বিড়ালের মাছ, দুধ, ঘুরে ঘুরে জোগাড় কর্‌বে; আর বল্‌বে, 'মাছ, দুধ না হলে বিড়ালটা খায় না, কি করি?'

"হয়ত, বড় বনেদি ঘর। পতি পুত্তুর সব মরে গেল—কেউ নেই—রইল কেবল গোটাকতক রাঁড়ি!—তাদের মরণ নাই! বাড়ির এখান্‌টা পড়ে গেছে, ওখান্‌টা ধসে গেছে, ছাদের উপর অশ্বত্থ গাছ জন্মেছে—তার সঙ্গে দুচার গাছা ডেঙ্গো ডাঁটাও জন্মেছে; রাঁড়িরা তাই তুলে চচ্চড়ি রাঁধ্‌চে ও সংসার কর্‌চে! কেন? ভগবানকে ডাকুক্ না

কেন? তাঁর শরণাপন্ন হোক্ না—তার ত সময় হয়েছে। তা হবে না!

"হয়ত বা কারুর বিয়ের পরে স্বামী মরে গেল—কড়ে রাঁড়ি। ভগবানকে ডাকুক্ না কেন? তা নয়– ভাইয়ের ঘরে গিন্নি হোল! মাথায় কাগা খোঁপা, আঁচলে চাবির থোলো বেঁধে, হাত নেড়ে গিন্নিপনা কচ্চেন—সর্ব্বনাশীকে দেখ্‌লে পাড়া শুদ্ধ্ লোক ডরায়!—আর বলে বেড়াচ্চেন্—"আমি না হলে দাদার খাওয়াই হয় না!"—মর মাগি, তোর কি হোলো তা ছাখ্—তা, না!"

এক রহস্যের কথা—আমাদিগের পরিচিতা রমণীর ভগ্নীর ঠাকুরঝি—যিনি অদ্য প্রথমবার ঠাকুরের দর্শন লাভ করিলেন, ভ্রাতার ঘরে গৃহিনী ভগ্নিদিগের শ্রেণীভুক্তা ছিলেন! ঠাকুরকে কেহই সে কথা ইতিপূর্ব্বে বলে নাই। কিন্তু কথায় কথায় ঠাকুর ঐ দৃষ্টান্ত আনিয়া বাসনার প্রবল প্রতাপ ও মানব মনে অনন্ত বাসনান্তরের কথা বুঝাইতে লাগিলেন! বলা বাহুল্য কথাগুলি ঐ স্ত্রীলোকটীর অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। দৃষ্টান্তগুলি শুনিয়া আমাদিগের পরিচিতা রমণীর ভগ্নী তাঁহার গা ঠেলিয়া চুপি চুপি বলিলেন—"ও ভাই,—আজই কি ঠাকুরের মুখ দিয়ে এই কথা বেরুতে হয়!—ঠাকুরঝি কি মনে ক'র্‌বে!" পরিচিতা বলিলেন 'তা কি কোর্‌বো; ওঁর ইচ্ছা, ওঁকে আরত কেউ শিখিয়ে দেয় নি?'

অবতার পুরুষদিগের সূক্ষ্ম বাসনার সহিত সংগ্রাম।

মানব প্রকৃতির আলোচনায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যাহার মন যত উচ্চে উঠে, সূক্ষ্ম বাসনারাজি তাহাকে তত তীব্র যাতনা অনুভব করায়। চুরি, মিথ্যা বা লাম্পট্য যে অসংখ্যবার করিয়াছে, তাহার ঐরূপ কার্য্যের পুনরনুষ্ঠান তত কষ্টকর হয় না, কিন্তু উদার উচ্চ

অন্তঃকরণ ঐ সকলের চিন্তামাত্রেই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিষম যন্ত্রণায় মুহ্যমান হয়। অবতার পুরুষ সকলকে আজীবন স্থূলভাবে বিষয় গ্রহণে অনেকস্থলে বিরত থাকিতে দেখা যাইলেও অন্তরের সূক্ষ্ম বাসনাশ্রেণীর সহিত সংগ্রাম যে তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় সমভাবেই করিয়া থাকেন এবং মনের ভিতর উহাদিগের মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদিগের অপেক্ষা শত সহস্রগুণ অধিক যন্ত্রণা অনুভব করেন, একথা তাঁহারা স্বয়ং স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অতএব রূপরসাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ফিরাইতে তাঁহাদিগের সংগ্রামকে ভাণ কিরূপে বলিব ?

অবতার পুরুষের মানব ভাব সম্বন্ধে আপত্তি ও মীমাংসা।

শাস্ত্রদর্শী কোন পাঠক হয়ত এখনও বলিবেন, "কিন্তু তোমার কথা মানি কিরূপে ? এই দেখ অদ্বৈতবাদীর শিরোমণি আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার গীতা ভাষ্যের প্রারম্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও নরদেহ-ধারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাব, সকল জীবের নিয়ামক, জন্মাদিরহিত ঈশ্বর, লোকানুগ্রহ করিবেন বলিয়া নিজ মায়াশক্তি দ্বারা যেন দেহবান হইয়াছেন, যেন জন্মিয়াছেন এই-রূপ পরিলক্ষিত হয়েন।' * স্বয়ং আচার্য্যই যখন ঐ কথা বলিতে-ছেন তখন তোমাদের পূর্ব্বোক্ত কথা দাঁড়ায় কিরূপে ?" আমরা বলি আচার্য্য ঐরূপ বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমাদিগের দাঁড়া-ইবার স্থল আছে। আচার্য্যের ঐকথা বুঝিতে হইলে আমা-দিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি, ঈশ্বরের দেহধারণ বা নামরূপবিশিষ্ট হওয়াটাকে যেমন ভাণ বলিতেছেন, তেমনি

* স চ ভগবান্……অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধমুক্ত-স্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাতইব লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্ লক্ষ্যতে।
গীতা—শাঙ্করভাষ্যের উপক্রমণিকা।

সঙ্গে সঙ্গে তোমার, আমার এবং জগতের প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তির নাম-রূপ-বিশিষ্ট হওয়াটাকে ভাণ বলিতেছেন। সমগ্র জগৎ-টাকেই তিনি ব্রহ্মবস্তুর উপরে মিথ্যাভাণ বলিতেছেন বা উহার বাস্তব সত্তা স্বীকার করিতেছেন না।* অতএব তাঁহার ঐ উভয় কথা একত্রে গ্রহণ করিলে তবেই তৎকৃত মীমাংসা বুঝা যাইবে। অবতারের দেহধারণ ও সুখদুঃখাদি অনুভবগুলিকে মিথ্যা ভাণ বলিয়া ধরিব এবং আমাদিগের ঐ বিষয় গুলি... সত্য বলিব এরূপ তাঁহার অভিপ্রায় নহে। আমাদিগের অনুভব ও প্রত্যক্ষকে সত্য বলিলে অবতার পুরুষদিগের প্রত্যক্ষাদিকেও সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কথায় আমরা অন্যায় কিছু বলি নাই।

ঐ কথার অন্যভাবে আলোচনা।

কথাটীর আর এক ভাবে আলোচনা করিলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে। অদ্বৈত-ভাব-ভূমি ও সাধারণ বা দ্বৈত-ভাব-ভূমি হইতে দৃষ্টি করিয়া জগৎ সম্বন্ধে দুই প্রকার ধারণা আমাদিগের উপস্থিত হয়—শাস্ত্র এই কথা বলেন। প্রথমটীতে আরোহণ করিয়া জগৎরূপ পদার্থটা কতদূর সত্য বুঝিতে যাইলে প্রত্যক্ষ বোধ হয় উহা নাই, বা কোনও কালে ছিল না—একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম-বস্তু ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই; আর দ্বিতীয় বা দ্বৈত-ভাব-ভূমিতে থাকিয়া জগৎটাকে দেখিলে নানা নাম রূপের সমষ্টি উহাকে সত্য ও নিত্য বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হয়, যেমন আমাদিগের ন্যায় মানবসাধারণের সর্ব্বক্ষণ হইতেছে। দেহস্থ থাকিয়াও বিদেহভাবসম্পন্ন অবতার ও জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের অদ্বৈত-ভূমিতে অবস্থান জীবনের অনেক সময় হওয়ায় নিম্নের দ্বৈত-ভূমিতে অবস্থানকালে জগৎটাকে স্বপ্নতুল্য মিথ্যা বলিয়া

* শারীরক ভাষ্যে অধ্যাসনিরূপণ দেখ।

ধারণা হইয়া থাকে। কিন্তু জাগ্রদবস্থার সহিত তুলনায় স্বপ্ন, মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইলেও স্বপ্নসন্দর্শনকালে যেমন উহাকে এককালে মিথ্যা বলা যায় না, জীবন্মুক্ত ও অবতার পুরুষদিগের মনের জগদাভাসকেও সেইরূপ এককালে মিথ্যা বলা চলে না।

জগৎরূপ পদার্থটাকে পূর্ব্বোক্ত দুই ভূমি হইতে যেমন দুই ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় তেমনি আবার, উহার অন্তর্গত কোন ব্যক্তিবিশেষকেও ঐরূপে, দুই ভাবভূমি হইতে দুই প্রকারে দেখা গিয়া থাকে। দ্বৈত-ভাবভূমি হইতে দেখিলে ঐ ব্যক্তিকে বদ্ধমানব এবং পূর্ণ অদ্বৈত-ভূমি হইতে দেখিলে তাহাকে নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হয়। পূর্ণ অদ্বৈত-ভূমি ভাবরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ প্রদেশ। উহাতে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে মানব মন উচ্চ উচ্চতর নানা ভাব-ভূমির ভিতর দিয়া উঠিয়া পরিশেষে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হয়। ঐ সকল উচ্চ উচ্চতর ভাব-ভূমিতে উঠিবার কালে জগৎ ও তদন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাধকের নিকট প্রতীয়মান হইতে থাকিয়া উহাদের সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ব ধারণা নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। যথা—জগৎটাকে ভাবময় বলিয়া বোধ হয়; অথবা, ব্যক্তিবিশেষকে শরীর হইতে পৃথক্, অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তিশালী, মনোময় বা দিব্য জ্যোতির্ম্ময় ইত্যাদি বলিয়া বোধ হইতে থাকে।

উচ্চতর ভাবভূমি হইতে জগৎ সম্বন্ধে ভিন্ন উপলব্ধি।

অবতার পুরুষদিগের নিকট শ্রদ্ধা ও ভক্তি সম্পন্ন হইয়া উপস্থিত হইলে সাধারণ মানব অজ্ঞাতসারে পূর্ব্বোক্ত উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া থাকে। অবশ্য, তাঁহাদিগের বিচিত্র শক্তিপ্রভাবেই তাহাদিগের ঐ প্রকার আরোহণসামর্থ্য উপস্থিত

অবতার পুরুষদিগের শক্তিতে মানব উচ্চ-ভাবে উঠিয়া তাঁহাদিগকে মানবভাবপরিশূন্য দেখে।

হয়। অতএব বুঝা যাইতেছে, ঐ সকল উচ্চভূমি হইতে তাঁহাদিগকে ঐরূপ বিচিত্রভাবে দেখিতে পাইয়াই ভক্ত সাধক তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ধারণা করিয়া বসেন যে, বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন দিব্যভাবই তাঁহাদিগের যথার্থ স্বরূপ এবং ইতরসাধারণে তাঁহাদিগের ভিতরে যে মানবভাব দেখিতে পায় তাহা তাঁহারা মিথ্যাভাণ করিয়া তাহাদিগকে দেখাইয়া থাকেন। ভক্তির গভীরতার সঙ্গে ভক্ত সাধকের প্রথমে, ঈশ্বরের ভক্ত সকলের সম্বন্ধে, এবং পরে, ঈশ্বরের জগৎ সম্বন্ধে, ঐরূপ ধারণা হইতে দেখা গিয়া থাকে।

অবতার পুরুষদিগের মনের ক্রমোন্নতি। জীব ও অবতারের শক্তিরই প্রভেদ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মনের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিয়া ভাবরাজ্যে দৃষ্ট বিষয় সকলে, জগতে প্রতিনিয়ত পরিদৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের ন্যায় দৃঢ় অস্তিত্বানুভব, অবতার পুরুষসকলের জীবনে শৈশব কাল হইতে সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। পরে, দিনের পর যতই দিন যাইতে থাকে এবং ঐরূপ দর্শন তাঁহাদিগের জীবনে বারম্বার যত উপস্থিত হইতে থাকে তত তাঁহারা স্থূল, বাহ্য জগতের অপেক্ষা ভাবরাজ্যের অস্তিত্বেই সমধিক বিশ্বাসবান হইয়া পড়েন। পরিশেষে, সর্ব্বোচ্চ অদ্বৈতভাব-ভূমিতে উঠিয়া যে একমেবাদ্বিতীয়ং বস্তু হইতে নানা নাম-রূপময় জগতের বিকাশ হইয়াছে তাহার সন্ধান পাইয়া তাঁহারা সিদ্ধকাম হন। জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের সম্বন্ধেও ঐরূপ হইয়া থাকে। তবে অবতার পুরুষেরা অতি স্বল্পকালে যে সত্যে উপনীত হন তাহা উপলব্ধি করিতে তাঁহাদিগের আজীবন চেষ্টার আবশ্যক হয়। অথবা—স্বয়ং স্বল্পকালে অদ্বৈত-ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিলেও অপরকে ঐ ভূমিতে আরোহণ করাইয়া দিবার শক্তি তাঁহাদিগের ভিতর, অবতার পুরুষদিগের সহিত তুলনায় অতি অল্পমাত্রই

প্রকাশিত হয়। ঠাকুরের ঐ বিষয়ক শিক্ষা স্মরণ কর—"জীব ও অবতারে, শক্তির প্রকাশ লইয়াই প্রভেদ।"

অবতার—দেব-মানব, সর্ব্বজ্ঞ।

অদ্বৈত-ভূমিতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া জগৎ-কারণের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে পরিতৃপ্ত হইয়া অবতার পুরুষেরা যখন পুনরায় মনের নিম্ন ভূমিতে অবরোহণ করেন তখন সাধারণ দৃষ্টিতে মানব মাত্র থাকিলেও তাঁহারা যথার্থই অমানব বা দেবমানব পদবী প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহারা জগৎ ও তৎকারণ উভয় পদার্থকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তুলনায় বাহ্যান্তর জগৎটার ছায়ার ন্যায় অস্তিত্ব সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অনুভব করিতে থাকেন। তখন তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া মনের অসাধারণ উচ্চশক্তিসমূহ স্বতঃ লোকহিতায় নিত্য প্রকাশিত হইতে থাকে এবং জগতে পরিদৃষ্ট সকল পদার্থের আদি, মধ্য ও অন্ত সম্যক্ অবগত হইয়া তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করেন। ক্ষুদ্র মানব আমরা, তখনই তাঁহাদিগের অলৌকিক চরিত্র ও চেষ্টাদি প্রত্যক্ষ করি এবং তাঁহাদিগের অমৃত-ময়ী বাণীতে আশান্বিত হইয়া এ কথার আভাস পাইয়া থাকি যে —বহির্মুখী বৃত্তি লইয়া বাহ্যজগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তি সকলের অবলম্বনে যথার্থ সত্যলাভ, বা জগৎ-কারণের অনুসন্ধান ও শান্তি-লাভ, কখনই সফল হইবার নহে।

বহির্মুখী বৃত্তি লইয়া জড়বিজ্ঞানের আলোচনায় জগৎ-কারণের জ্ঞানলাভ অসম্ভব।

পাশ্চাত্যবিদ্যা-পারদর্শী পাঠক বলিবেন—এইবারেই মাটি; এইবারেই কূপমণ্ডুকের মত কথাটা বলিয়া আপনার পক্ষটা দুর্ব্বল করিলে, আর কি! বাহ্য-জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধানে আজকাল মানবের জ্ঞান কতদূর উন্নত হইয়াছে ও প্রতিদিন হইতেছে তাহা যে দেখিয়াছে

সে ঐরূপ কথা কখনই বলিতে পারিত না। উত্তরে আমরা বলি—জড়বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে যাহা বলিতেছ তাহা সত্য হইলেও উহা দ্বারা পূর্ণ-সত্য লাভ তোমাদের কখনই সাধিত হইবে না। কারণ, জগৎ-কারণকে তোমরা জড় অথবা তোমাদের অপেক্ষাও অধম, নিকৃষ্ট দরের বস্তু, বলিয়া ধারণা করিয়া বসিয়া আছ এবং বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা তোমরা অধিকতর রূপরসাদি ভোগলাভকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছ। অতএব একমাত্র জড় বস্তু হইতে জগতের অন্যান্য নানা জড় ও চৈতন্যময় বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে একথা যন্ত্রসহায়ে কোনকালে প্রমাণ করিতে পারিলেও অন্তররাজ্যের বিষয়সকল তোমাদিগের নিকট চিরকালই অপ্রমাণিত থাকিবে। ভোগবাসনাত্যাগ, ও অন্তর্মুখীবৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার ভিতর দিয়াই মানবের মুক্তিলাভের পথ, একথা যতদিন না হৃদয়ঙ্গম হইবে তৎদিন তোমাদিগের দেশকালাতীত অখণ্ড সত্যলাভ হইবে না, শান্তিলাভও হইবে না।

অবতার পুরুষদিগের আশৈশব ভাবতন্ময়ত্ব।

ভাবরাজ্যের বিষয় লইয়া আশৈশব সময়ে সময়ে তন্ময় হইয়া যাইবার কথা সকল অবতার পুরুষের জীবনেই শুনিতে পাওয়া যায়। দেখনা—শ্রীকৃষ্ণ, বাল্যকালেই সময়ে সময়ে স্বীয় দেবত্বের পরিচয় নানাভাবে নিজ পিতা মাতা ও বন্ধু বান্ধবদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেছেন; বুদ্ধ, বাল্যেই উদ্যানে বেড়াইতে যাইয়া বোধিদ্রুমতলে সমাধিস্থ হইয়া দেবতা ও মানবের নয়নাকর্ষণ করিতেছেন; ঈশা, প্রেমে বন্য পক্ষীদিগকে আকর্ষণ করিয়া বাল্যে, নিজ হস্তে খাওয়াইতেছেন; শঙ্কর, স্বীয় মাতাকে দিব্য-শক্তি প্রভাবে মুগ্ধ ও আশ্বস্ত করিয়া বাল্যেই সংসার ত্যাগ করিতেছেন; এবং চৈতন্য বাল্যেই দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া,

ঈশ্বর-প্রেমিক হেয় উপাদেয় সকল বস্তুর ভিতরেইঈশ্বর-প্রকাশ দেখিতে পান, একথার আভাস দিতেছেন। ঠাকুরের জীবনেও ঐ বিষয়ের অভাব নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে তাঁহার শৈশবকালের কয়েকটী ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। ঘটনাগুলি ঠাকুরের নিজ মুখেই আমরা শুনিয়াছিলাম, এবং বুঝিয়াছিলাম, ভাবরাজ্যে প্রথম তন্ময় হওয়া তাঁহার অতি অল্প বয়সেই হইয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন—

ঠাকুরের ছয় বৎসর বয়সে প্রথম ভাবাবেশের কথা।

"ওদেশে (কামারপুকুরে) ছেলেদের ছোট ছোট টেকোয় * করে মুড়ি খেতে দেয়। যাদের ঘরে টেকো নাই তারা কাপড়েই মুড়ি খায়। আবার কেউ টেকোয়, কেউ কাপড়ে মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে ছেলেরা পথে মাঠে ঘাটে বেড়িয়ে বেড়ায়। তখন ছয় কি সাত বছর বয়স হবে ; একদিন টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠেরআল্-পথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্চি। সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাস, আকাশে একটা দিকে কাল সুন্দর একখানা জলভরা মেঘ উঠেছে। তাই দেখ্‌চি ও খাচ্চি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেঘখানা আকাশ ছেয়ে ফেল্‌চে, এমন সময় এক ঝাঁক সাদা দুধের মত বক ঐ মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো। সে এমন এক বাহার হোলো !—তাই দেখ্‌তে দেখ্‌তে অপূর্ব্বভাবে তন্ময় হয়ে এমন একটা অবস্থা হোলো যে, আর হুঁস্ রইলো না ! পড়ে গেলুম্—মুড়িগুলি আলের ধারে ছড়িয়ে গেল। লোকে দেখ্‌তে পেয়ে ধরাধরি ক'রে বাড়ী নিয়ে এসেছিল। সেই প্রথম ভাবে বেহুঁস্ হয়ে যাই।"

---

* চুব্‌ড়ি।

ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরের এক ক্রোশ আন্দাজ উত্তরে আনুড় নামে গ্রাম। আনুড়ের বিষলক্ষী * জাগ্রতাদেবী। চতুঃপার্শ্বস্থ দূর দূরান্তরের গ্রাম হইতে গ্রামবাসিগণ নানা প্রকার কামনা পূরণের জন্য দেবীর উদ্দেশে পূজা মানত্ করে এবং অভীষ্টসিদ্ধি হইলে যথাকালে আসিয়া পূজা বলি প্রভৃতি দিয়া যায়। অবশ্য, আগন্তুক যাত্রীদিগের ভিতর স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক হয়, এবং রোগশান্তির কামনাই অন্যান্য কামনা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোককে এখানে আকৃষ্ট করে। দেবীর প্রথমাবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধীয় গল্প ও গান করিতে করিতে সদ্বংশজাতা গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে প্রান্তর পার হইয়া দেবীদর্শনে আগমন করিতেছেন —এ দৃশ্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুরের বাল্যকালে কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রাম যে বহুলোকপূর্ণ এবং এখন

৺ বিশালাক্ষী দর্শন করিতে যাইয়া ঠাকুরের দ্বিতীয় ভাবাবেশের কথা।

* উক্ত দেবীর নাম বিষ-লক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী তাহা স্থির করা কঠিন। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে মনসা দেবীর অন্য নাম বিষহরী দেখিতে পাওয়া যায়। বিষহরী শব্দটী বিষ-লক্ষ্মীতে পরিণত সহজেই হইতে পারে। আবার মনসা-মঙ্গলাদি গ্রন্থে মনসা দেবীর রূপ বর্ণনায় বিশালাক্ষী শব্দেরও প্রয়োগ আছে। অতএব মনসা দেবীই সম্ভবতঃ বিষ-লক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী নামে অভিহিতা হইয়া এখানে লোকের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী দেবীর পূজা রাঢ়ের অন্যত্র অনেক স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায়। কামারপুকুর হইতে ঘাটাল আসিবার পথে একস্থলে আমরা উক্ত দেবীর একটী সুন্দর মন্দির দেখিয়াছিলাম। মন্দির সংলগ্ন নাট্য মন্দির, পুষ্করিণী, বাগিচা প্রভৃতি দেখিয়া ধারণা হইয়াছিল, এখানে পূজার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

অপেক্ষা অনেক অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহার নিদর্শন, জনশূন্য জঙ্গলপূর্ণ ভগ্ন ইষ্টকালয়, জীর্ণ পতিত দেবমন্দির ও রাস-মঞ্চ প্রভৃতি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেজন্য আমাদের অনুমান, আনুড়ের দেবীর নিকট তখন যাত্রীসংখ্যাও অনেক অধিক ছিল।

প্রান্তর মধ্যে শূন্য অম্বরতলেই দেবীর অবস্থান, বর্ষাতপাদি হইতে রক্ষার জন্য কৃষকেরা সামান্য পর্ণাচ্ছাদন মাত্র বৎসর বৎসর করিয়া দেয়। ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির যে এককালে বর্ত্তমান ছিল তাহার পরিচয় পার্শ্বের ভগ্নস্তূপে পাওয়া যায়। গ্রামবাসীদিগকে উক্ত মন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলে—দেবী স্বেচ্ছায় উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন! বলে—

গ্রামের রাখাল বালকগণ দেবীর প্রিয় সঙ্গী; প্রাতঃকাল হইতে তাহারা এখানে আসিয়া গরু ছাড়িয়া দিয়া বসিবে, গল্প গান করিবে, খেলা করিবে, বনফুল তুলিয়া তাঁহাকে সাজাইবে এবং দেবীর উদ্দেশে যাত্রী বা পথিকপ্রদত্ত মিষ্টান্ন ও পয়সা নিজেরা গ্রহণ করিয়া আনন্দ করিবে—এ সকল মিষ্ট উপদ্রব না হইলে তিনি থাকিতে পারেন না! এক সময়ে কোন গ্রামের এক ধনী ব্যক্তির অভীষ্ট পূরণ হওয়ায় সে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেয় এবং দেবীকে উহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা করে। পুরোহিত সকাল সন্ধ্যা, নিত্য যেমন আসে, আসিয়া পূজা করিয়া মন্দির দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিল এবং পূজার সময় ভিন্ন অন্য সময়ে, যে সকল দর্শনাভিলাষী আসিতে লাগিল তাহারা, দ্বারের জাফ্‌রির রন্ধ্রমধ্য দিয়া দর্শনী প্রণামী মন্দিরের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যাইতে থাকিল। কাজেই কৃষাণ বালকদিগের আর পূর্ব্বের ন্যায় ঐ সকল পয়সা আত্মসাৎ করা ও মিষ্টান্নাদি

ক্রয় করিয়া দেবীকে একবার দেখাইয়া ভোজন ও আনন্দ করার সুবিধা রহিল না। তাহারা ক্ষুণ্ণমনে মাকে জানাইল—মা মন্দিরে ঢুকিয়া আমাদের খাওয়া বন্ধ করিলি? তোর দৌলতে নিত্য লাড্ডু মোয়া খাইতাম, এখন আমাদের আর ঐ সকল কে খাইতে দিবে?

গ্রামবাসীরা বলে—সরল কৃষাণ বালকদিগের ঐ অভিযোগ দেবী শুনিলেন এবং ঐ রাত্রেই ঐ মন্দির এমন ফাটিয়া গেল যে পরদিন ঠাকুর চাপা পড়িবার ভয়ে পুরোহিত শশব্যস্তে দেবীকে পুনরায় বাহিরে অম্বরতলে আনিয়া রাখিল! তদবধি যে কেহ পুনরায় মন্দির নির্ম্মাণের জন্য চেষ্টা করিয়াছে তাহাদিগকেই দেবী স্বপ্নে বা অন্য নানা উপায়ে জানাইয়াছেন ঐ কর্ম্ম তাঁহার অভিপ্রেত নয়। গ্রামবাসীরা বলে—তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও মা ভয় দেখাইয়াও নিরস্ত করিয়াছেন!—স্বপ্নে বলিয়াছেন, "আমি রাখাল বালকদের সঙ্গে মাঠের মাঝে বেশ আছি; মন্দির মধ্যে আমায় আবদ্ধ কর্‌লে তোর সর্ব্বনাশ কোর্‌বো—বংশে কাহাকেও জীবিত রাখ্‌বো না।"

ঠাকুরের আট বৎসর বয়স—এখনও উপনয়ন হয় নাই। গ্রামের ভদ্রঘরের অনেকগুলি স্ত্রীলোক একদিন দলবদ্ধ হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে ৺বিশালাক্ষী দেবীর মানত্‌ শোধ করিতে মাঠ ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিলেন। ঠাকুরের নিজ পরিবারের দুই এক জন স্ত্রীলোক এবং গ্রামের জমিদার ধর্ম্মদাস লাহার বিধবা ভগ্নী প্রসন্নও ইঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। প্রসন্নের সরলতা, ধর্ম্মপ্রাণতা, পবিত্রতা ও অমায়িকতা সম্বন্ধে ঠাকুরের উচ্চধারণা ছিল। সকল বিষয় প্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার পরামর্শ মত চলিতে ঠাকুর, মাতাঠাকুরাণীকে অনেকবার বলিয়াছিলেন এবং প্রসন্নের কথা সময়ে সময়ে নিজ স্ত্রীভক্তদিগকেও বলিতেন। প্রসন্নও ঠাকুরকে বালক-

কাল হইতে অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহাকে যথার্থ গদাধর বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। সরলা স্ত্রীলোক গদাধরের মুখে ঠাকুর দেবতার পুণ্য কথা এবং ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়া মোহিত হইয়া অনেকবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"হাঁ গদাই তোকে সময়ে সময়ে ঠাকুর বলে মনে হয় কেন বল্ দেখি? হাঁরে, সত্যি সত্যিই ঠাকুর মনে হয়!" গদাই শুনিয়া মধুর হাসি হাসিতেন কিন্তু কিছুই বলিতেন না; অথবা অন্য পাঁচ কথা পাড়িয়া তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন। প্রসন্ন সে সকল কথায় না ভুলিয়া গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন—"তুই যাই বলিস্ তুই কিন্তু মানুষ নোস্।" প্রসন্ন ৺রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিজ হস্তে নিত্য সেবার আয়োজন করিয়া দিতেন। পাল পার্ব্বনে ঐ মন্দিরে যাত্রা গান হইত। প্রসন্ন কিন্তু উহার অল্পই শুনিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—"গদাইয়ের গান শুনে আর কোন গান মিঠে (মিষ্ট) লাগেনি—গদাই কান্ খারাপ করে দিয়ে গিয়েছে"—অবশ্য এ সকল অনেক পরের কথা।

স্ত্রীলোকেরা যাইতেছেন দেখিয়া বালক গদাই বলিয়া বসিলেন, 'আমিও যাইব।' বালকের কষ্ট হইবে ভাবিয়া স্ত্রীলোকেরা নানারূপে নিষেধ করিলেও কোন কথা না শুনিয়া গদাধর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। স্ত্রীলোকদিগেরও তাহাতে আনন্দ ভিন্ন বেজার বোধ হইল না। কারণ, সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত রঙ্গরসপ্রিয় বালক কাহার না মন হরণ করে? তাহার উপর এই অল্প বয়সে গদাইয়ের ঠাকুর দেবতার গান ছড়া সব কণ্ঠস্থ। পথে চলিতে চলিতে তাঁহাদিগের অনুরোধে তাহার দুই চারিটা সে বলিবেই বলিবে। আর ফিরিবার সময় তাহার ক্ষুধা পাইলেও ক্ষতি নাই, দেবীর প্রসাদী নৈবেদ্য দুগ্ধাদি ত তাঁহাদিগের সঙ্গেই থাকিবে;

তবে আর কি ? গদাইয়ের সঙ্গে যাওয়ায় বিরক্ত হইবার কি আছে বল ? রমণীগণ ঐ প্রকার নানা কথা ভাবিয়া গদাইকে সঙ্গে লইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পথ বাহিয়া চলিলেন এবং গদাইও তাঁহারা যেরূপ ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর দেবতার গল্প গান করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে চলিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিশালাক্ষী দেবীর মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রান্তর পার হইবার পূর্ব্বেই এক অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল। বালক গান করিতে করিতে সহসা থামিয়া গেল, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অবশ আড়ষ্ট হইয়া গেল, চক্ষে অবিরল জলধারা বহিতে লাগিল এবং 'কি অসুখ করিতেছে' বলিয়া তাঁহাদিগের বারম্বার সস্নেহ আহ্বানে সাড়া পর্য্যন্ত দিল না ! পথ চলিতে অনভ্যস্ত, কোমল বালকের রৌদ্র লাগিয়া সর্দ্দি-গর্ম্মি হইয়াছে ভাবিয়া রমণীগণ বিশেষ শঙ্কিত হইলেন এবং সন্নিহিত পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া বালকের মস্তকে ও চক্ষে প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও বালকের কোনরূপ সংজ্ঞার উদয় না হওয়ায় তাঁহারা এইবার মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং ভাবিলেন, এখন উপায় ?—দেবীর মানত্ পূজাই বা কেমন করিয়া দেওয়া হয় এবং পরের বাছা গদাইকে বা ভালয় ভালয় কিরূপে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয় ; প্রান্তরে জনমানব নাই যে সাহায্য করে—এখন উপায় ? স্ত্রীলোকেরা বিশেষ বিপন্না হইলেন এবং ঠাকুর দেবতার কথা ভুলিয়া বালককে ঘিরিয়া বসিয়া কখন ব্যজন, কখন জলসেক এবং কখন বা তাহার নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল এইরূপে গত হইলে প্রসন্নের প্রাণে সহসা উদয় হইল—বিশ্বাসী সরল বালকের উপর দেবীর ভর হয় নাই ত ?—

এইরূপ সরলপ্রাণ পবিত্র দেবভক্ত বালক ও স্ত্রী পুরুষদের উপরেই ত দেবদেবীর ভর হয়, শুনিয়াছি! প্রসন্ন সঙ্গী রমণীগণকে ঐকথা বলিলেন এবং এখন হইতে গদাইকে না ডাকিয়া একমনে ৺বিশালাক্ষীরই নাম করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রসন্নের পুণ্যচারিত্র্যে তাঁহার উপর শ্রদ্ধা রমণীগণের পূর্ব্ব হইতেই ছিল, সুতরাং সহজেই ঐ কথায় বিশ্বাসিনী হইয়া এখন দেবীজ্ঞানে বালককেই সম্বোধন করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন—'মা বিশালাক্ষী প্রসন্না হও, মা রক্ষা কর, মা বিশালাক্ষী মুখ তুলে চাও, মা অকুলে কুল দাও!'

আশ্চর্য্য! রমণীগণ কয়েক বার ঐরূপে দেবীর নাম গ্রহণ করিতে না করিতেই গদাইয়ের মুখমণ্ডল মধুর হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং বালকের অল্প স্বল্প সংজ্ঞার লক্ষণ দেখা গেল! তখন আশ্বাসিতা হইয়া তাঁহারা বালকশরীরে বাস্তবিকই দেবীর ভর হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ও মাতৃ-সম্বোধনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। *

ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া বালক প্রকৃতিস্থ হইল এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, ইতিপূর্ব্বের ঐ রূপ অবস্থার জন্য তাহার শরীরে কোনরূপ অবসাদ বা দুর্ব্বলতা লক্ষিত হইল না। রমণীগণ তখন তাহাকে লইয়া ভক্তিগদ্গদচিত্তে ৺দেবীস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি পূজা দিয়া গৃহে ফিরিয়া ঠাকুরের মাতার নিকট সকল কথা আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন। তিনি তাহাতে ভীতা হইয়া গদাইয়ের কল্যাণে সেদিন কুলদেবতা ৺রঘুবীরের বিশেষ পূজা

* কেহ কেহ বলেন, এই সময়ে ভক্তির আতিশয্যে স্ত্রীলোকেরা বিশালাক্ষীর নিমিত্ত আনীত নৈবেদ্যাদিও বালককে ভোজন করিতে দিয়াছিলেন।

দিলেন এবং ৺বিশালাক্ষীর উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া তাঁহারও বিশেষ পূজা অঙ্গীকার করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের আর একটী ঘটনা, বাল্যকাল হইতে তাঁহার মধ্যে মধ্যে উচ্চ ভাব ভূমিতে উঠিবার বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করে। ঘটনাটী এইরূপ হইয়াছিল—

কামারপুকুরে ঠাকুরের পিত্রালয় হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে কিয়দ্দূরে একঘর সুবর্ণ বণিক বাস করিত। পাইনরা যে, তখন বিশেষ শ্রীমান ছিল তৎপরিচয় তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত ইষ্টকনির্ম্মিত শিবমন্দিরে এখনও পাওয়া যায়। ঐ পরিবারের দুই একজন মাত্র এখন বাঁচিয়া আছে এবং ঘর দ্বার ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইয়াছে। গ্রামের লোকের নিকট শুনিতে পাওয়া যায় পাইনদের তখন কত শ্রীবৃদ্ধি ছিল, বাটীতে লোক ধরিত না এবং জমী জারাৎ চাষ বাস্ গরু লাঙ্গলও যেমন ছিল নিজেদের ব্যবসায়েও তেমনি বেশ দুপয়সা আয় ছিল। তবে পাইনরা গ্রামের জমিদারদের মত ধনাঢ্য ছিল না, মধ্যবিৎ গৃহস্থ শ্রেণীভুক্ত ছিল।

পাইনদের কর্ত্তা বিশেষ ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। সমর্থ হইলেও নিজের বসত বাটীটী ইষ্টকনির্ম্মিত করিতে প্রয়াস পান নাই, বরাবর মাট-কোটাতেই† বাস করিতেন; দেবালয়টী কিন্তু ইষ্টক পোড়াইয়া বিশিষ্ট শিল্পী নিযুক্ত করিয়া সুন্দরভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কর্ত্তার নাম রসিক লাল ছিল, তাঁহার পুত্র সন্তান ছিল না; কন্যা অনেকগুলি ছিল এবং বিবাহিতা হইলেও সকলগুলিই, কি

শিবরাত্রিকালে শিব সাজিয়া ঠাকুরের তৃতীয় ভাবাবেশ।

† বাঁশ, কাঠ, খড়, মৃত্তিকা সহায়ে নির্ম্মিত দ্বিতল বাটীকে পল্লীগ্রামে "মাঠ-কোটা" বলে। ইহাতে ইষ্টকের সম্পর্ক থাকে না।

কারণে বলিতে পারি না, সর্ব্বদা পিত্রালয়েই বাস করিত। শুনিয়াছি, ঠাকুরের যখন দশ বার বৎসর বয়স তখন উহাদের সর্ব্ব-কনিষ্ঠা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। কন্যাগুলি সকলেই রূপবতী ও দেবদ্বিজভক্তিপরায়ণা ছিল এবং প্রতিবেশী বালক গদাইকে বিশেষ স্নেহ করিত। ঠাকুর বাল্যকালে অনেক সময় এই ধর্ম্ম-নিষ্ঠ পরিবারের ভিতর কাটাইতেন এবং পাইনদের বাটীতে তাঁহার উচ্চ ভাব-ভূমিতে উঠিয়া অনেক লীলার কথা এখনও গ্রামে শুনিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ঘটনাটী কিন্তু আমরা ঠাকুরের নিকটেই শুনিয়াছিলাম।

কামারপুকুরে বিষ্ণুভক্তি ও শিবভক্তি পরস্পর দ্বেষাদ্বেষি না করিয়া বেশ পাশাপাশি চলিত বলিয়া বোধ হয়। এখনও শিবের গাজনের ন্যায় বৎসর বৎসর বিষ্ণুর চব্বিশ প্রহরী নাম-সংকীর্ত্তন সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তবে শিবমন্দির ও শিবস্থানের সংখ্যা, বিষ্ণু মন্দিরাপেক্ষা অধিক। সুবর্ণ বণিকদিগের ভিতর অনেকেই গোঁড়া বৈষ্ণব হইয়া থাকে; নিত্যানন্দ প্রভুর উদ্ধারণ দত্তকে দীক্ষা দিয়া উদ্ধার করিবার পর হইতে ঐ জাতির ভিতর বৈষ্ণব মত বিশেষ প্রচলিত। কামারপুকুরের পাইনরা কিন্তু শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই ভক্ত ছিল। বৃদ্ধ কর্ত্তা পাইন, একদিকে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা হরিনাম যেমন করিতেন তেমনি আবার অন্যদিকে শিব প্রতিষ্ঠা এবং শিবরাত্রি ব্রত পালন করিতেন। রাত্রি জাগরণে সহায়ক হইবে বলিয়া ঐ ব্রতকালে পাইনদের বাটীতে যাত্রা গানের বন্দোবস্ত হইত।

একবার ঐরূপে শিবরাত্রি ব্রতকালে পাইনদের বাটীতে যাত্রার বন্দোবস্ত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী গ্রামেরই দল, শিবমহিমাসূচক পালা গাহিবে, রাত্রি একদণ্ড পরে যাত্রা বসিবে। সন্ধ্যার সময়

সংবাদ পাওয়া গেল যাত্রার দলে যে বালক শিব সাজিয়া থাকে, তাহার সহসা কঠিন পীড়া হইয়াছে, শিব সাজিবার লোক বহু সন্ধানেও পাওয়া যাইতেছে না, অধিকারী হতাশ হইয়া অদ্যকার নিমিত্ত যাত্রা বন্ধ রাখিতে মিনতি করিয়া পাঠাইয়াছেন! এখন উপায়? শিবরাত্রিতে রাত্রি জাগরণ কেমন করিয়া হয়? বৃদ্ধেরা পরামর্শ করিতে বসিলেন এবং অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, শিব সাজিবার লোক দিলে তিনি অদ্য রাত্রে যাত্রা করিতে পারিবেন কি না। উত্তর আসিল, শিব সাজিবার লোক পাইলে পারিব। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ আবার পরামর্শ জুড়িল, শিব সাজিতে কাহাকে অনুরোধ করা যায়। স্থির হইল, গদাইয়ের বয়স অল্প হইলেও সে অনেক শিবের গান জানে এবং শিব সাজিলে তাহাকে দেখাইবেও ভাল, তাহাকেই বলা যাক্। তবে শিব সাজিয়া একটু আধটু কথাবার্ত্তা কহা, তাহা অধিকারী স্বয়ং কৌশলে চালাইয়া লইবে। গদাধরকে বলা হইল, সকলের আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঐ কার্য্যে সম্মত হইলেন। পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত কথামত রাত্রি একদণ্ড পরে যাত্রা বসিল।

গ্রামের জমীদার ধর্ম্মদাস লাহার, ঠাকুরের পিতার সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দ থাকায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গঙ্গাবিষ্ণু লাহা ও ঠাকুর উভয়ে 'স্যাঙাৎ' পাতাইয়া ছিলেন। 'স্যাঙাৎ' শিব সাজিবেন জানিয়া গঙ্গাবিষ্ণু ও তাঁহার দলবল মিলিয়া ঠাকুরের অনুরূপ বেশ ভূষা করিয়া দিতে লাগিলেন। ঠাকুর শিব সাজিয়া সাজঘরে বসিয়া শিবের কথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার আসরে ডাক পড়িল এবং তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে জনৈক পথ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে আসরের দিকে লইয়া যাইতে উপস্থিত হইল। বন্ধুর আহ্বানে ঠাকুর উঠিলেন এবং কেমন উন্মনাভাবে কোনদিকে

লক্ষ্য না করিয়া ধীর মন্থর গতিতে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ঠাকুরের সেই জটাজটিল বিভূতি-মণ্ডিত বেশ, সেই ধীর স্থির পাদক্ষেপ ও পরে অচল অটল স্থিতি এবং বিশেষতঃ সেই অপার্থিব অন্তর্মুখী নির্নিমেষ দৃষ্টি ও অধরকোণে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখিয়া লোকে কি এক অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় দিব্য ভাব উপলব্ধি করিয়া আনন্দে বিস্ময়ে পল্লীগ্রামের প্রথামত উচ্চরবে হরি ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং রমণীগণের কেহ কেহ উলুধ্বনি এবং কেহ কেহ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর সকলকে স্থির করিবার জন্য অধিকারী ঐ গোলযোগের ভিতরেই শিবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শ্রোতারা কথঞ্চিৎ স্থির হইল বটে কিন্তু পরস্পরে ইসারা ও গা ঠেলিয়া, 'বাহবা, বাহবা গদাইকে কি সুন্দর দেখাইতেছে, ছোঁড়া শিবের পালাটা এত সুন্দর কর্‌তে পার্‌বে তা কিন্তু ভাবিনি, ছোঁড়াকে বাগিয়ে নিয়ে আমাদের একটা যাত্রার দল কর্‌লে হয়,' ইত্যাদি—নানা কথা অনুচ্চস্বরে চলিতে লাগিল। গদাধর কিন্তু তখনও সেই একই ভাবে দণ্ডায়মান, অধিকন্তু তাঁহার বক্ষ বহিয়া অবিরত নয়নাশ্রু পতিত হইতেছে! এইরূপে কিছুক্ষণ অতীত হইলে গদাধর তখনও স্থান পরিবর্ত্তন বা বলা কহা কিছুই করিতেছেন না দেখিয়া অধিকারী ও পল্লীর বৃদ্ধ দুই এক জন বালকের নিকটে গিয়া দেখেন তাহার হস্ত পদ অসাড়—বালক সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্য! তখন গোলমাল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। কেহ বলিল—জল, জল, চোখে মুখে জল দাও; কেহ বলিল, বাতাস কর; কেহ বলিল—শিবের ভর হয়েচে, নাম কর; আবার কেহ বলিল—ছোঁড়াটা রস ভঙ্গ কর্‌লে, যাত্রাটা আর শোনা হোলো না দেখ্‌চি! যাহা হউক, বালকের কিছুতেই সংজ্ঞা হইতেছে না

দেখিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল এবং গদাধরকে কাঁধে লইয়া কয়েক জন কোনরূপে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল। শুনিয়াছি, সে রাত্রে গদাধরের সে ভাব বহু প্রযত্নেও ভঙ্গ হয় নাই এবং বাড়ীতে কান্নাকাটি উঠিয়াছিল। পরে সূর্য্যোদয় হইলে তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন।*

---

* কেহ কেহ বলেন তিনি তিন দিন সমভাবে ঐ অবস্থায় ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

সাধকভাবের প্রথম বিকাশ।

ঠাকুরের বাল্যজীবনে ভাবতন্ময়তার পরিচায়ক অন্যান্য দৃষ্টান্ত।

ভাবতন্ময়তা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি ভিন্ন আরও অনেক কথা ঠাকুরের বাল্যজীবনে শুনিতে পাওয়া যায়। ছোট খাট অনেক বিষয়ে তাঁহার মনের ঐরূপ স্বভাবের পরিচয় আমরা সময়ে সময়ে পাইয়া থাকি।

যেমন—গ্রামের কুম্ভকার শিব দুর্গাদি দেবদেবীর প্রতিমা গড়িতেছে, বয়স্যবর্গের সহিত যথা ইচ্ছা বেড়াইতে বেড়াইতে ঠাকুর তথায় আগমন করিয়া মূর্ত্তিগুলি দেখিতে দেখিতে সহসা বলিলেন—'এ কি হইয়াছে? দেব-চক্ষু কি এইরূপ হয়?—এই ভাবে আঁকিতে হয়'—বলিয়া যে ভাবে টান দিয়া অঙ্কিত করিলে চক্ষে অমানব শক্তি, করুণা অন্তর্মুখীনতা ও আনন্দের একত্র সমাবেশ উপস্থিত হইয়া মূর্ত্তিগুলিকে জীবন্ত দেবভাব-সম্পন্ন করিয়া তুলিবে তাহাকে তদ্বিষয় বুঝাইয়া দিলেন! বালক গদাধর কখনও শিক্ষালাভ না করিয়া কেমন করিয়া ঐ কথা বুঝিতে ও বুঝাইতে সক্ষম হইল, সকলে অবাক হইয়া তাহা ভাবিতে থাকিল এবং ঐ বিষয়ের কারণ খুঁজিয়া পাইল না!

যেমন—ক্রীড়াচ্ছলে বয়স্যদিগের সহিত কোন দেববিশেষের পূজা করিবার সঙ্কল্প করিয়া ঠাকুর স্বহস্তে ঐ মূর্ত্তি এমন সুন্দর ভাবে গড়িলেন, বা আঁকিলেন যে লোকে দেখিয়া উহা দক্ষ কুম্ভকার বা পটুয়ার কার্য্য বলিয়া স্থির করিল!

যেমন—অযাচিত অতর্কিতভাবে কোন ব্যক্তিকে এমন কোন কথা বলিলেন যাহাতে তাহার মনোগত বহুকালের সন্দেহ-বিশেষ মিটিয়া গেল বা সে তাহার ভাবী জীবন নিয়মিত করিবার বিশেষ সন্ধান ও শক্তি লাভ করিয়া স্তম্ভিতহৃদয়ে ভাবিতে লাগিল, বালক গদাইকে আশ্রয় করিয়া তাহার আরাধ্য দেবতা কি করুণায় তাহাকে ঐরূপে পথ দেখাইলেন!

যেমন—শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা যে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না, বালক গদাই তাহা এক কথায় মিটাইয়া দিলেন ও সকলকে চমৎকৃত করিলেন।*

ঠাকুরের জীবনের ঐ সকল ঘটনার ছয় প্রকার শ্রেণীনির্দ্দেশ।

ঠাকুরের বাল্যজীবন সম্বন্ধে ঐরূপ যে সকল অদ্ভুত ঘটনা আমরা শুনিয়াছি তাহার সকলগুলিই যে তাঁহার অনন্যসাধারণ উচ্চ ভাবভূমিতে আরোহণ করিয়া দিব্যশক্তি প্রকাশের পরিচায়ক, তাহা নহে। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ঐরূপ হইলেও অপর সকল গুলিকে আমরা সাধারণতঃ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। উহাদিগের কতকগুলি তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতির, কতকগুলি প্রবল বিচারবুদ্ধির, কতকগুলি বিশেষ নিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার, কতকগুলি অসীম সাহসের, কতকগুলি রঙ্গরসপ্রিয়তার, এবং কতকগুলি অপার প্রেম বা করুণার পরিচায়ক। পূর্ব্বোক্ত সকল শ্রেণীর সকল ঘটনাবলীর ভিতরেই কিন্তু তাঁহার মনের অসাধারণ বিশ্বাস, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা ওতপ্রোতপ্রভাবে জড়িত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায়,—বিশ্বাস, পবিত্রতা ও স্বার্থহীনতা-রূপ উপাদানে তাঁহার মন যেন স্বভাবতঃ নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং

* গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায়, ১২৬ পৃষ্ঠা দেখ।

সংসারের নানা ঘাত প্রতিঘাত উহাতে স্মৃতি, বুদ্ধি, প্রতিজ্ঞা, সাহস, রঙ্গরস, প্রেম ও করুণার তরঙ্গসমূহের সময়ে সময়ে উদয় করিতেছে। কয়েকটী দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা সম্যকরূপে ধারণা করিতে পারিবেন।

অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির দৃষ্টান্ত।

পল্লীতে রাম বা কৃষ্ণযাত্রা হইয়াছে, অন্যান্য লোকের সহিত বালক গদাধরও তাহা শুনিয়াছে; ঐসকল পবিত্র পুরাণকথা ও গানের বিষয় ভুলিয়া পরদিন যে যাহার স্বার্থচেষ্টায় লাগিয়াছে। কিন্তু বালক গদাইয়ের মনে উহা যে ভাবতরঙ্গ তুলিয়াছে তাহার বিরাম নাই; বালক ঐ সকলের পুনরাবৃত্তি করিয়া আনন্দোপভোগের জন্য বয়স্যবর্গকে সমীপস্থ আম্রকাননে একত্র করিয়াছে এবং উহাদিগের প্রত্যেককে পালার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা যথাসম্ভব আয়ত্ত করাইয়া ও আপনি প্রধান চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া উহার অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে! সরল কৃষাণ পার্শ্বের ভূমিতে চাষ দিতে দিতে বালকদিগের ঐরূপ ক্রীড়া দর্শনে মুগ্ধহৃদয়ে ভাবিতেছে একবার মাত্র শুনিয়া পালাটীর প্রায় সমগ্র কথা ও গানগুলি উহারা এরূপে আয়ত্ত করিল কিরূপে?

দৃঢ় প্রতিজ্ঞার দৃষ্টান্ত।

উপনয়নকালে বালক, আত্মীয় স্বজন এবং সমাজপ্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে ধরিয়া বসিল, কর্ম্মকারজাতীয়া ধনী নাম্নী কামিনীকে ভিক্ষামাতা স্বরূপে বরণ করিবে!* অথবা, ধনীর স্নেহ ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া এবং তাহার হৃদয়ের অভিলাষ জানিতে পারিয়া বালক সামাজিক শাসনের কথা ভুলিয়া ঐ নীচ জাতীয়া রমণীর স্বহস্ত-পক্ক ব্যঞ্জনাদি কাড়িয়া খাইল!—ধনীর ভীতি-প্রসূত

* গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায় ১৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

সাগ্রহ নিষেধ বালককে ঐ কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারিল না।

অসীম সাহসের দৃষ্টান্ত।

বিভূতিমণ্ডিত জটাধারী নাগা ফকীর দেখিলে সহর বা পল্লীগ্রামের সকল বালকের হৃদয়ে সর্ব্বদা ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐরূপ ফকীরেরা অল্পবয়স্ক বালকদিগকে নানারূপে ভুলাইয়া অথবা, সুযোগ পাইলে বলপ্রয়োগ করিয়া দূরদেশে লইয়া যাইয়া দলপুষ্টি করে এরূপ কিম্বদন্তি বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রচলিত। কামারপুকুরের দক্ষিণ প্রান্তে ৺পুরীধামে যাইবার যে পথ আছে সেই পথ দিয়া তখন তখন নিত্য ঐরূপ সাধু ফকীর বৈরাগী বাবাজীর দল যাওয়া আসা করিত এবং গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা আহার্য্য সংগ্রহপূর্ব্বক দুই এক দিন বিশ্রাম করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইত। কিম্বদন্তিতে ভীত হইয়া বয়স্যগণ দূরে পলাইলেও বালক গদাই ভীত হইবার পাত্র ছিল না। ঐরূপ ফকীরের দল দেখিলেই তাহাদিগের সহিত মিশিয়া মধুরালাপ ও সেবায় তাহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া তাহাদের আচারব্যবহার তন্ন তন্নভাবে লক্ষ্য করিবার জন্য অনেক কাল তাহাদের সঙ্গে কাটাইত। কোন' কোন দিন তাহাদিগের সপ্রেমাহ্বানে দেবোদ্দেশ্যে নিবেদিত তাহাদিগের অন্ন খাইয়া বালক বাটীতে ফিরিত এবং মাতার নিকট ঐ বিষয়ে গল্প করিত। তাহাদিগের প্রতি অনুরাগবশতঃ বৈরাগীবেশধারণের জন্য ব্যস্ত হইয়া বালক একদিন সর্ব্বাঙ্গ তিলকাঙ্কিত করিয়া পিতা' মাতা প্রদত্ত নূতন বসনখানি ছিঁড়িয়া কৌপীন ও বহির্ব্বাসরূপে ধারণ করিয়া বাটীতে জননীর নিকট আগমন করিয়াছিল!

গ্রামের নীচ জাতিদের ভিতর অনেকে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতে জানিত না। ঐ সকল গ্রন্থ শুনিবার ইচ্ছা

হইলে তাহারা পড়িয়া বুঝাইয়া দিতে পারে এমন কোন ব্রাহ্মণ বা স্বশ্রেণীর লোককে আহ্বান করিত এবং ঐ ব্যক্তি আগমন করিলে ভক্তিপূর্ব্বক পদ ধৌত করিবার জল, নূতন হুঁকায় তামাকু এবং উপবেশন করিয়া পাঠ করিবার জন্য উত্তম আসন বা তদভাবে নূতন একখানি মাতুর প্রদান করিত। ঐরূপে সম্মানিত হইয়া সে ব্যক্তি ঐকালে অহঙ্কার অভিমানে স্ফীত হইয়া শ্রোতাদিগের নিকটে কিরূপ উচ্চাসন গ্রহণ করিত এবং কত প্রকার বিসদৃশ অঙ্গভঙ্গী ও সুরে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে তাহাদিগকে আপন প্রাধান্য জ্ঞাপন করিত, তীক্ষ্ণবিচারসম্পন্ন রঙ্গরসপ্রিয় বালক ঐস্থানে উপস্থিত থাকিয়া তাহা লক্ষ্য করিত এবং সময়ে সময়ে অপরের নিকট গম্ভীরভাবে উহার অভিনয় করিয়া হাস্য কৌতুকের রোল ছুটাইয়া দিত।

রসরঙ্গপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত।

ঠাকুরের বাল্যজীবনের ঐ সকল কথার আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি তিনি কিরূপ মন লইয়া সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। বুঝিতে পারি যে, ঐরূপ মন, যাহা ধরিবে তাহা করিবেই করিবে, যাহা শুনিবে তাহা কখনও ভুলিবে না এবং অভীষ্টলাভের পথে যাহা অন্তরায় বলিয়া বুঝিবে সবলহস্তে তাহা তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করিবে। বুঝিতে পারি যে, ঐরূপ হৃদয়, ঈশ্বরের উপর, আপনার উপর এবং মানবসাধারণের অন্তর্নিহিত দেবপ্রকৃতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সংসারের সকল কার্য্যে অগ্রসর হইবে, নীচ অপবিত্র ভাবসমূহ ত দূরের কথা—সঙ্কীর্ণতার স্বল্পমাত্র গন্ধও যে সকল ভাবে অনুভূত হইবে কখনই তাহাকে উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না, এবং পবিত্রতা প্রেম ও করুণাই

ঠাকুরের মনের স্বাভাবিক গঠন।

কেবল উহাকে সর্ব্বকাল সর্ব্ব বিষয়ে নিয়মিত করিবে। আবার ঐ সঙ্গে একথাও হৃদয়ঙ্গম হয় যে, আপনার বা অন্যের অন্তরের কোন ভাবই আপন আকার লুক্কায়িত রাখিয়া ছদ্মবেশে ঐরূপ হৃদয়মনকে কখনও প্রতারিত করিতে পারিবে না। ঠাকুরের হৃদয়মনের ঐরূপ গঠনের কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হইলে তবেই আমরা তাঁহার সাধকজীবনের অনুষ্ঠান-সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব।

সাধকভাবের প্রথম প্রকাশ—'চাল কলা বাঁধা বিদ্যা শিখিব না, যাহাতে যথার্থ জ্ঞান হয় সেই বিদ্যা শিখিব'।

সাধকভাবের প্রথম বিকাশ ঠাকুরের জীবনে আমরা দেখিতে পাই কলিকাতায়, তাঁহার ভ্রাতার চতুষ্পাঠীতে—যেদিন বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হইবার জন্য অগ্রজ রামকুমারের তিরস্কার ও অনুযোগের উত্তরে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন—"চাল কলা বাঁধা বিদ্যা আমি শিখিতে চাহি না; আমি এমন বিদ্যা শিখিতে চাহি যাহাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়!" ঠাকুরের বয়স তখন সতর বৎসর হইবে। গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষা বিশেষ অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া অভিভাবকেরা পরামর্শ স্থির করিয়া উহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া রাখিয়াছেন। ঝামাপুকুরে ৺দিগম্বর মিত্রের বাটীর সমীপে জ্যোতিষ এবং স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন তাঁহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অগ্রজ তখন টোল খুলিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত মিত্র পরিবার ভিন্ন পল্লীর অপর কয়েকটী বর্দ্ধিষ্ণু ঘরে নিত্য দেবসেবার ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক ছাত্রগণকে পাঠ দান করিতেই তাঁহার প্রায় সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত, সুতরাং অপরের গৃহে দুই সন্ধ্যা নিত্য গমন করিয়া দেব-

সেবা যথারীতি সম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে বিষম ভার হইয়া উঠিতেছিল। অথচ সহসা উহা ত্যাগ করিতেও পারিতেছিলেন না। কারণ, বিদায় আদায়ে টোলের যাহা উপসত্ব হইত, তাহা অল্প, এবং দিন দিন হ্রাস ভিন্ন উহার বৃদ্ধি হইতেছিল না; এরূপ অবস্থায় দেবসেবার পারিশ্রমিক স্বরূপে যাহা পাইয়া থাকেন তাহা ত্যাগ করিলে সংসার চলিবে কিরূপে? অতএব নানা তোলাপাড়ার পর কনিষ্ঠকে আনাইয়া তাহার উপর দেবসেবার ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং অধ্যাপনাতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। গদাধর এখানে আসিয়া নিজ মনোমত কর্ম্ম পাইয়া উহা সানন্দে সম্পন্ন করিতেছিলেন, এবং অগ্রজের সেবা ভিন্ন কিছু কিছু পাঠাভ্যাসও করিতেছিলেন। অশেষ গুণসম্পন্ন প্রিয়দর্শন বালক অল্পকালেই যজমান পবিবারবর্গ সকলের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কামারপুকুরের ন্যায় এখানেও ঐ সকল সম্ভ্রান্ত পরিবারের রমণীগণ তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা, সরল ব্যবহার, মিষ্টালাপ এবং দেবভক্তি দর্শনে তাঁহার নিকট নিঃসঙ্কোচে আগমন করিতেছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা ছোট খাট 'ফাইফরমাস' করাইয়া লইতে এবং তাঁহার মধুর কণ্ঠের ভজন শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। এইরূপে কামারপুকুরের ন্যায় এখানেও বালকের একটী আপনার দল বিনা চেষ্টায় গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং বালকও অবসর পাইলেই ঐ সকল স্ত্রীপুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দে দিন কাটাইতেছিলেন। সুতরাং এখানে আসিয়াও বালকের বিদ্যাশিক্ষার যে বড় একটা সুবিধা হইতেছিল না, একথা বুঝিতে পারা যায়।

কলিকাতায় ঝামাপুকুরে রামকুমারের টোলে বাসকালে ঠাকুরের আচরণ।

রামকুমার পূর্ব্বোক্ত বিষয় লক্ষ্য করিয়াও ভ্রাতাকে সহসা কিছু বলিতে পারিতেছিলেন না। কারণ, একে ত মাতার প্রিয় কনিষ্ঠকে তাঁহার স্নেহসুখে বঞ্চিত করিয়া এক প্রকার, নিজের সুবিধার জন্যই দূরে আনিয়াছেন তাহার উপর ভ্রাতার গুণে আকৃষ্ট হইয়া লোকে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া সাদরে বাটীতে আহ্বান ও নিমন্ত্রণাদি করিতেছে, বালকও তাহাতে আনন্দিত, এ অবস্থায় বালকের আনন্দে বিঘ্নোৎপাদন করা কি যুক্তি-যুক্ত ?—এবং ঐরূপ করিলে বালকের কলিকাতাবাস কি বনবাস-তুল্য অসহ্য হইয়া উঠিবে না ? সংসারে অভাব না থাকিলে বালককে মাতার নিকট হইতে দূরে আনিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কামারপুকুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামান্তরে কোন মহো-পাধ্যায়ের নিকটে পড়িতে পাঠাইলেই চলিত। বালক তাহাতে মাতার নিকটে থাকিয়াই বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিত। ঐরূপ চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া রামকুমার কয়েক মাস কোন কথা না বলিলেও পরিশেষে কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রেরণায় একদিন বালককে পাঠে মনোযোগী হইবার জন্য মৃদু তিরস্কার করিয়াছিলেন। কারণ—সরল, সর্ব্বদা আত্মহারা বালককে পরে ত সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হইবে ? এখন হইতে যদি সে আপনার সাংসারিক অবস্থার যাহাতে উন্নতি হয় এমন পথে আপনাকে নিয়মিত করিয়া চলিতে না শিখে তবে ভবিষ্যতে কি আর ঐরূপ করিতে পারিবে ? অতএব ভ্রাতৃবাৎসল্য এবং সংসারের অভিজ্ঞতাই যে, রামকুমারকে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল একথা স্পষ্ট।

কিন্তু স্নেহপরবশ রামকুমার সংসারের স্বার্থপর কঠোর প্রথায় ঠেকিয়া শিখিয়া কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও নিজ কনিষ্ঠের অদ্ভুত মানসিক গঠন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। বালক

নিজ ভ্রাতার মানসিক প্রকৃতি সম্বন্ধে রামকুমারের অনভিজ্ঞতা।

যে, এই অল্প বয়সেই সংসারী মানবের সর্ব্ববিধ চেষ্টার এবং আজীবন পরিশ্রমের কারণ ধরিতে পারিয়াছে, এবং দুই দিনের প্রতিষ্ঠা ও ভোগসুখলাভকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মানবজীবনের অন্য উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত করিয়াছে, একথা তিনি স্বপ্নেও হৃদয়ে আনয়ন করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিরস্কারে বিচলিত না হইয়া সরল বালক যখন তাঁহাকে প্রাণের কথা পূর্ব্বোক্তরূপে খুলিয়া বলিল তখন তিনি বালকের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, পিতামাতার বহু আদরের বালক, জীবনে এই প্রথম তিরস্কৃত হইয়া অভিমান বা বিরক্তিতে ঐরূপ উত্তর প্রদান করিতেছে। সত্যনিষ্ঠ বালক তাঁহাকে আপন অন্তরের কথা বুঝাইতে সেদিন অনেক চেষ্টা পাইল, অর্থকরী বিদ্যা শিখিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছেনা একথা নানাভাবে প্রকাশ করিল, কিন্তু বালকের সে কথা শুনে কে? বালক ত বালক, বয়োবৃদ্ধ কাহাকেও যদি কোনদিন আমরা স্বার্থচেষ্টায় পরাঙ্মুখ দেখি তবে গম্ভীরভাবে সিদ্ধান্ত করিয়া বসি—তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে!

বালকের ঐ সকল কথা রামকুমার সেদিন বুঝিলেন না। অধিকন্তু ভালবাসার পাত্রকে তিরস্কার করিয়া পরক্ষণে আমরা যেমন অনুতপ্ত হই এবং তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে আদর যত্ন করিয়া স্বয়ং শান্তিলাভ করিতে চেষ্টা করি, কনিষ্ঠের প্রতি তাঁহার প্রতিকার্য্যে ব্যবহার এখন কিছুকাল ঐরূপ হইয়া উঠিল। বালক গদাধর কিন্তু নিজ মনোগত অভিপ্রায় সফল করিবার জন্য এখন হইতে যে, অবসর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এ বিষয়ের পরিচয় আমরা তাঁহার পর পর কার্য্য দেখিয়া বিশেষরূপে পাইয়া থাকি।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরের দুই বৎসরে ঠাকুর এবং তাঁহার অগ্রজের জীবনে পরিবর্ত্তনের প্রবাহ কিছু প্রবলভাবে চলিয়াছিল। অগ্রজের আর্থিক অবস্থা দিন দিন অবসন্ন হইতেছিল, এবং নানাভাবে চেষ্টা করিলেও তিনি কিছুতেই ঐ বিষয়ের উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছিলেন না। টোল বন্ধ করিয়া অপর কোন কার্য্য স্বীকার করিবেন কি না তদ্বিষয়ে নানা তোলাপাড়াও তাঁহার মনোমধ্যে চলিতেছিল। কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তবে একথা মনে মনে বেশ বুঝিতেছিলেন, যে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের অন্য উপায় শীঘ্র গ্রহণ না করিয়া এরূপে দিন কাটাইলে পরিশেষে ঋণগ্রস্ত হইয়া নানা অনর্থ উপস্থিত হইবে। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিবেন? যজন, যাজন, ও অধ্যাপন ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যই ত শিখেন নাই, এবং চেষ্টা করিয়া এখন যে, সময়োপযোগী কোন অর্থকরী বিদ্যা শিখিবেন সে উদ্যম উৎসাহই বা প্রাণে কোথায়? আবার, ঐরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের পথে অগ্রসর হইলে নিজ নিত্যক্রিয়া ও পূজাদি সম্পন্ন করিবার অবসর লাভ যে কঠিন হইবে, ইহাও বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং "যাহা করেন ৺রঘুবীর" বলিয়া ঐরূপ চিন্তা হইতে মনকে ফিরাইয়া যাহা এতকাল করিতেছিলেন তাহাই ভগ্নহৃদয়ে করিয়া যাইতে লাগিলেন। কারণ, ঈশ্বরবিশ্বাসী, সামান্যে সন্তুষ্ট, সাধুপ্রকৃতি রামকুমার বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ উদ্যমী পুরুষ ছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সে যাহা হউক ঐরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে একটী ঘটনা ঈশ্বরেচ্ছায় রামকুমারকে পথ দেখাইয়া শীঘ্রই নিশ্চিন্ত করিয়াছিল।

রামকুমারের সাংসারিক অবস্থা।

চতুর্থ অধ্যায়।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী।

সম্ভবতঃ সন ১২৫৬ সালে রামকুমার যখন কলিকাতায় চতুষ্পাঠী খুলিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর ছিল। সংসারের অভাব অনটন ঐ কালের কিছু পূর্ব্ব হইতে তাঁহাকে কিছু কিছু চিন্তিত করিয়াছিল এবং তাঁহার পত্নী একমাত্র পুত্র অক্ষয়কে প্রসবান্তে মৃত্যুমুখে পতিতা হইয়াছিলেন। কথিত আছে সাধক রামকুমার তাঁহার পত্নীর মৃত্যুর কথা পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন এবং পরিবারস্থ কাহাকেও কাহাকেও বলিয়াছিলেন, 'ও (তাঁহার পত্নী) এবার আর বাঁচিবে না।' ঠাকুর তখন চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। সমৃদ্ধিশালী কলিকাতায় নানা ধনী ও মধ্যবিৎ শ্রেণীর লোকের বাস; শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি ক্রিয়াকলাপে, বিবিধ ব্যবস্থাপত্রদানে এবং টোলের ছাত্রদিগকে বিদ্যালাভে পারদর্শী করিয়া সেখানে সুপণ্ডিত বলিয়া একবার খ্যাতি লাভ করিতে পারিলে সংসারের আয়ব্যয়ের জন্য তাঁহাকে আর চিন্তান্বিত হইতে হইবে না—বোধ হয় এইরূপ একটা কিছু ভাবিয়াই পত্নীবিয়োগবিধূর রামকুমার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। অথবা এমন হইতে পারে, পত্নী-বিয়োগে তিনি জীবনে যে বিশেষ পরিবর্ত্তন ও অভাব

রামকুমারের কলিকাতায় টোল খুলিবার কারণ ও সময়নিরূপণ।

অনুভব করিতেছিলেন, বিদেশে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে তাহার হস্ত হইতে স্বয়ং কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সংসারের আয়েরও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইবে এই-রূপ ধারণাই তাঁহাকে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। যাহাই হউক ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীর জন্ম হইবার আন্দাজ তিন চারি বৎসর পরে তিনি ঠাকুরকে যেজন্য কলিকাতায় আনয়ন করিয়া-ছিলেন এবং ১২৫৯ সালে কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুর যে ভাবে তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করেন তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি।

ঠাকুরের জীবনের অতঃপর ঘটনাবলী জানিতে হইলে আমাদিগকে অন্যত্র দৃষ্টি করিতে হইবে। বিদায় আদায়ের সুবিধার জন্য ছাতুবাবুর দলে নাম লিখাইয়া তাঁহার অগ্রজ যখন নিজ চতুষ্পাঠীর শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নপর ছিলেন তখন কলিকাতার অন্যত্র একস্থলে, এক সুবিখ্যাত পরিবারমধ্যে ঈশ্বরেচ্ছায় যে ঘটনাপরম্পরার উদয় হইতেছিল তাহাতেই এখন পাঠককে এক-বার মনোনিবেশ করিতে হইবে।

কলিকাতার দক্ষিণাংশে জানবাজার নামক পল্লীতে প্রথিত-কীর্ত্তি রাণী রাসমণির বাস ছিল। চারিটী কন্যার মাতা হইয়া রাণী চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন এবং স্বামী ৺রাজ-চন্দ্র দাসের প্রভূত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। তদবধি ঐ বিষয়ের তত্ত্বাবধানে স্বয়ং নিযুক্তা থাকিয়া এবং উহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া তিনি কলিকাতাবাসিগণের সুপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ, কেবল বিষয়কর্ম্মের পরিচালনায় দক্ষতা দেখাইয়া তিনি সাধারণের নিকট যশস্বিনী হয়েন নাই, কিন্তু সাহস বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব,

রাণী রাসমণি।

বিশ্বাস ভক্তি এবং ওজস্বিতা,* এবং সর্ব্বোপরি, দরিদ্রদিগের দুরবস্থার সহিত নিরন্তর সহানুভূতি, † অজস্র দান ও অকাতর অন্নব্যয়

* শুনা যায় রাণী রাসমণির জানবাজারের বাটীর নিকট পূর্ব্বে ইংরেজ সৈনিকদিগের একটী ব্যারাক্ বা আড্ডা তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল। মদ্যপানে উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকেরা একদিন রাণীর দ্বাররক্ষকদিগকে বলপ্রয়োগে অক্ষম করিয়া বাটী মধ্যে প্রবেশ ও লুটপাট করিতে আরম্ভ করে। মথুর বাবু প্রমুখ পুরুষেরা তখন কার্য্যান্তরে বাহিরে গিয়াছিলেন। সৈনিকেরা বাধা না পাইয়া ক্রমে অন্দরে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া রাণী স্বয়ং অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

† কথিত আছে গঙ্গায় মৎস্য ধরিবার জন্য ধীবরদিগের উপর ইংরাজ রাজ-সরকার একবার কর বসাইয়াছিলেন। ঐ সকল ধীবরদিগের অনেকে রাণীর জমীদারীতে বাস করিত। পূর্ব্বোক্ত কর বসায় তাহারা উৎপীড়িত হইয়া রাণীর নিকট আপনাদের দুঃখ কষ্টের কথা নিবেদন করে। রাণী শুনিয়া তাহাদিগকে অভয় দিলেন ও বহু অর্থ দিয়া সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে গঙ্গায় মৎস্য ধরিবার ইজারা লইলেন। সরকার বাহাদুর, রাণী মৎস্য ব্যবসায় করিবেন ভাবিয়া উক্ত অধিকার প্রদান করিবামাত্র গঙ্গার কয়েক স্থল এক কূল হইতে অন্য কূল পর্য্যন্ত রাণী এমন শৃঙ্খলিত করিলেন যে ইংরাজরাজের জলযানসমূহের নদী মধ্যে প্রবেশপথ প্রায় রুদ্ধ হইয়া যাইল। তাঁহারা তখন রাণীর ঐ কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে রাণী বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি অনেক অর্থব্যয়ে নদীতে মৎস্য ধরিবার অধিকার আপনাদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি; সেই অধিকারসূত্রেই ঐরূপ করিয়াছি; ঐরূপ করিবার কারণ, নদী মধ্য দিয়া জলযানাদি নিরন্তর গমনাগমন করিলে মৎস্য সকল অন্যত্র পলায়ন করিবে এবং আমার সমূহ ক্ষতি হইবে; অতএব নদীগর্ভ শৃঙ্খলমুক্ত কেমন করিয়া করিব? তবে যদি আপনারা নদীতে মৎস্য ধরিবার নূতন কর উঠাইয়া দিতে রাজী হন তবে আমিও

প্রভৃতি তাঁহার অন্তরের অশেষ গুণরাজী ও সুকর্ম্মানুষ্ঠানসমূহ তাঁহাকে সকলের বিশেষ প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। কৈবর্ত্তক কুলোদ্ভূতা এই রমণী তখন নিজগুণ ও কর্ম্মে আপন 'রাণী' নাম সার্থক করিতে এবং ব্রাহ্মণেতরনির্বিশেষে সকল জাতির হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি সর্ব্বপ্রকারে আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন রাণীর কন্যাগণের বিবাহ এবং সন্তান সন্ততি হইয়াছে; এবং একটী মাত্র পুত্র রাখিয়া রাণীর তৃতীয় কন্যার মৃত্যু হওয়ায়, প্রিয়দর্শন তৃতীয় জামাতা

আমার অধিকার স্বত্ব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে স্বীকৃতা আছি। নতুবা ঐ বিষয় লইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে এবং সরকার বাহাদুরকে আমার ক্ষতিপূরণে বাধ্য হইতে হইবে।" শুনা যায় রাণীর ঐরূপ যুক্তিযুক্ত কথায় এবং গরীব ধীবরদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই রাণী ঐরূপ করিতেছেন একথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সরকার বাহাদুর ঐ কর অল্প দিন বাদেই উঠাইয়া দেন এবং ধীবরেরা পূর্ব্বের ন্যায় নদীতে বিনা করে যথা ইচ্ছা মৎস্য ধরিয়া রাণীকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকে।

লোকহিতকর কার্য্যে রাণী রাসমণির উৎসাহ সর্ব্বদা পরিলক্ষিত হইত। "সোণাই, বেলেঘাটা ও ভবানীপুরে বাজার, কালীঘাটে ঘাট ও মুমূর্ষু নিবাস, হালিসহরে জাহ্নবীতীরে ঘাট, সুবর্ণরেখার অপর তীর হইতে কিছুদূর পর্য্যন্ত শ্রীক্ষেত্রের রাস্তা প্রভৃতিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গঙ্গাসাগর, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ ও পুরীতে তীর্থযাত্রা করিয়া রাসমণি দেবোদ্দেশে প্রচুর অর্থব্যয় করেন।" তদ্ভিন্ন মকিমপুর জমিদারীর প্রজাগণকে নীলকরের অত্যচার হইতে রক্ষা করা এবং দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে টোনায় খাল খনন করাইয়া মধুমতীর সহিত নবগঙ্গার সংযোগ বিধান করা প্রভৃতি নানা সৎকার্য্য রাণী রাসমণির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

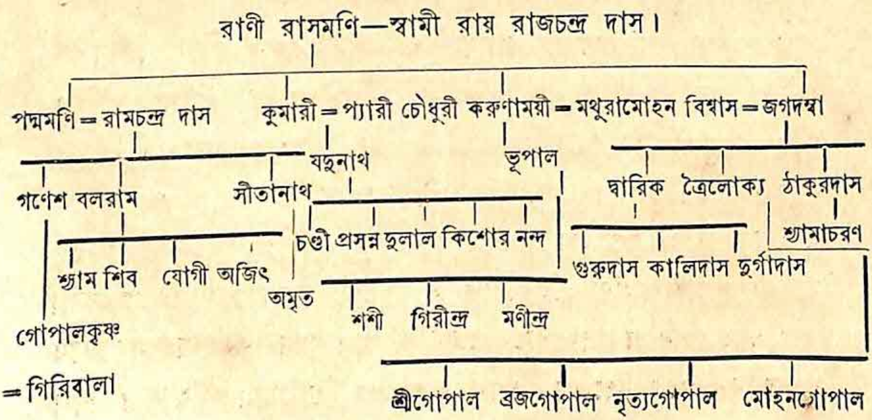
শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বা মথুরানাথ বিশ্বাস ঐ ঘটনায় এখন হইতে পর হইয়া যাইবেন ভাবিয়া, রাণী তাঁহার চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর বিবাহ উক্ত জামাতারই সহিত সম্পন্ন করিয়া তাঁহার ছিন্নহৃদয় পুনরায় স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। রাণীর ঐ চারি কন্যার সন্তান সন্ততিগণ এখনও বর্ত্তমান। *

রাণীর দেবীভক্তি

অশেষ গুণশালিনী রাণী রাসমণির শ্রীশ্রীকালিকার শ্রীপাদ-পদ্মে চিরকাল বিশেষ ভক্তি ছিল। জমীদারী সেরেস্তার কাগজ-পত্রে নামাঙ্কিত করিবার জন্য তিনি যে শীল-মোহর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহাতে খোদিত ছিল—"কালীপদ অভিলাষী শ্রীমতী রাসমনি দাসী"। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি তেজস্বিনী রাণীর দেবী-ভক্তি ঐরূপে সকল বিষয়ে, সকল কথা ও কার্য্যে প্রকাশ পাইত।

---

* পাঠকের অবগতির জন্য রাণীরাসমণির বংশতালিকা শ্রীদক্ষিণে-শ্বর নামক পুস্তিকা হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি——



রাণী রাসমণির ৺কাশী যাইবার উদ্‌যোগকালে প্রত্যাদেশ লাভ।

শুনিতে পাওয়া যায় রাণীর হৃদয়ে ৺কাশীধামে যাইবার ও তথায় শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা মাতাকে দর্শন ও বিশেষভাবে পূজা করিবার বাসনা বহুকাল হইতে বলবতী ছিল। শুনা যায়, বহু অর্থও তিনি ঐজন্য সঞ্চিত করিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু নিজ স্বামীর সহসা মৃত্যু হইয়া সমগ্র বিষয়ের তত্ত্বাবধান আপন স্কন্ধে পতিত হওয়ায় এতদিন ঐ বাসনা ফলবতী করিতে পারেন নাই। এখন জামাতৃগণ, বিশেষতঃ তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন, তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিতে শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হইয়া উঠায়, রাণী ১২৫৫ সালে কাশী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। সমস্ত আয়োজন স্থির হইলে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব রাত্রে তিনি স্বপ্নে ৺দেবীর দর্শনলাভ এবং প্রত্যাদেশ পাইলেন—কাশী যাইবার আবশ্যক নাই, ভাগীরথীতীরে মনোরম প্রদেশে আমার পাষাণময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিত্য পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর, আমি ঐ মূর্ত্ত্যাশ্রয়ে আবির্ভূতা হইয়া তোমার নিকট হইতে নিত্য পূজা গ্রহণ করিব!* রাণীর বিশ্বাসী হৃদয় ঐরূপ আদেশ লাভে বিশেষ পরিতৃপ্ত হয় এবং কাশীযাত্রা স্থগিত রাখিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত সঞ্চিত ধনরাশি ঐ কার্য্যেই নিয়োজিত করিতে সংকল্প করেন।

পূর্ব্বোক্ত কিম্বদন্তি কতদূর সত্য, বলিতে পারি না; কিন্তু

* কেহ কেহ বলেন যাত্রা করিয়া রাণী কলিকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্য্যন্ত নৌকাযোগে অগ্রসর হইয়া সে রাত্রিতে ঐ স্থানে নৌকার উপর বাস করিবার সময় ঐ প্রকার প্রত্যাদেশ লাভ করেন।

রাণীর দেবীমন্দির নির্ম্মাণ।

একথা সত্য যে, শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি রাণীর হৃদয়ে বহুকাল সঞ্চিত ভক্তি, ঐকালে দেব-মন্দির রূপ ও সাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং ভাগীরথীতীরে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড† ক্রয় করিয়া তিনি বহু অর্থব্যয়ে তদুপরি নবরত্নশোভিত সুবৃহৎ মন্দির, দেবারাম ও তৎসংলগ্ন উদ্যান নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ হইয়া সুবৃহৎ দেবালয় ১২৬১ সালেও সম্যক্ নির্ম্মিত হয় নাই; কিন্তু জীবন অনিশ্চিৎ, মন্দির নির্ম্মাণে বহুকাল ব্যয় করিলে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প নিজ জীবনকালে কার্য্যে পরিণত হইয়া উঠিবে কি—না, তাহা কে বলিতে পারে? — ঐ কথার আলোচনা করিয়া নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইবামাত্র সন ১২৬২ সালের আষাঢ় মাসে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্নানযাত্রার দিনে রাণী উহার প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করেন। কিন্তু উহার পূর্ব্বের কয়েকটী কথা পাঠকের অগ্রে জানা আবশ্যক। আমরা এখন তাহাই বলিতে আরম্ভ করিব।

প্রত্যাদেশ পাইয়াই হউক বা হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসেই হউক—কারণ, ভক্তেরা নিজ ইষ্টদেবদেবীকে সর্ব্বদা আত্মবৎ

---

† কালীবাটীর জমীর পরিমাণ ৬০ বিঘা, দেবোত্তর দান পত্রে লেখা আছে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ৬ই তারিখে উক্ত জমী কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টের এটর্ণী হেষ্টি নামক জনৈক ইংরাজের নিকট হইতে ক্রয় করা হয়। অতএব মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতে প্রায় দশ বৎসর লাগিয়াছিল।

সেবা করিতে ভালবাসেন— রাণীর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিত্য অন্ন-ভোগ দিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে।

রাণীর ৺দেবীকে অন্ন-ভোগ দিবার বাসনা।

রাণী ভাবিলেন—মন্দিরাদি ত মনের মত নির্ম্মিত হইল, দেবীসেবা চিরকাল বিশেষভাবে চলিবার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তিও যথেষ্ট করিয়া দিতেছি, কিন্তু এতটা করিয়াও যদি শ্রীশ্রীজগদম্বাকে মনের মত সেবা করিতে না পারি, এতটা করিয়াও যদি তাঁহাকে, প্রাণ যেমন চাহে, নিত্য অন্নভোগ না দিতে পারি তবে সকলই বৃথা। ফলে এই পর্য্যন্ত দাঁড়াইবে যে, লোকে বলিবে, রাণী রাসমণি এত বড় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু লোকের ঐরূপ কথায় আমার কি আসে যায়? হে জগদম্বে, অন্য নানা বিষয়ে নাম যশ ত আমাকে অনেক দিয়াছ?—এ বিষয়ে আর অন্তঃসারহীন নাম যশ মাত্র দিয়াই আমাকে ফিরাইও না!—আমার নাম হউক বা নাই হউক তুমি এখানে সত্য সত্য আবির্ভূতা হও এবং নিত্য সেবা গ্রহণ করিয়া দাসীর কামনা পূর্ণ কর।

রাণী দেখিলেন, দেবীকে মনের মত সেবা করিবার পথে তাঁহার প্রধান অন্তরায় তাঁহার জাতি ও সামাজিক প্রথা। নতুবা তাঁহার প্রাণ ত একবারও বলে না যে অন্নভোগ দিলে জগন্মাতা উহা গ্রহণ করিবেন না—তাঁহার হৃদয় ত ঐ চিন্তায় উৎফুল্ল ভিন্ন কখন সঙ্কুচিত হয় না। ভাবিলেন, তবে এ বিপরীত প্রথার প্রচলন কেন? কে করিল,—শাস্ত্র? শাস্ত্রকার কি তবে প্রাণহীন ব্যক্তি ছিলেন? অথবা স্বার্থপ্রেরিত হইয়া ঈশ্বরীর নিকটেও উচ্চবর্ণের উচ্চাধিকার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন? ঐরূপ হইলে শাস্ত্রে আমার প্রয়োজন নাই, আমি আমার প্রাণের পবিত্রাকাঙ্ক্ষারই

পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থাগ্রহণে ঐ বাসনাপূরণের অন্তরায়।

অনুসরণ করিব। আবার ভাবিলেন—তাহা হইলেই বা নিস্তার কোথায় ? প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলেও ভক্ত ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা ত কেহই দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না। তবে উপায় ? রাণী নানাস্থান হইতে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতসকলের ব্যবস্থা আনাইতে লাগিলেন—কিন্তু ঐ সকলের একটীও তাঁহার মনের মত হইল না।

রামকুমারের ব্যবস্থাদান।

এদিকে মন্দিরনির্ম্মাণ ও মূর্ত্তিগঠন সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু প্রাণের পূর্ব্বোক্ত পিপাসা মিটাইয়া সেবা করিবার সঙ্কল্প পূর্ণ হইবার কোন উপায় দেখা যাইল না। ছোট বড় সকল পণ্ডিতগণের নিকট পুনঃপুনঃ ব্যবস্থাগ্রহণে বারম্বার প্রত্যাখ্যাত হইয়া রাণীর আশা যখন প্রায় নির্ম্মূলিত হইতেছিল, এমন সময়ে ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী হইতে ব্যবস্থা আসিল—প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে রাণী যদি উক্ত অপ্রতিষ্ঠিত দেবালয় ও সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং তদনন্তর উক্ত ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়া অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে শাস্ত্রনিয়ম যথাযথ রক্ষিত হইবে এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ উক্ত দেবালয়ে প্রসাদ গ্রহণ করিলেও দোষভাগী হইবেন না।

মন্দিরোৎসর্গসম্বন্ধে রাণীর সঙ্কল্প।

ব্যবস্থা পাইয়া রাণীর হৃদয়ের আশা আবার মুকুলিত হইয়া উঠিল। তিনি নিজ গুরুর নামে উক্ত দেবালয় ও সম্পত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি লইয়া স্বয়ং, গুরুর ঐ সম্পত্তি ও দেবসেবার তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারীর পদবী লইয়া থাকিবার সংকল্প স্থির করিলেন। পরে রামকুমার ভট্টাচার্য্যের ব্যবস্থানুযায়ী নিজ অভিপ্রায় রাণী অপরাপর পণ্ডিতগণকে জানাইলে, তাঁহারা, 'কার্য্যটী

সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধ,' 'ঐরূপ করিলেও ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা কেহ ঐ স্থানে আসিবেন না' ইত্যাদি নানা কথা বলিলেও উহা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ হইবে একথা কেহই স্পষ্ট বলিতে সাহসী হইলেন না।

রামকুমারের উদারতা।

ভট্টাচার্য্য রামকুমারের প্রতি রাণীর দৃষ্টি যে উক্ত ঘটনায় বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল একথা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। ভাবিয়া দেখিলে তখনকার কালে রামকুমারের ঐরূপ ব্যবস্থাদান সামান্য উদারতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না। সমাজের নেতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণের মন তখন সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে নিতান্ত আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল এবং ঐ গণ্ডীর বাহিরে যাইয়া শাস্ত্রশাসনের ভিতর একটা উদার ভাব দেখিতে এবং অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা প্রদান করিতে তাঁহাদের ভিতর বিরল ব্যক্তিই সক্ষম হইতেন; ফলে অনেক স্থলে তাঁহাদিগের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতে লোকের মনে প্রবৃত্তির উদয় হইত।

রাণী রাসমণির উপযুক্ত পূজকের অন্বেষণ।

সে যাহা হউক রামকুমারের সহিত রাণীর সম্বন্ধ ঐখানেই পরিসমাপ্ত হইল না। বুদ্ধিমতী রাণী নিজ গুরু-বংশীয়গণকে যথাযথ সম্মান প্রদান করিলেও তাঁহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞানরাহিত্য এবং শাস্ত্রমত দেবসেবা সম্পন্ন করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্যতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহাদের ন্যায্য বিদায় আদায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নূতন দেবালয়ের যাবতীয় সেবাকার্য্যের ভার যাহাতে কার্য্য-দক্ষ শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী সদ্‌ব্রাহ্মণগণের হস্তে সর্ব্বকাল অর্পিত হয় তদ্বিষয়ের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন। এখানেও কিন্তু প্রচলিত সামাজিক প্রথা তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। শূদ্র-

প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পূজা করা দূরে যাউক, সদ্বংশজাত সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ ঐকালে ঐ সকল মূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন না এবং রাণীর গুরুবংশীয়গণের ন্যায় ব্রহ্মবন্ধুদিগকে তাঁহারা একপ্রকার শূদ্রমধ্যেই পরিগণিত করিতেন। সুতরাং যজনযাজনক্ষম সদাচারী কোন ব্রাহ্মণই যে এরূপ স্থলে রাণীর দেবালয়ে পূজকপদে ব্রতী হইতে স্বীকৃত হইবেন না একথায় আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক, এককালে হতাশ না হইয়া রাণী বেতন ও পারিতোষিকের হার বৃদ্ধি করিয়া পূজকের জন্য নানা স্থানে সন্ধান করিতে লাগিলেন।

রাণীর কর্ম্মচারী সিহড় গ্রামের মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূজক দিবার ভার গ্রহণ।

ঠাকুরের ভগ্নী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর বাটী কামারপুকুরের অনতিদূরে সিহড় নামক গ্রামে ছিল। সিহড়ে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি। তথাকার মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* নামক এক ব্যক্তি তখন রাণীর সরকারে কর্ম্ম করিতেন। বোধ হয় রাণীর দেবালয়ে ব্রাহ্মণ দিতে পারিলে দু'পয়সা লাভ হইতে পারে ভাবিয়া ইনিই এখন পূজক পাচক প্রভৃতি সকল প্রকার ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী জোগাড় করিয়া দিবার ভার লইতে অগ্রসর হইলেন। রাণীর দেবালয়ে চাকরি স্বীকার করাটা যে দূষণীয় নহে ইহা গ্রামস্থ দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে বুঝাইবার জন্য হউক, বা ঐরূপ করিয়া নিজ সংসারের আর্থিক উন্নতি বিধানের জন্য হউক, অথবা তদুভয় উদ্দেশ্যসিদ্ধিসংকল্পেই হউক, মহেশ রাণীর নিকট হইতে নব দেবালয় সম্বন্ধে উক্ত বন্দোবস্তের ভার লইয়া নিজ অগ্রজ ক্ষেত্রনাথকে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে পূজক পদে মনোনীত

* কেহ কেহ বলে এই বংশীয়েরা কোন সময়ে মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

করিলেন। মহেশ নিজ পরিবারস্থ এক ব্যক্তিকে ঐরূপে রাণীর কার্য্যে নিযুক্ত করায় তাঁহার পক্ষে অন্যান্য ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীসকলের জোগাড় করা অনেকটা সহজ হইয়াছিল। কিন্তু নানা প্রযত্নেও তিনি শ্রীশ্রীকালিকা দেবীর মন্দিরের জন্য সুযোগ্য পূজক জোগাড় করিতে না পারিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

রাণীর রামকুমারকে পূজকের পদগ্রহণে অনুরোধ।

রামকুমার ভট্টাচার্য্যের সহিত মহেশ পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। শুধু পরিচয় নহে, গ্রামসম্পর্কে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কোন একটা সুবাদও যে পাতান ছিল, ইহা আমরা পল্লীগ্রামের রীতি দেখিয়া অনুমান করিতে পারি। রামকুমার যে বিশেষ ভক্তিমান তান্ত্রিক সাধক ছিলেন এবং বহু পূর্ব্বে স্বেচ্ছায় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, একথাও মহেশের অবিদিত ছিল না। সুতরাং রামকুমারের বর্ত্তমান সাংসারিক অভাব অনটনের কথা যে তিনি কিছু কিছু জানিতেন, ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। অতএব শ্রীশ্রীকালিকা মাতার পূজক নির্ব্বাচন করিতে যাইয়া মহেশের দৃষ্টি রামকুমারের প্রতি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল—অশূদ্রযাজী রামকুমার কলিকাতায় আসিয়া ৺দিগম্বর মিত্র প্রভৃতির বাটীতে পূজকপদ কখন কখন গ্রহণ করিলেও কৈবর্ত্তকজাতীয়া রাণীর দেবালয়ে কি ঐরূপ করিতে স্বীকৃত হইবেন?—বিশেষ সন্দেহ। যাহা হউক ৺দেবীপ্রতিষ্ঠার দিন অতি সন্নিকট, সুযোগ্য লোকও পাওয়া যাইতেছে না, অতএব সকল দিক ভাবিয়া মহেশ একবার ঐ বিষয়ে চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। কিন্তু স্বয়ং ঐ বিষয়ে সহসা অগ্রসর না হইয়া রাণীর নিকট সকল কথা বলিয়া

প্রতিষ্ঠার দিনে অন্ততঃ রামকুমার যাহাতে পূজকের পদ গ্রহণ করিয়া সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করেন তজ্জন্য অনুরোধ ও নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতে বলিলেন। রামকুমারের নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাপত্র পাইয়া রাণী তাঁহার যোগ্যতার বিষয়ে পূর্ব্বেই উচ্চ ধারণা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পূজকপদে ব্রতী হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি এখন বিশেষ আনন্দিতা হইলেন এবং অতি দীনভাবে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন—শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রতিষ্ঠা করিতে আপনার ব্যবস্থাবলেই আমি অগ্রসর হইয়াছি, এবং আগামী স্নানযাত্রার দিনে শুভ মুহূর্ত্তে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সমুদয় আয়োজনও করিয়াছি। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীর জন্য পূজক পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন সুযোগ্য ব্রাহ্মণই শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজকপদগ্রহণে সম্মত হইয়া আমাকে প্রতিষ্ঠাকার্য্যে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেছেন না। অতএব আপনিই এ বিষয়ে যাহা হয় একটা শীঘ্র ব্যবস্থা করিয়া আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। আপনি সুপণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ, অতএব ঐ পূজকের পদে যাহাকে তাহাকে নিযুক্ত করা চলে না, একথা বলা বাহুল্য।

রাণীর ঐ প্রকার অনুরোধ পত্র লইয়া মহেশ যে, রামকুমারের নিকট স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইয়া সুযোগ্য কোন পূজক পাওয়া পর্য্যন্ত পূজকের আসন গ্রহণে স্বীকৃত করাইয়াছিল তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ঐরূপে লোভপরিশূন্য ভক্তিমান রামকুমার শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠা বন্ধ হইবার আশঙ্কাতে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে * আগমন করেন এবং পরে রাণী ও মথুর

* দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে শ্রীযুক্ত রামকুমারের প্রথমাগমন সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিবরণ আমরা ঠাকুরের অনুগত ভাগিনেয় শ্রীযুত হৃদয়রামের

বাবুর অনুনয় বিনয়ে এবং সুযোগ্য পূজকের অভাব দেখিয়াই ঐ স্থানে যাবজ্জীবন থাকিয়া যান। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছাতেই সংসারে ছোট বড় সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে ; কে বলিবে, দেবী-ভক্ত রামকুমার ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ঐ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন কি না ?

নিকটে প্রাপ্ত হইয়াছি। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল ভট্টাচার্য্য কিন্তু ঐ সম্বন্ধে অন্য কথা বলেন। তিনি বলেন—

কামারপুকুরের নিকটবর্ত্তী দেশড়া নামক গ্রামের রামধন ঘোষ রাণী রাসমণির কর্ম্মচারী ছিলেন। কার্য্যদক্ষতায় ইনি রাণীর সুনয়নে পড়িয়া ক্রমে তাঁহার দেওয়ান পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। কালীবাটী প্রতিষ্ঠার সময়ে ইনি, শ্রীযুক্ত রামকুমারের সহিত পরিচয় থাকায়, বিদায় লইতে আসিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ পত্র দেন। রামকুমার তাহাতে রাণীর জানবাজারস্থ ভবনে উপস্থিত হইয়া রামধনকে বলেন, "রাণী কৈবর্ত্তকজাতীয়া, রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ আমরা তাঁহার নিমন্ত্রণ ও দান গ্রহণ করিলে 'এক ঘরে' হইতে হইবে।" রামধন তাহাতে তাঁহাকে খাতা দেখাইয়া বলেন, 'কেন ?—এই দেখ কত রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, তাহারা সকলে যাইবে ও রাণীর বিদায় গ্রহণ করিবে।' রামকুমার তাহাতে বিদায় গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া কালীবাটী প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বদিনে এখানে যাত্রা, ওখানে কালীকীর্ত্তন, এখানে ভাগবত পাঠ, ওখানে রামায়ণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে কালীবাটীতে আনন্দের প্রবাহ ছুটিয়াছিল। রাত্রিকালেও ঐরূপ আনন্দের বিরাম হয় নাই এবং অসংখ্য আলোকমালায় দেবালয়ের সর্ব্বত্র দিবসের ন্যায় উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন, 'ঐ সময়ে দেবালয় দেখিয়া মনে হইয়াছিল, রাণী যেন রজতগিরি তুলিয়া আনাইয়া এখানে বসাইয়া দিয়াছেন।' পূর্ব্বোক্ত আনন্দোৎসব দেখিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামকুমার প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব দিনে কালীবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রাণীর ৺দেবী প্রতিষ্ঠা।

সে যাহা হউক, ঐরূপ অসম্ভাবিত উপায়ে রামকুমারকে পূজকরূপে পাইয়া রাণী রাসমণি সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার স্নান-যাত্রার দিবসে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা করিলেন। শুনা যায়, 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' শব্দে সেদিন ঐ স্থান দিবারাত্র সমভাবে কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাণী অকাতরে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া অতিথি অভ্যাগত সকলকে আপনার ন্যায় আনন্দিত করিয়া তুলিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সুদূর কান্যকুব্জ, বারাণসী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান স্থানসমূহ হইতে বহু অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ঐ উপলক্ষে সমাগত হইয়া ঐদিনে প্রত্যেকে রেশমা বস্ত্র, উত্তরীয় এবং বিদায়স্বরূপে এক একটী স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেবালয় নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাণী নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন, এবং ২,২৬০০০ মুদ্রার বিনিময়ে ত্রৈলোক্য নাথ ঠাকুরের নিকট হইতে দিনাজপুর জেলার ঠাকুর গাঁ মহকুমার অন্তর্গত শালবাড়ি পরগণা ক্রয় করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে দেবসেবার জন্য দানপত্র করিয়া গিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, ভট্টাচার্য্য রামকুমার ঐদিন সিধা লইয়া গঙ্গাতীরে স্বহস্তে রন্ধনকরতঃ আপন অভীষ্ট দেবীকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ ভোজন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের ঐ কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, দেবীভক্ত রামকুমার

শ্রীযুক্ত রামলাল ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত কথায় অনুমিত হয়, রামধন ও মহেশ উভয়ের কথাতে শ্রীযুত রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক পূজকের পদ অঙ্গীকার করেন।

কোনরূপ প্রত্যাশায় প্রলোভিত না হইয়া রাণীকে যথাজ্ঞান ব্যবস্থা দিয়া দেবীর অন্নভোগের বন্দোবস্ত করাইয়াছিলেন। এখন তিনিই যে স্বয়ং ঐ নিবেদিত অন্ন গ্রহণ না করিয়া আপন বিধানের এবং ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন একথা নিতান্তই অযুক্তিকর। ঠাকুরের মুখেও আমরা ঐরূপ কথা শুনি নাই। অতএব আমাদিগের ধারণা, তিনি পূজান্তে হৃষ্টচিত্তে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদী নৈবেদ্যান্নই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর কিন্তু ঐ আনন্দোৎসবে সম্পূর্ণহৃদয়ে যোগদান করিলেও আহারের বিষয়ে নিজ নিষ্ঠা রক্ষা করিয়া সন্ধ্যাগমে নিকটবর্ত্তী বাজার হইতে এক পয়সার মুড়ি মুড় কি কিনিয়া খাইয়া পদব্রজে ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া সে রাত্রি বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

প্রতিষ্ঠার দিনে ঠাকুরের আচরণ।

রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটী প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধে ঠাকুর স্বয়ং আমাদিগকে অনেক সময়ে অনেক কথা বলিতেন। বলিতেন—রাণী কাশীধামে যাইবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন; যাত্রার দিন স্থির করিয়া প্রায় এক শত খানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নৌকা বিবিধ দ্রব্য-সম্ভারে পূর্ণ করিয়া ঘাটে বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন; যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্ব রাত্রে স্বপ্নে ৺দেবীর নিকট হইতে প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াই ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করেন এবং ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযোগ্য স্থানের অনুসন্ধানে নিযুক্তা হন।

কালীবাটীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা।

বলিতেন—রাণী প্রথমে, 'গঙ্গার পশ্চিম কুল, বারাণসী সমতুল'—এই ধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়া ভাগীরথীর পশ্চিমকুলে বালি, উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামে স্থানান্বেষণ করিয়া বিফল-

মনোরথ হয়েন ; * কারণ ঐ কুলের 'দশ আনি' 'ছয় আনি' খ্যাত প্রসিদ্ধ জমীদারেরা, রাণী প্রভূত অর্থ দানে স্বীকৃতা হইলেও, বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকৃত স্থানের কোথাও তাঁহারা অপরের ব্যয়ে নির্ম্মিত ঘাট দিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবেন না ! রাণী বাধ্য হইয়া পরিশেষে ভাগীরথীর পূর্ব্বকুলে এই স্থানটী ক্রয় করেন।

বলিতেন—রাণী দক্ষিণেশ্বরে যে স্থানটী মনোনীত করিলেন উহার কিয়দংশ এক সাহেবের ছিল, এবং অপরাংশে মুসলমান-দিগের কবরডাঙ্গা ও গাজি সাহেব পীরের স্থান ছিল ; স্থানটীর কূর্ম্মপৃষ্ঠের মত আকার ছিল ; ঐরূপ কূর্ম্মপৃষ্ঠাকৃতি শ্মশানই শক্তিপ্রতিষ্ঠা ও সাধনার জন্য বিশেষ প্রশস্ত বলিয়া তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট ; অতএব দৈবাধীন হইয়াই রাণী যেন ঐ স্থানটী মনোনীত করেন।

আবার শক্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রশস্ত দিবসে উহা না করিয়া স্নানযাত্রার দিনে বিষ্ণুপর্ব্বকালে রাণী শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠা কেন করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া ঠাকুর কখন কখন আমাদিগকে বলিতেন—দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণারম্ভের দিবস হইতে রাণী যথাশাস্ত্র কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া-ছিলেন ; ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন, মাটিতে শয়ন ও যথাশক্তি জপ পূজাদি করিতেছিলেন ; মন্দির ও দেবীমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে প্রতিষ্ঠার জন্য ধীরে সুস্থে শুভ দিবসের নির্দ্ধারণ হইতে ছিল এবং মূর্ত্তিটী ভগ্ন হইবার আশঙ্কায় বাক্সবন্দি করিয়া রাখা হইয়াছিল ; এমন সময়ে যে কোন কারণেই হউক ঐ মূর্ত্তি

* বালি, উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামের প্রাচীন লোকেরা এখনও একথা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন।

ঘামিয়া উঠে এবং রাণীকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হয়—'আমাকে আর কতদিন এই ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিবি ? আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে ; যত শীঘ্র পারিস্ আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিতা কর্!'—ঐরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াই রাণী দেবী-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইয়া দিন দেখাইতে থাকেন এবং স্নান-যাত্রার পূর্ণিমার অগ্রে অন্য কোন প্রশস্ত দিন না পাইয়া ঐ দিবসে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সঙ্কল্প করেন।

তদ্ভিন্ন দেবীকে অন্নভোগ দিতে পারিবেন বলিয়া নিজ গুরুর নামে রাণীর উক্ত ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি পূর্ব্বোল্লিখিত অনেক কথা আমরা ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলাম। কেবল ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জন্য রাণীকে রামকুমারের ব্যবস্থাদানের কথা ও ঠাকুরকে বুঝাইবার জন্য রামকুমারের ধর্ম্মপত্রানুষ্ঠানের কথা দুইটী আমরা ঠাকুরের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয় রাম মুখোপাধ্যায়ের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি।

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে চিরকালের জন্য পূজকপদ গ্রহণ করা যে ভট্টাচার্য্য রামকুমারের প্রথম অভীপ্সিত ছিল না তাহা আমরা ঠাকুরের এই সময়ের ব্যবহারে বুঝিতে পারি। ঐ কথার অনুধাবনে মনে হয় সরল রামকুমার তখনও ঐ বিষয় বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিন, ৺দেবীকে অন্নভোগ প্রদানের বিধান দিয়া এবং প্রতিষ্ঠার দিনে স্বয়ং ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার পরে তিনি পুনরায় ঝামাপুকুরে ফিরিবেন। ঐ দিন দেবীকে অন্নভোগ নিবেদন করিতে বসিয়া তিনি যে, কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই বা কোনরূপ অন্যায় অশাস্ত্রীয় কার্য্য করিতেছেন মনে করেন নাই তাহাও কনিষ্ঠের সহিত তাঁহার এই সময়ের ব্যবহারে বুঝিতে পারা যায়। ঐ সকল কথা আমরা এখানে পাঠককে বলিব।

প্রতিষ্ঠার পরদিনে প্রত্যূষে ঠাকুর, অগ্রজের সংবাদ লইবার জন্যই হউক বা প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত যে সকল কার্য্য বাকি ছিল, তাহা দেখিতে কৌতূহলপরবশ হইয়াই হউক দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং কিছুকাল তথায় থাকিয়া বুঝেন, অগ্রজের সেদিন ঝামাপুকুরে ফিরিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সন্ধ্যায় ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিলেও অগ্রজের কথা না শুনিয়া ভোজনকালে তিনি পুনরায় ঝামাপুকুরে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর ঠাকুর পাঁচ সাত দিন আর দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন নাই। দক্ষিণেশ্বরের কার্য্য সমাপনান্তে অগ্রজ যথাসময়ে ঝামাপুকুরে ফিরিবেন ভাবিয়া ঐ স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইলেও যখন রামকুমার ফিরিলেন না তখন মনে নানা প্রকার তোলাপাড়া করিয়া ঠাকুর পুনরায় সংবাদ লইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন এবং শুনিলেন, রাণীর সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি চিরকালের জন্য তথায় শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজকের পদে ব্রতী হইতে সম্মত হইয়াছেন। শুনিয়াই ঠাকুরের মনে নানা কথার উদয় হইল এবং তিনি পিতার অশূদ্রযাজিত্বের এবং অপ্রতিগ্রাহিত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে ঐরূপ কার্য্য হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, রামকুমার তাহাতে ঠাকুরকে শাস্ত্র ও যুক্তি সহায়ে নানা প্রকারে বুঝাইয়াছিলেন এবং কোন কথাই তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতেছে না দেখিয়া পরিশেষে পল্লীগ্রামের প্রথানুসারে তাঁহাকে বুঝাইবার ধর্ম্মপত্ররূপ * সরল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। শুনা যায়

---

* পল্লীগ্রামে এখনও রীতি আছে, কোন বিষয় যুক্তিসহকারে সুমীমাংসিত হইবার সম্ভাবনা না দেখিলে লোকে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া দেবতার ঐ বিষয়ে কি অভীপ্সিত জানিবার জন্য ধর্ম্ম পত্রের

ধর্ম্মপত্রে উঠিয়াছিল, "রামকুমার পূজকের পদ গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া নিন্দিত কর্ম্ম করেন নাই। উহাতে সকলেরই মঙ্গল হইবে।"

অনুষ্ঠান করে এবং উহার সহায়ে দেবতার ইচ্ছা জানিয়া ঐ বিষয়ে আর যুক্তি তর্ক না করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। ধর্ম্মপত্র নিম্নলিখিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়—

কতকগুলি টুকরা কাগজে বা বিল্বপত্রে "হাঁ" "না" লিখিয়া একটী ঘটীতে রাখিয়া কোন শিশুকে উহা হইতে একখণ্ড তুলিতে বলা হয়। শিশু "হাঁ,"লিখিত কাগজ তুলিলে অনুষ্ঠাতা বুঝে, দেবতা তাহাকে ঐ কার্য্য করিতে বলিতেছেন। বলা বাহুল্য বিপরীত উঠিলে অনুষ্ঠাতা দেবতার অভিপ্রায় অন্যরূপ বুঝে। ধর্ম্মপত্রের অনুষ্ঠানে কখন কখন বিষয় বিভাগাদিও হইয়া থাকে। যেমন পিতার চারি সন্তান পূর্ব্বে একত্রে ছিল, এখন হইতে পৃথক্ হইবার সঙ্কল্প করিয়া বিষয় বিভাগ করিতে যাইয়া উহার কোন্ অংশ কে লইবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, গ্রামের কয়েক জন নিঃস্বার্থ ধার্ম্মিক লোককে মীমাংসা করিয়া দিতে বলিল। তাঁহারা তখন স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তিকে যতদূর সম্ভব সমান চারিভাগে বিভাগ করতঃ কোন ভ্রাতার ভাগ্যে কোন ভাগটী পড়িবে তাহা ধর্ম্মপত্রের দ্বারা মীমাংসা করিয়া থাকেন। ঐ সময়েও প্রায় পূর্ব্বের ন্যায়ই অনুষ্ঠান হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ডে বিষয়াধিকারীদিগের নাম লিখিয়া কেহ না দেখিতে পায় এরূপভাবে মুড়িয়া একটী ঘটীর ভিতর রক্ষিত হয় এবং উক্ত চারিভাগে বিভক্ত সম্পত্তির প্রত্যেক ভাগ "ক" "খ" ইত্যাদি চিহ্নে নির্দ্দিষ্ট হইয়া ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ডে লিপিবদ্ধ হইয়া অন্য একটী পাত্রে পূর্ব্ববৎ রক্ষিত হইয়া থাকে। অনন্তর দুই জন শিশুকে ডাকিয়া এক জনকে একটী পাত্র হইতে এবং অপরকে অপর পাত্র হইতে ঐ কাগজ খণ্ডগুলি তুলিতে বলা হয়। অনন্তর কাগজগুলি খুলিয়া দেখিয়া যে নামে সম্পত্তির যে ভাগটী উঠিয়াছে, তাহাই তাহাকে লইতে বাধ্য করা হয়।

ঠাকুরের আহারসম্বন্ধে নিষ্ঠা।

ধর্ম্মপত্রের মীমাংসা দেখিয়া ঠাকুরের মন ঐ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেও এখন অন্য এক চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, চতুষ্পাঠী ত এইবার উঠিয়া যাইল, তিনি এখন কি করিবেন। ঝামাপুকুরে ঐদিন আর না ফিরিয়া ঠাকুর ঐ বিষয়ক চিন্তাতেই মগ্ন রহিলেন এবং রামকুমার তাঁহাকে ঠাকুর-বাড়ীতে প্রসাদ পাইতে বলিলেও তাহাতে সম্মত হইলেন না। রামকুমার নানাপ্রকারে বুঝাইলেন; বলিলেন—"দেবালয়, গঙ্গা-জলে রান্না, তাহার উপর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত হইয়াছে; ইহা ভোজনে কোন দোষ হইবে না।" ঠাকুরের কিন্তু ঐ সকল কথা মনে লাগিল না। তখন রামকুমার বলিলেন, "তবে সিধা লইয়া পঞ্চবটীতলে গঙ্গাগর্ভে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন কর; গঙ্গা-গর্ভে অবস্থিত সকল বস্তুই পবিত্র, একথা ত মান?" আহার সম্বন্ধীয় ঠাকুরের মনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা এইবার তাঁহার অন্ত-র্নিহিত গঙ্গাভক্তির নিকট পরাজিত হইল। শাস্ত্রজ্ঞ রামকুমার তাঁহাকে যুক্তিসহায়ে এত করিয়া বুঝাইয়া ইতিপূর্ব্বে যাহা করাইতে পারেন নাই, বিশ্বাস ও ভক্তি তাহা সংসাধিত করিল। ঠাকুর ঐ কথায় সম্মত হইলেন এবং ঐপ্রকারে ভোজন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের গঙ্গাভক্তি।

বাস্তবিক, আজীবন ঠাকুরের গঙ্গার প্রতি কি গভীর ভক্তি আমরা দেখিয়াছি। গাঙ্গবারিকে বলিতেন 'ব্রহ্মবারি'! বলিতেন,—গঙ্গাতীরে বাস করিলে দেবতুল্য অন্তঃকরণ হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধি স্বতঃ স্ফুরিত হয়। গঙ্গার পূতবাষ্পকণাপূর্ণ পবন উভয় কূলে যতদূর সঞ্চরণ করে ততদূর পর্য্যন্ত পবিত্র ভূমি—ঐ ভূমিবাসীদিগের জীবনে সদাচার, ঈশ্বর-

ভক্তি, নিষ্ঠা, দান এবং তপস্যার ভাব শৈলসুতা ভাগীরথীর কৃপায় সদাই বিরাজিত। অনেকক্ষণ যদি কেহ বিষয়কথা কহিয়াছে বা বিষয়ী লোকের সঙ্গ করিয়া আসিয়াছে ত ঠাকুর তাহাকে বলিতেন, একটু গঙ্গাজল খাইয়া আয়। ঈশ্বরবিমুখ ঘোর বিষয়াসক্ত বদ্ধ মানব পুণ্যাশ্রমের কোন স্থানে বসিয়া বিষয় চিন্তা করিয়া কলুষিত করিলে তথায় গঙ্গাবারি ছিটাইয়া দিতেন, এবং গঙ্গাবারিতে কেহ শৌচাদি কার্য্য করিতেছে দেখিলে মনে বিশেষ ব্যথা পাইতেন।

ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে বাস ও স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন।

সে যাহা হউক, মনোরম ভাগীরথীতীরে বিহগকূজিত পঞ্চবটী-শোভিত উদ্যান, সুন্দর সুবিশাল দেবালয়ে ভক্তিমান সাধকানুষ্ঠিত সুসম্পন্ন দেবসেবা, ধার্ম্মিক সদাচারী পিতৃতুল্য অগ্রজের অকৃত্রিম স্নেহ এবং দেবদ্বিজপরায়ণা পুণ্যবতী রাণী রাসমণি ও তজ্জামাতা মথুর বাবুর শ্রদ্ধা ও ভক্তি শীঘ্রই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে ঠাকুরের নিকট কামারপুকুরের গৃহের ন্যায় আপনার করিয়া তুলিল এবং কিছুকাল স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেও তিনি তথায় সানন্দচিত্তে বাস করিয়া নিজ মনের পূর্ব্বোক্ত কিংকর্ত্তব্য-অনিশ্চয়তার ভাব দূর পরিহার করিতে সক্ষম হইলেন।

অনুদারতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রভেদ।

ঠাকুরের আহার সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত দৃঢ় নিষ্ঠার কথা শুনিয়া কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, ঐরূপ অনুদারতা ত আমাদের ন্যায় মানবের সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে—ঠাকুরের জীবনে উহার উল্লেখ করিয়া তোমরা কি ইহাই বলিতে চাও যে, ঐরূপ অনুদার না হইলে আধ্যাত্মিক জীবনের চরমোন্নতি সম্ভবপর নহে? তদুত্তরে আমরা বলি, অনুদারতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা দুইটী এক বস্তু নহে।

অহঙ্কারেই প্রথমটীর জন্ম এবং উহার প্রাদুর্ভাবে মানব স্বয়ং যাহা বুঝিতেছে, করিতেছে তাহাকেই সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানে আপনার চারিদিকে গণ্ডী টানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসে; এবং শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের অনুশাসনে বিশ্বাস হইতেই দ্বিতীয়ের উৎপত্তি—উহার উদয়ে মানব নিজ অহঙ্কারকে খর্ব্ব করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত এবং ক্রমে পরম সত্যের অধিকারী হইয়া থাকে। নিষ্ঠার প্রাদুর্ভাবে মানব প্রথম প্রথম কিছুকাল অনুদাররূপে প্রতীয়মান হইতে পারে; কিন্তু উহার সহায়ে সে জীবনপথে উচ্চ উচ্চতর আলোক দেখিতে পায় এবং তাহার সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী স্বভাবতঃ খসিয়া পড়ে। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে নিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজনীয়তা কেমন করিয়া অস্বীকার করি? ঠাকুরের জীবনে উহার পূর্ব্বোক্তরূপ পরিচয় পাইয়া ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে শাস্ত্রশাসনের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা রাখিয়া যদি আমরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকলের প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হই তবেই কালে যথার্থ উদারতার অধিকারী হইব এবং শান্তিলাভে সক্ষম হইব, নতুবা নহে। ঠাকুর যেমন বলিতেন—কাঁটা দিয়াই আমাদিগকে কাঁটা তুলিতে হইবে—নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়াই আমাদিগকে সত্যের উদারতায় পৌঁছিতে হইবে—শাসন, নিয়ম অনুসরণ করিয়াই আমাদিগকে শাসনাতীত নিয়মাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইবে।

যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের জীবনে ঐরূপ অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত বলিয়া বসিবেন, তবে আর তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার ঠাকুর বলা কেন, মানুষ বলিলেই ত হয়? আর যদি তাঁহাকে ঠাকুর বানাইতেই চাও তবে তাঁহার ঐরূপ অসম্পূর্ণতাগুলি ছাপিয়া ঢাকিয়া বলাই ভাল। আমরা বলি—

ভ্রাতঃ আমাদেরও এককাল গিয়াছে যখন ঈশ্বরের মানববিগ্রহ-ধারণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইবার কথা স্বপ্নেও সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করি নাই; আবার যখন তাঁহারই অহেতুক কৃপায় ঐ কথা সম্ভবপর বলিয়া তিনি আমাদিগকে বুঝাইলেন তখন দেখিলাম, মানবদেহ ধারণ করিতে গেলে ঐ দেহের অসম্পূর্ণতাগুলির ন্যায় মানবমনের অসম্পূর্ণতাগুলিও তাঁহাকে যথাযথভাবে স্বীকার করিতে হয়। ঠাকুর বলিতেন, স্বর্ণাদি ধাতুতে "খাদ্ না থাক্‌লে গড়ন হয় না।" তাঁহার জীবনের ঐ সকল অসম্পূর্ণতার কথা তিনি আমাদের নিকট কোনও দিন কিছুমাত্র লুকাইবার প্রয়াস করেন নাই, অথচ স্পষ্টাক্ষরে আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছেন—"যে রাম, যে কৃষ্ণ হইয়াছিল, সেই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতরে আসিয়াছে; এবার গুপ্তভাবে আসা, রাজা যেমন ছদ্মবেশে সহর দেখিতে বাহির হন, সেই প্রকার।" অতএব আমাদের যতদূর জানা আছে সকল কথা তোমায় বলিব; তোমার লইতে ইচ্ছা হয় লইও, অথবা, আমাদিগকে যথা ইচ্ছা নিন্দা তিরস্কার করিও।

পঞ্চম অধ্যায়।

পূজকের পদগ্রহণ।

প্রথম দর্শন হইতে মথুর বাবুর ঠাকুরের প্রতি আচরণ ও সংকল্প।

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কয়েক সপ্তাহ পরে ঠাকুরের সৌম্যদর্শন, কোমল প্রকৃতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও অল্প বয়স, রাণী রাসমণির জামাতা শ্রীযুক্ত মথুর বাবুর নয়নাকর্ষণ করিয়াছিল। দেখিতে পাওয়া যায়, জীবনে যাহাদিগের সহিত বহুকালব্যাপী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহাদিগকে প্রথম দর্শনকালে মানবহৃদয়ে একটা প্রীতির আকর্ষণ সহসা আসিয়া উপস্থিত হয়। শাস্ত্র বলেন, উহা আমাদিগের পূর্ব্বজন্মকৃত সম্বন্ধের সংস্কার হইতে উদিত হইয়া থাকে। ঠাকুরকে দেখিয়া মথুর বাবুর মনে এখন যে, ঐরূপ একটা অনির্দ্দিষ্ট আকর্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল, একথা, পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে নিগূঢ় প্রেম-সম্বন্ধ দেখিয়া আমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারি।

ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়রাম

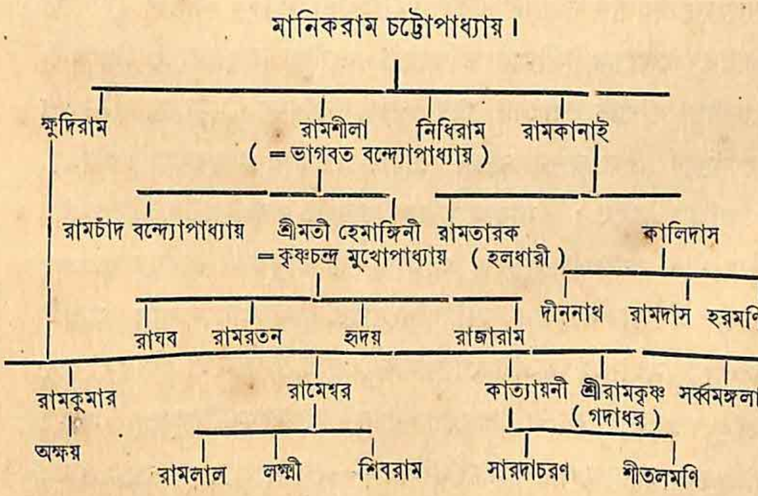
দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক মাস কাল পর্য্যন্ত ঠাকুর কিংকর্ত্তব্য-অনিশ্চয় ভাবে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন। মথুর বাবু ইতিমধ্যে তাঁহাকে দেবীর বেশকারীর কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সংকল্প মনে মনে স্থির করিয়া রামকুমার ভট্টাচার্য্যের নিকট ঐবিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। রামকুমার তাহাতে ভ্রাতার মানসিক অবস্থার কথা তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক বলিয়া উক্ত বিষয়ের সিদ্ধিসংকল্পে তাঁহাকে নিরুৎসাহিত করেন। কিন্তু মথুর সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র

ছিলেন না। ঐরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও তিনি ঐ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে অবসরানুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংযুক্ত আর এক ব্যক্তি এখন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুরের পিতৃস্বস্রীয়া ভগিনী * শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র শ্রীহৃদয়-রাম মুখোপাধ্যায় এই সময়ে কোনরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার বাসনায় বর্দ্ধমান সহরে আসিয়া উপস্থিত হয়। হৃদয়ের বয়স তখন ষোল বৎসর। যুবক ঐ স্থানে নিজগ্রামস্থ পরিচিত ব্যক্তিদিগের নিকটে থাকিয়া নিজ সংকল্পসিদ্ধির কোনরূপ সুবিধা করিতে পারিতেছিল না। এমন সময়ে সে লোকমুখে সংবাদ পাইল তাহার মাতুলেরা রাণী রাসমণির নব দেবালয়ে সসম্মানে অবস্থান করিতেছেন, সেখানে উপস্থিত হইতে পারিলে নিজ অভিপ্রায়-সিদ্ধির বিশেষ সুযোগ আছে। শুনিয়া, কালবিলম্ব না করিয়া

---

* পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা ঠাকুরের বংশতালিকা এখানে প্রদান করিতেছি—



হৃদয় দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে উপস্থিত হইল এবং বাল্যকাল হইতে সুপরিচিত, প্রায় সমবয়স্ক মাতুল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত মিলিত হইয়া তথায় আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিল।

হৃদয় দীর্ঘাকৃতি এবং দেখিতে সুশ্রী সুপুরুষ ছিল। তাহার শরীর যেমন সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল, মনও তদ্রূপ উদ্যমশীল ও ভয়শূন্য ছিল। কঠোর পরিশ্রম ও অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে এবং প্রতিকূলাবস্থায় পড়িয়া স্থির থাকিয়া অদ্ভুত উপায়সকলের উদ্ভাবনপূর্ব্বক উহা অতিক্রম করিতে, হৃদয় পারদর্শী ছিল। তদুপরি নিজ কনিষ্ঠ মাতুলকে হৃদয় সত্যসত্যই ভালবাসিত এবং তাঁহাকে সুখী করিতে অশেষ শারীরিক কষ্টস্বীকারে কুণ্ঠিত হইত না।

হৃদয় সর্ব্বদা অনলস ছিল, কিন্তু তাহার অন্তরে ভাবুকতার বিন্দুবিসর্গও ছিল না; এজন্য কর্ম্মী সংসারী মানবের যেমন হইয়া থাকে, হৃদয়ের চিত্ত নিজ স্বার্থচেষ্টা হইতে কখনও সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইতে পারিত না। ঠাকুরের সহিত হৃদয়ের এখন হইতে সম্বন্ধের কথার আমরা যতই আলোচনা করিব ততই দেখিতে পাইব, হৃদয়ের জীবনে ভবিষ্যতে যতটুকু ভাবুকতা ও নিঃস্বার্থ-চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা ভাবময় ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গগুণে এবং কখন কখন তাঁহার চেষ্টার অনুকরণে আসিয়া উপস্থিত হইত। আহার বিহার প্রভৃতি সর্ব্ববিধ শারীরচেষ্টায় উদাসীন, সর্ব্বদা চিন্তাশীল, স্বার্থগন্ধশূন্য ভাবুক জীবনের সফলতার জন্য ঐরূপ একজন স্বাধীনচিন্তাপরাঙ্মুখ শ্রদ্ধাসম্পন্ন সাহসী কর্ম্মীর সহায়তা নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রীশ্রীজগদম্বা কি সেইজন্য ঠাকুরের সাধনকালে হৃদয়ের ন্যায় পুরুষকে ঠাকুরের সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়াছিলেন?—কে বলিবে! তবে একথা

সত্য, হৃদয় না থাকিলে সাধনকালে ঠাকুরের শরীররক্ষা অসম্ভব হইত; শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের সহিত হৃদয়ের নাম তজ্জন্য নিত্য-সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং চিরকাল হৃদয় আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়া আমাদিগের প্রণম্য হইয়া রহিয়াছেন।

হৃদয়ের আগমনে ঠাকুর।

হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে অসিবার কালে ঠাকুর বিংশতি বর্ষে কয়েক মাস মাত্র পদার্পণ করিয়াছেন। হৃদয়কে সহচররূপে পাইয়া তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে বাস যে, এখন হইতে অনেকটা সহজ হইয়াছিল একথা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। ঠাকুর তাহাকে লইয়া একত্রে স্নান, ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশন সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। চিরকাল বালক-ভাবাপন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের, সাধারণনয়নে নিষ্কারণ চেষ্টাসকলের প্রতিবাদ না করিয়া সর্ব্বদা অন্তরের সহিত অনুমোদন ও সহানুভূতি করায়, হৃদয় এখন হইতে ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিল।

ঠাকুরের প্রতি হৃদয়ের ভালবাসা।

হৃদয় আমাদিগকে নিজমুখে কতবার বলিয়াছেন—"এই সময় হইতেই ঠাকুরের প্রতি আমি কি একটা অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ অনুভব করিতাম ও ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম। তাঁহাকে ছাড়িয়া একদণ্ড কোথাও থাকিতে হইলে কষ্ট বোধ হইত। শয়ন ভ্রমণ উপবেশনাদি সকল কাজ একত্রে করিতাম। কেবল মধ্যাহ্নে ভোজনকালে কিছুক্ষণের জন্য আমাদিগকে পৃথক্ হইতে হইত। কারণ, ঠাকুর সিধা লইয়া পঞ্চবটীতে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতেন এবং আমি ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতাম। তবে ঠাকুরের রন্ধনাদির জন্য সমস্ত জোগাড় আমি করিয়া দিয়া যাইতাম। ঐরূপে রন্ধন করিয়া খাইয়াও তিনি মনে শান্তি

পাইতেন না—আহার সম্বন্ধে নিষ্ঠা তাঁহার তখন এত প্রবল ছিল! মধ্যাহ্নে ঐরূপে রন্ধন করিলেও রাত্রে কিন্তু ঠাকুর আমাদিগের ন্যায় শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত প্রসাদী লুচি খাইতেন। কতদিন দেখিয়াছি ঐরূপে লুচি খাইতে খাইতে তাঁহার চক্ষে জল আসিয়াছে এবং আক্ষেপ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছেন, 'মা আমাকে কৈবর্ত্তের অন্নটা খাওয়ালি!'

ঠাকুর নিজমুখেও কখন কখন আমাদিগকে এই সময়ের কথা এইরূপে বলিয়াছেন—"কৈবর্ত্তের অন্ন খাইতে হইবে ভাবিয়া মনে তখন দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইত। গরীব কাঙ্গালেরাও অনেকে তখন রাসমণির ঠাকুরবাড়ীতে ঐজন্য খাইতে আসিত না। খাইবার লোক জুটিত না বলিয়া কতদিন প্রসাদী অন্ন গরুকে খাওয়াইতে এবং কতক গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে হইয়াছে।" তবে ঐরূপে রন্ধন করিয়া ঠাকুরকে বহুদিন যে খাইতে হয় নাই, একথাও আমরা হৃদয় ও ঠাকুর উভয়ের মুখেই শুনিয়াছি। ঐ কথা শুনিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, কালীবাটীতে পূজকের পদে ঠাকুর যতদিন না ব্রতী হইয়াছিলেন ততদিনই ঐরূপ করিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের পূজকপদে ব্রতী হওয়া উক্ত দেবালয়প্রতিষ্ঠার দুই তিনমাস পরেই হইয়াছিল।

ঠাকুরের আচরণ সম্বন্ধে যাহা হৃদয় বুঝিতে পারিত না।

ঠাকুর যে তাহাকে বিশেষ ভালবাসেন একথা হৃদয় বুঝিত। ঠাকুরের সম্বন্ধে একটী কথা কেবল সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। উহা এই—হৃদয় জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকুমারকে যখন কোন বিষয়ে সহায়তা করিতে যাইত, মধ্যাহ্নে আহারাদির পর যখন একটু শয়ন করিত, অথবা সায়াহ্নে যখন সে মন্দিরে

আরাত্রিক দর্শন করিত, তখন ঠাকুর তাহাকে ফেলিয়া পাশ কাটাইয়া কিছুক্ষণের জন্য কোথায় অন্তর্দ্ধান হইতেন! হৃদয় অনেক খুঁজিয়াও তখন তাঁহার সন্ধান পাইত না। পরে দুই এক ঘণ্টা গত হইলে আবার ঠাকুর ফিরিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে স্পষ্ট কিছু বলিতেন না, বলিতেন 'এইখানেই ছিলাম।' ঐরূপ সময়ে কোন কোন দিন সন্ধান করিতে যাইয়া হৃদয় দেখিত, ঠাকুর পঞ্চবটীর দিক হইতে ফিরিতেছেন। দেখিয়া সে ভাবিত, তিনি শৌচাদির জন্য ঐদিকে গিয়াছিলেন এবং আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না।

ঠাকুরের গঠিত শিবমূর্ত্তি-দর্শনে মথুরের প্রশংসা।

হৃদয় বলেন, 'এই সময়ে একদিন মূর্ত্তিগঠন করিয়া ঠাকুরের শিবপূজা করিতে ইচ্ছা হয়।' আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, বাল্যকালে কামারপুকুরে ঠাকুর কখন কখন ঐরূপ করিতেন। ঐরূপ ইচ্ছা হইবামাত্র তিনি গঙ্গাগর্ভ হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিয়া বৃষ, ডমরু ও ত্রিশূল সহিত একটী শিবমূর্ত্তি স্বহস্তে গঠন করিয়া উহার পূজা করিতে থাকেন। মথুর বাবু ঐ সময়ে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে পূজাস্থানের কিয়দ্দূরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ঠাকুর ঐরূপে তন্ময় হইয়া কি পূজা করিতেছেন জানিতে উৎসুক হইয়া নিকটে আসিয়া ঐ মূর্ত্তিটী দেখিতে পান। বৃহৎ না হইলেও মূর্ত্তিটী সুন্দর হইয়াছিল। মথুর উহা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং বাজারে ঐরূপ দেবভাবাঙ্কিত মূর্ত্তি যে পাওয়া যায় না ইহা দেখিয়াই বুঝিলেন। অতঃপর কৌতূহলপরবশ হইয়া মথুর হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ মূর্ত্তি কোথায় পাইলে, কে গড়িয়াছে? হৃদয়ের উত্তরে ঠাকুর দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িতে এবং ভগ্ন মূর্ত্তি সুন্দরভাবে যুড়িতে জানেন, একথা জানিতে

পারিয়া মথুর বিস্মিত হইলেন এবং পূজান্তে মূর্ত্তিটী তাঁহাকে দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হৃদয়ও ঐ কথায় স্বীকৃত হইয়া পূজাশেষে ঠাকুরকে বলিয়া মূর্ত্তিটী লইয়া তাঁহাকে দিয়া আসিলেন। মূর্ত্তিটী হস্তে পাইয়া মথুর এখন উহা তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং মুগ্ধ হইয়া রাণীকে উহা দেখাইতে পাঠাইলেন। রাণীও উহা দেখিয়া নির্ম্মাতার বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং ঠাকুর উহা গড়িয়াছেন জানিয়া মথুরের ন্যায় বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। * ঠাকুরকে দেবালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে মথুরের ইতিপূর্ব্বেই ইচ্ছা হইয়াছিল, এখন আবার তাঁহার এই নূতন গুণপনার পরিচয় পাইয়া ঐ ইচ্ছা অধিকতর বলবতী হইল। মথুর বাবুর ঐরূপ অভিপ্রায়ের কথা ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে অগ্রজের নিকটে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান ভিন্ন অপর কাহার আবার চাকরি করিব—এইরূপ একটা ভাব বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনে দৃঢ়নিবদ্ধ থাকায়, ঐ কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

চাকরি করা সম্বন্ধে ঠাকুর।

চাকরি করা সম্বন্ধে ঠাকুরকে ঐরূপ ভাব প্রকাশ করিতে আমরা অনেক সময় শুনিয়াছি। বিশেষ অভাবে না পড়িয়া কেহ স্বেচ্ছায় চাকরি স্বীকার করিলে ঠাকুর ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে বড় উচ্চ ধারণা করিতেন না। তাঁহার বালক ভক্তদিগের মধ্যে একজন † এক সময়ে চাকরি স্বীকার করিয়াছে জানিয়া আমরা তাঁহাকে বিশেষ ব্যথিত হইয়া বলিতে শুনিয়াছি, "সে মরিয়াছে শুনিলে আমার যত

* কেহ কেহ বলেন এই ঘটনা ঠাকুরের পূজাকালে হইয়াছিল এবং মথুর উহা রাণী রাসমণিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—যেরূপ উপযুক্ত পূজক পাইয়াছি, তাহাতে ৺ দেবী শীঘ্র জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন।

† স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

না কষ্ট হইত, সে চাকরি করিতেছে শুনিয়া ততোধিক কষ্ট হইয়াছে!" পরে কিছুকাল অতীত হইলে ঐ ব্যক্তির সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়া যখন জানিলেন যে ঐ ব্যক্তি তাহার অসহায়া বৃদ্ধা মাতার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইতেছে না দেখিয়াই চাকরি স্বীকার করিয়াছে, তখন ঠাকুর সস্নেহে তাহার গাত্রে ও মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়াছিলেন, 'তাতে দোষ নাই, ঐজন্য চাকরি করায় তোকে দোষ স্পর্শ কর্‌বে না; কিন্তু মার জন্য না হয়ে, যদি তুই স্বেচ্ছায় চাকরি কর্‌তে যেতিস্ তাহা হলে তোকে আর স্পর্শ কর্‌তে পার্‌তুম্ না। তাইত বলি আমার নিরঞ্জনে এত-টুকু অঞ্জন (কাল দাগ) নাই, তার ঐরূপ হীনবুদ্ধি কেন হবে?"

নিত্যনিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথা শুনিয়া অন্যান্য আগন্তুক ব্যক্তিরা সকলেই বিস্মিত হইল। একজন বলিয়াও বসিল—"মহাশয়, আপনি চাকরির নিন্দা করিতেছেন; কিন্তু চাকরি না করিলে সংসার পোষণ করিব কি রূপে?" তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "যে কর্‌বে, করুক না; আমি ত সকলকে ঐরূপে নিষেধ করছি না, (নিরঞ্জনকে ও তাঁহার অন্যান্য বালক ভক্তদিগকে দেখাইয়া) এদের ঐ কথা বল্‌চি; এদের কথা আলাদা।" ঠাকুর তাঁহার বালক ভক্তদিগের জীবন অন্য ভাবে গড়িতেছিলেন এবং ঐরূপ আধ্যাত্মিক ভাবের সহিত চাকরি করাটার কখন সামঞ্জস্য হয় না বলিয়াই যে, ঐ কথা বলিয়াছিলেন ইহা বলা বাহুল্য।

চাকরি করিতে বলিবে বলিয়া ঠাকুরের মথুরের নিকট যাইতে সঙ্কোচ।

অগ্রজের নিকট হইতে মথুর বাবুর ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ঠাকুর তখন হইতে তাঁহার সম্মুখে আর বড় একটা অগ্রসর হইতেন না; যতটা পারেন তাঁহার চক্ষুর অন্তরালে থাকিবার চেষ্টা করিতেন। কারণ, কায়মনোবাক্যে সত্য

ও ধর্ম্ম পালন করিতে তিনি যেমন কথন কাহারও অপেক্ষা রাখিতেন না, তেমনি আবার বিশেষ কারণ না থাকিলে কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া বৃথা কষ্ট দিতে চিরকাল কুণ্ঠিত হইতেন। আবার, কোনরূপ প্রত্যাশা মনের ভিতর না রাখিয়া গুণী ব্যক্তির গুণের আদর করা এবং মানী ব্যক্তিকে সরল স্বাভাবিক ভাবে সম্মান দেওয়াটা ঠাকুরের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম ছিল। অতএব দেবালয়ে পূজকপদ গ্রহণ করিবেন কিনা, এই প্রশ্নের যাহা হয় একটা মীমাংসায় স্বয়ং উপনীত হইবার পূর্ব্বে মথুর বাবু তাঁহাকে উহা স্বীকার করিতে অনুরোধ করিয়া ধরিয়া বসিলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়া মথুরের মনে কষ্ট দিতে হইবে, এই আশঙ্কাই যে, ঠাকুরের ঐরূপ চেষ্টার মূলে ছিল তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। বিশেষতঃ তিনি তখন একজন নগণ্য যুবক মাত্র এবং রাণী রাসমণির দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মথুর মহামাননীয় ব্যক্তি; এ অবস্থায় মথুরের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাটা তাঁহার পক্ষে ভাল দেখাইবে না এবং বালসুলভ চপলতা বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু যত দিন যাইতেছে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে অবস্থান করাটা তাঁহার তত প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছে, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুরের নিকট নিজ মনোগত এই ভাবটী লুক্কায়িত ছিল না। বিশেষ কোন কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে পাইলে তাঁহার যে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় আপত্তি ছিল না এবং জন্মভূমি কামারপুকুরে ফিরিবার জন্য তাঁহার মন যে পূর্ব্বের ন্যায় চঞ্চল ছিল না, একথা আমরা এখনকার ঘটনাবলী হইতে বেশ বুঝিতে পারি।

ঠাকুর যাহা আশঙ্কা কবিতেছিলেন তাহাই একদিন হইয়া

বসিল। মথুর বাবু কালীমন্দিরে দর্শনাদি করিতে আসিয়া কিছু দূরে ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঠাকুর তখন হৃদয়ের সহিত বেড়াইতেছিলেন। মথুর বাবুকে দূরে দেখিতে পাইয়া সেখান হইতে সরিয়া অন্যত্র যাইতেছিলেন, এমন সময়ে মথুরের ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবু আপনাকে ডাকিতে-ছেন।" ঠাকুর মথুরের নিকট যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া হৃদয় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন,—"যাইলেই, আমাকে এখানে থাকিতে বলিবে, চাকরি স্বীকার করিতে বলিবে।" হৃদয় বলিল, 'তাহাতে দোষ কি? এমন স্থানে, মহতের আশ্রয়ে কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া ত ভাল বৈ মন্দ নয়, তবে কেন ইতস্ততঃ করিতেছ?"

ঠাকুরের পূজকের পদ গ্রহণ।

ঠাকুর।—"আমার চাকরিতে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ এখানে পূজা করিতে স্বীকার করিলে দেবীর অঙ্গে যে সমস্ত অলঙ্কারাদি আছে তাহার জন্য দায়ী থাকিতে হইবে; সে বড় হাঙ্গামার কথা; আমার দ্বারা উহা সম্ভব হইবে না; তবে যদি তুমি ঐ কার্য্যের ভার লইয়া এখানে থাক তাহা হইলে আমার পূজা করিতে আপত্তি নাই।"

হৃদয় এখানে চাকরির অন্বেষণেই আসিয়াছিল। সুতরাং ঠাকুরের ঐ কথায় আনন্দে স্বীকৃত হইল। ঠাকুর তখন মথুর বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার দ্বারা দেবালয়ে কর্ম্ম-স্বীকার করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করি-লেন। শ্রীযুত মথুর তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইয়া ঐ দিন হইতে তাঁহাকে কালীমন্দিরে বেশকারীর পদে নিযুক্ত করিলেন এবং হৃদয়কে ঠাকুর ও রামকুমারকে সাহায্য করিতে আদেশ করিলেন।

মথুর বাবুর অনুরোধে ভ্রাতাকে ঐরূপে কার্য্যে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া রামকুমার অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

৺গোবিন্দ বিগ্রহ ভগ্ন হওয়া।

দেবালয়প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি হইয়া গেল। সন ১২৬২ সালের ভাদ্র মাস উপস্থিত। পূর্ব্বদিনে মন্দিরে জন্মাষ্টমীকৃত্য যথাযথ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আজ নন্দোৎসব। মধ্যাহ্নে ৺রাধাগোবিন্দজীর বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি হইয়া গেলে পূজক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৺রাধারাণীকে কক্ষান্তরে শয়ন করাইয়া আসিয়া ৺গোবিন্দজীকে শয়ন করাইতে লইয়া যাইবার সময় বিগ্রহহস্তে পড়িয়া গেলেন; বিগ্রহের একটী পদ ভাঙ্গিয়া যাইল। ঐ ঘটনায় মন্দিরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। নানা পণ্ডিতের মতামত লইবার পর ঠাকুরের পরামর্শে ৺গোবিন্দজীর বিগ্রহটীর ভগ্নাংশ জুড়িয়া পূজা চলিতে লাগিল।* ঠাকুরকে ইতিপূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট হইতে দেখিয়া মথুর বাবু ভগ্নবিগ্রহপরিবর্ত্তন বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ-গ্রহণে এখন সমুৎসুক হইয়াছিলেন। হৃদয় বলিতেন, পরামর্শ দিবার পূর্ব্বে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং ভাবভঙ্গ হইলে বলিয়াছিলেন, বিগ্রহমূর্ত্তি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। ঠাকুর যে ভগ্নবিগ্রহ সুন্দরভাবে জুড়িতে পারেন, একথা মথুর বাবুর অবিদিত ছিল না। সুতরাং মথুর বাবুর অনুরোধে তাঁহাকেই এখন ঐ বিগ্রহ জুড়িয়া দিতে হইয়াছিল। ঠাকুর উহা এমন সুন্দররূপে জুড়িয়াছিলেন যে বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেও ঐ মূর্ত্তি যে কোনকালে ভগ্ন হইয়াছিল একথা বুঝিতে পারা যায় না।

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—ষষ্ঠ অধ্যায় ১৯০ পৃষ্ঠা দেখ।

৺রাধাগোবিন্দজীর বিগ্রহ ঐরূপে ভগ্ন হইলে অঙ্গহীন বিগ্রহে পূজা সিদ্ধ হয় না বলিয়া অনেকে অনেক কথা তখন বলাবলি করিত। রাণী রাসমণি ও মথুর বাবু কিন্তু ঠাকুরের যুক্তিযুক্ত পরামর্শে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া ঐ সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না। সে যাহা হউক, পূজক ক্ষেত্রনাথ অনবধানতার অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হইলেন। ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজার ভার তদবধি ঠাকুরের উপরে ন্যস্ত হইল এবং হৃদয় শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজাকালে বেশ করিয়া রামকুমারকে সাহায্য করিতে লাগিল।

ভগ্নবিগ্রহে পূজা সম্বন্ধে ঠাকুর জয়নারায়ণ বাবুকে যাহা বলেন।

বিগ্রহ ভঙ্গপ্রসঙ্গে হৃদয় এক সময়ে আমাদিগের নিকট আর একটী কথার উল্লেখ করিয়াছিল। কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে, বরানগরে কুটিঘাটার নিকটে নড়ালের প্রসিদ্ধ জমীদার ৺রতন রায়ের ঘাট বিদ্যমান। ঐ ঘাটের নিকটে একটী ঠাকুরবাটী আছে। উহাতে দশমহাবিদ্যা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা। পূর্ব্বে উক্ত ঠাকুরবাটীতে পূজাদির বেশ বন্দোবস্ত থাকিলেও ঠাকুরের সাধন-কালে উহা হীন-দশাপন্ন হইয়াছিল। মথুর বাবু যখন ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেছেন তখন তিনি এক সময়ে উক্ত দেবালয় দর্শন করিতে আসেন এবং অভাব দেখিয়া মথুর বাবুকে বলিয়া ভোগের জন্য দুই মন চাউল ও দুইটী করিয়া টাকার মাসিক বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। দর্শন করিয়া ফিরিবার কালে, ঠাকুর একদিন এখানকার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার জয় নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনেকগুলি লোকের সহিত স্বপ্রতিষ্ঠিত ঘাটে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পরিচয় থাকায় ঠাকুর তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। জয় নারায়ণ বাবু তাঁহাকে নমস্কার ও সাদরে আহ্বান করিয়া

অপর সকলকে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন; পরে কথা-প্রসঙ্গে রাণী রাসমণির কালীবাটীর কথা তুলিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মহাশয়! ওখানকার ৺গোবিন্দজী কি ভাঙ্গা?" ঠাকুর তাহাতে বলিয়াছিলেন, "তোমার কি বুদ্ধি গো? অখণ্ডমণ্ডলাকার যিনি, তিনি কি কখন ভাঙ্গা হন?" জয়নারায়ণ বাবুর প্রশ্নে নিরর্থক নানা কথা উঠিবার সম্ভাবনা দেখিয়া ঠাকুর ঐরূপে ঐ প্রসঙ্গ পাল্‌টাইয়া দেন, এবং প্রসঙ্গান্তরের উত্থাপন করিয়া সকল বস্তুর অসার ভাগ ছাড়িয়া সার ভাগ গ্রহণ করিতে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। সুবুদ্ধিসম্পন্ন জয়নারায়ণ বাবুও ঠাকুরের ইঙ্গিতে উহা বুঝিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন।

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, ঠাকুরের পূজা একটা দেখিবার বিষয় ছিল; যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত। আর, ঠাকুরের সেই প্রাণের উচ্ছ্বাসে মধুর কণ্ঠে গান?—

ঠাকুরের সঙ্গীতশক্তি।

সে গান যে একবার শুনিত সে কখন ভুলিতে পারিত না। তাহাতে ওস্তাদি কালোয়াতি ঢং ঢাং কিছুই ছিল না। ছিল কেবল, গীতোক্ত বিষয়ের ভাবটী আপনাতে সম্পূর্ণ আরোপ করিয়া মর্ম্মস্পর্শী মধুর স্বরে যথাযথ প্রকাশ এবং তাল লয়ের বিশুদ্ধতা। ভাবই যে সঙ্গীতের প্রাণস্বরূপ একথা, যে তাঁহার গান শুনিয়াছে সেই বুঝিয়াছে। আবার তাল লয় বিশুদ্ধ না হইলে ঐ ভাব যে আত্মপ্রকাশে বাধা পাইয়া থাকে একথা ঠাকুরের মুখনিঃসৃত সঙ্গীত শুনিয়া এবং অপরের সঙ্গীতের সহিত উহার তুলনা করিয়া বেশ বুঝা যাইত। রাণী রাসমণি যখন দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন তখন ঠাকুরকে ডাকাইয়া তাঁহার গান শুনিতেন। নিম্নলিখিত গীতটী তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল—

কোন্ হিসাবে হরহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিব বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥
জেনেছি জেনেছি তারা
তারা কি তোর এমনি ধারা
তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল অম্‌নি করে॥

ঠাকুরের গীত অত মধুর লাগিবার আর একটী কারণ ছিল। গান গাহিবার সময়ে তিনি গীতোক্তভাবে নিজে এত মুগ্ধ হইতেন যে, অপর কাহারও প্রীতির জন্য গান গাহিতেছেন একথা একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। গীতোক্তভাবে মুগ্ধ হইয়া ঐরূপে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইতে আমরা জীবনে অপর কাহাকেও দেখি নাই। ভাবুক গায়কেরাও শ্রোতার নিকট হইতে প্রশংসার প্রত্যাশা কিছু না কিছু রাখিয়া থাকেন। ঠাকুরকে কেবল দেখিয়াছি, তাঁহার গীত শুনিয়া কেহ প্রশংসা করিলে, যথার্থই ভাবিতেন ঐ ব্যক্তি গীতোক্ত ভাবের প্রশংসা করিতেছে এবং উহার বিন্দুমাত্র তাঁহার প্রাপ্য নহে।

হৃদয় বলিতেন, এই কালে গীত গাহিতে গাহিতে দুই চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত; এবং যখন পূজা করিতেন, তখন এমন তন্ময়ভাবে উহা করিতেন, যে, পূজাস্থানে কেহ আসিলে বা নিকটে দাঁড়াইয়া কথা কহিলে তিনি উহা আদৌ টের পাইতেন না। ঠাকুর বলিতেন, অঙ্গন্যাস, করন্যাস প্রভৃতি পূজাঙ্গসকল সম্পন্ন করিবার কালে ঐ সকল মন্ত্রবর্ণ নিজ দেহে উজ্জ্বল বর্ণে সন্নিবেশিত রহিয়াছে বলিয়া তিনি বাস্তবিক দেখিতে পাইতেন! বাস্তবিকই দেখিতেন,—সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী-শক্তি সুযুম্নামার্গ দিয়া সহস্রারে উঠিতেছেন এবং শরীরের

প্রথম পূজাকালে ঠাকুরের দর্শন।

যে যে অংশকে ঐ শক্তি ত্যাগ করিতেছেন সেই সেই অংশগুলি এককালে নিস্পন্দ, অসাড় ও মৃতবৎ হইয়া যাইতেছে! আবার পূজাপদ্ধতির বিধানানুসারে যখন "রং ইতি জলধারয়া বহ্নি-প্রাকারং বিচিন্ত্য"—অর্থাৎ, রং এই মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণপূর্ব্বক পূজক আপনার চতুর্দ্দিকে জল ছড়াইয়া ভাবিবে যেন অগ্নির প্রাচীর দ্বারা পূজাস্থান বেষ্টিত রহিয়াছে এবং তজ্জন্য কোন প্রকার বিঘ্নবাধা তথায় প্রবেশ করিতে পারিতেছে না—প্রভৃতি কথার উচ্চারণ করিতেন তখন দেখিতে পাইতেন তাঁহার চতুর্দ্দিকে শত জিহ্বা বিস্তার করিয়া অনুল্লঙ্ঘনীয় অগ্নির প্রাচীর সত্য সত্যই বিদ্যমান থাকিয়া পূজাস্থানকে সর্ব্ববিধ বিঘ্নের হস্ত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে! হৃদয় বলিত, পূজার সময় ঠাকুরের তেজঃপুঞ্জ শরীর ও তন্মনস্ক ভাব দেখিয়া অপর ব্রাহ্মণগণ বলাবলি করিতেন,—সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব যেন নরশরীর পরিগ্রহ করিয়া পূজা করিতে বসিয়াছেন!

ঠাকুরকে কার্য্যদক্ষ করিবার জন্য রামকুমারের শিক্ষাদান।

দেবীভক্ত রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অবধি আত্মীয়-গণের ভরণ পোষণ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেও অন্য এক বিষয়ের জন্য মধ্যে মধ্যে বড় চিন্তিত হইতেন। কারণ, দেখিতেন, এখানে আসিয়া অবধি কনিষ্ঠের নির্জ্জনপ্রিয়তা ও সংসার সম্বন্ধে কেমন একটা উদাসীন উদাসীন ভাব! কোন কাজেই যেন তাঁহার আঁট দেখিতে পাইতেন না। প্রথমে ভাবিতেন, বালক বোধ হয় কামারপুকুরে মাতার নিকট ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, এবং ঐ বিষয় সদা সর্ব্বদা চিন্তা করিতেছে। দেখিতেন, বালক সকাল সন্ধ্যা যখন তখন একাকী মন্দির হইতে দূরে গঙ্গাতীরে পদচারণ করিতেছে,

পঞ্চবটী বৃক্ষমূলে স্থির হইয়া বসিয়া আছে, অথবা পঞ্চবটীর চতুর্দ্দিকে তখন যে জঙ্গলপূর্ণ স্থান ছিল বহুক্ষণ পরে তন্মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে। কিন্তু দিনের পর দিন যাইলেও বালক যখন গৃহে ফিরিবার কথা তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া বলিল না এবং কখন কখন তাহাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াও তিনি যখন উহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না, তখন তাহাকে বাড়ীতে ফিরিয়া পাঠাইবার কথা ছাড়িয়া দিলেন! ভাবিলেন, তাঁহার নিজের বয়স হইয়াছে, শরীর দিন দিন অপটু হইয়া পড়িতেছে, কবে পরমায়ু ফুরাইবে কে বলিতে পারে?—এ অবস্থায় আর সময় নষ্ট না করিয়া, তাঁহার অবর্ত্তমানে বালক যাহাতে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া দু'পয়সা উপার্জ্জন করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে পারে এমনভাবে তাহাকে মানুষ করিয়া দিয়া যাওয়া তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং মথুরবাবু যখন বালককে দেবালয়ে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন তখন তিনি বিশেষ আনন্দিত হয়েন! পরে দিনের পর দিন যাইলে কনিষ্ঠের মন ফিরিয়া যখন সে মথুর বাবুর অনুরোধে প্রথমে বেশকারী ও পরে পূজকের পদে ব্রতী হইল এবং দক্ষতার সহিত ঐ কার্য্যসকল সম্পন্ন করিতে লাগিল তখন রামকুমার অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন এবং এখন হইতে তাহাকে চণ্ডীপাঠ শ্রীশ্রীকালিকা মাতার পূজাকার্য্য প্রভৃতি আদ্যোপান্ত শিখাইতে লাগিলেন। ভাবিলেন উহাতে সে মানুষ হইবে এবং তিনিও কোন দিন পূজা করিতে অপারগ হইলে জগদম্বার, পূজা ও সেবা-কার্য্যে গোলযোগ ঘটিবে না। ঠাকুর অচিরে ঐ সকল শিখিয়া লইলেন; এবং শাক্তী দীক্ষা না লইয়া দেবীপূজা প্রশস্ত নহে জানিয়া শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার সঙ্কল্প স্থির করিলেন।

কেনারাম ভট্টাচার্য্যের নিকট ঠাকুরের শক্তি-দীক্ষা গ্রহণ।

শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক প্রবীণ শক্তিসাধক তখন কলিকাতার বৈঠকখানা বাজারে বাস করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে রাসমণির দেবালয়ে তাঁহার মধ্যে মধ্যে গতায়াত ছিল। মথুরবাবু-প্রমুখ রাণীর পরিবারবর্গের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল বলিয়া বোধ হয়। হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন, অনুরাগী সাধক বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ঠাকুরের অগ্রজ রামকুমার ভট্টাচার্য্যের সহিত ইনি পূর্ব্ব হইতে পরিচিত ছিলেন। ঠাকুর ইহাঁর নিকট হইতেই দীক্ষাগ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। শুনিয়াছি, দীক্ষাগ্রহণ করিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবেশে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত কেনারাম তাঁহার অসাধারণ ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ইষ্টলাভবিষয়ে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন!

রামকুমারের মৃত্যু।

রামকুমারের শরীর এখন হইতে মধ্যে মধ্যে অপটু হওয়াতেই হউক, অথবা ঠাকুরকে ঐ কার্য্যে অভ্যস্ত করাইবার জন্যই হউক, তিনি এই সময়ে প্রায় ৺রাধাগোবিন্দজীর সেবা স্বয়ং সম্পন্ন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্রীকালী মাতার পূজাকার্য্যে ঠাকুরকে নিযুক্ত করিতে থাকিলেন! কয়েক দিন এইরূপ হইলে মথুর বাবু একদিন ঐকথা জানিতে পারিয়া রাণীকে বলিয়া রামকুমারকে এখন হইতে বরাবর বিষ্ণুঘরে পূজা করিতে অনুরোধ করিলেন। অতএব এখন হইতে কালীঘরে ঠাকুর পূজক ও হৃদয় বেশকারীরূপে নিযুক্ত থাকিলেন। ঐরূপে পূজার বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তন করিবার কারণ বোধ হয় ইহাই যে, মথুর বাবু ভাবিয়াছিলেন কালীঘরের

সেবাকার্য্যে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, বৃদ্ধ রামকুমারের শরীর অপটু হওয়ায় ঐ কার্য্যভার বহন করা তাঁহার শক্তিতে কুলাইতেছে না। রামকুমার ঐরূপ বন্দোবস্তে বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কনিষ্ঠকে কালীঘরের পূজা ও সেবাকার্য্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করিতে শিখাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ইহার কিছুকাল পরে রামকুমার, মথুর বাবুকে বলিয়া হৃদয়কে ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজায় নিযুক্ত করিলেন এবং অবসর লইয়া কিছু দিনের জন্য গৃহে ফিরিবার যোগাড় করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকুমারকে আর গৃহে ফিরিতে হয় নাই। গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে কলিকাতার উত্তরে শ্যামনগর মূলাজোড় নামক স্থানে কয়েক দিনের জন্য কার্য্যান্তরে গমন করিয়া তিনি সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রামকুমার ভট্টাচার্য্য রাণী রাসমণির দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক বৎসরকাল মাত্র জীবিত থাকিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজা করিয়াছিলেন। অতএব সম্ভবতঃ সন ১২৬৩ সালের প্রারম্ভে তাঁহার শরীর ত্যাগ হইয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন।

ঠাকুরের এই কালের আচরণ।

অতি অল্প বয়সেই ঠাকুরের পিতার মৃত্যু হয়। সুতরাং জ্ঞানোন্মেষের প্রারম্ভ হইতে তিনি নিজ জননী চন্দ্রমণি ও অগ্রজ রামকুমারের স্নেহে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের অপেক্ষা রামকুমার প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসরের বড় ছিলেন।

অতএব ঠাকুরের পিতৃভক্তির কিয়দংশ তিনি পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং পিতৃতুল্য অগ্রজের সহসা মৃত্যু হওয়ায় ঠাকুর যে এখন নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন—একথা নিশ্চয়। জরাযুক্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, ও মৃত ব্যক্তির দর্শনে শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারের সংসারত্যাগের কথা লোকপ্রসিদ্ধ। কে বলিবে, ঠাকুরের জীবনে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা তাঁহার শুদ্ধ মনে সংসারের অনিত্যতাসম্বন্ধীয় ধারণা দৃঢ় করিয়া উহাতে বৈরাগ্যানল প্রবৃদ্ধ করিতে কতদূর সহায়তা করিয়াছিল? যাহাই হউক, এই সময় হইতে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজায় সমধিক মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং তৃষিত মানব তাঁহার দর্শনে বাস্তবিক কৃতার্থ হয় কি না তদ্‌বিষয় জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, এই সময় হইতে তিনি পূজান্তে মন্দিরমধ্যে শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে বসিয়া তন্মনস্কভাবে দিন যাপন করিতেন এবং রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তপ্রমুখ ভক্তগণরচিত সঙ্গীতসকল ৺দেবীকে শুনাইতে শুনাইতে প্রেমে বিহ্বল ও আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। আবার, এখন হইতে তিনি বৃথা বাক্যালাপাদি করিয়া তিলমাত্র সময় ব্যয় করিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত হইতেন এবং মধ্যাহ্নে ও রাত্রে যখন ৺দেবীর মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হইত, তখন লোকসঙ্গ পরিহার করিয়া পঞ্চবটীর চতুঃপার্শ্বস্থ জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জগন্মাতার চিন্তা ও ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া কালযাপন করিতেন।

হৃদয়ের তদ্দর্শনে চিন্তা ও সঙ্কল্প।

ঠাকুরের ঐ প্রকার চেষ্টাসমূহ হৃদয়ের প্রীতিকর হয় নাই। কিন্তু কি করিবে? বাল্যকাল হইতে ঠাকুর যখন যাহা ধরিয়াছেন তখনি তাহা সম্পাদন করিয়াছেন, কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই, একথা তাহার

অবিদিত ছিল না। সুতরাং প্রতিবাদ বা বাধা দেওয়া বৃথা। কিন্তু দিনের পর দিন ঠাকুরের ঐ ভাব প্রবল বেগে বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া হৃদয় কখন কখন একটু আধটু না বলিয়াও থাকিতে পারিত না। আবার, রাত্রে নিদ্রা না যাইয়া শয্যাত্যাগ করিয়া ঠাকুর কোথায় চলিয়া যান, একথা জানিতে পারিয়া হৃদয় বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়াছিল। কারণ, মন্দিরে ঠাকুরসেবার পরিশ্রম, তাহার উপর পূর্ব্ববৎ আহার নাই, এ অবস্থায় রাত্রে নিদ্রা না যাইলে শরীর ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা। হৃদয় স্থির করিল ঐ বিষয়ের সন্ধান এবং যথাসাধ্য প্রতিবিধান করিতে হইবে।

ঐ সময়ে পঞ্চবটী-প্রদেশের অবস্থা।

পঞ্চবটীর চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান তখন এখনকার মত সমতল ছিল না; নীচু জমি, খানাখন্দ ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। নানা বুনো গাছগাছড়ার সহিত এক ধাত্রী বা আমলকী বৃক্ষ তথায় জন্মিয়াছিল। একে কবরডাঙ্গা, তাহার উপর জঙ্গল, সে জন্য দিবাভাগেও কেহ ঐ স্থানে বড় একটা যাইত না। যাইলেও জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইত না। আর, রাত্রে ?—ভূতের ভয়ে কেহই ঐ দিক মাড়াইত না! হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, পূর্ব্বোক্ত আমলকী বৃক্ষটী নীচু জমিতে থাকায় তাহার তলে কেহ বসিয়া থাকিলে জঙ্গলের বাহিরের উচ্চ জমি হইতে কাহারও নয়নগোচর হইত না। ঠাকুর এই সময়ে উহারই তলে বসিয়া রাত্রে ধ্যান ধারণা করিতেন।

হৃদয়ের প্রশ্ন, 'রাত্রে জঙ্গলে যাইয়া কি কর'?

এক দিন রাত্রে ঠাকুর ঐ স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলে হৃদয় অলক্ষ্যে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল এবং ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত জঙ্গল-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, দেখিতে পাইল। তিনি বিরক্ত হইবেন

ভাবিয়া সে আর অগ্রসর হইল না। কিন্তু তাঁহাকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত আশে পাশে ঢিল্ ঢাল্ ছুড়িতে থাকিল। ঠাকুর তাহাতে ফিরিলেন না দেখিয়া অগত্যা সে স্বয়ং গৃহে ফিরিল। পরদিন অবসরকালে হৃদয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জঙ্গলের ভিতর রাত্রে যাইয়া কি কর বল দেখি?" ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিলেন, "ঐ স্থানে একটা আমলকী গাছ আছে, তাহার তলায় বসিয়া ধ্যান করি; শাস্ত্রে বলে আমলকী গাছের তলায় যে যাহা কামনা করিয়া ধ্যান করে তাহার তাহা সিদ্ধ হয়।"

ঠাকুরকে হৃদয়ের ভয় দেখাইবার চেষ্টা।

ঐ ঘটনার পরে কয়েক দিন ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত আমলকী বৃক্ষের তলায় ধ্যানধারণা করিতে বসিলেই মধ্যে মধ্যে লোষ্ট্রাদি নিক্ষিপ্ত হওয়া প্রভৃতি নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল। উহা হৃদয়ের কর্ম্ম বুঝিয়াও ঠাকুর তাহাকে কিছুই বলিলেন না। হৃদয় কিন্তু ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। এক দিন ঠাকুর বৃক্ষতলে যাইবার কিছুক্ষণ পরে নিশঃব্দে জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দূর হইতে দেখিল, তিনি পরিধেয় বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া সুখাসীন হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন! দেখিয়া ভাবিল, 'মামা কি পাগল হইল না কি? এরূপ ত পাগলেই করে; ধ্যান করিবে, কর; কিন্তু এরূপ উলঙ্গ হইয়া কেন?'

হৃদয়কে ঠাকুরের বলা,—'পাশমুক্ত হইয়া ধ্যান করিতে হয়।'

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, ঐরূপ ভাবিয়া সে আর কালবিলম্ব না করিয়া ঠাকুরের নিকটে সহসা উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "এ কি হচ্ছে? পৈতে, কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে?" কয়েকবার ডাকাডাকির পরে

ঠাকুরের হুঁস হইল এবং হৃদয়কে নিকটে দাঁড়াইয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিতে শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, "তুই কি জানিস? এইরূপে পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান কর্‌তে হয়; জন্মাবধি মানুষ ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান এই অষ্ট পাশে বদ্ধ হয়ে রয়েছে; পৈতেগাছটাও 'আমি ব্রাহ্মণ, সকলের চেয়ে বড়'—এই অভিমানের চিহ্ন এবং একটা পাশ; মাকে ডাক্‌তে হলে ঐ সব পাশ ফেলে দিয়ে এক মনে ডাক্‌তে হয়, তাই ঐ সব খুলে রেখেছি; ধ্যান করা শেষ হলে ফির্‌বার সময় আবার পর্‌ব।" হৃদয় ঐরূপ কথা পূর্ব্বে আর কোথাও শুনে নাই, সুতরাং অবাক্ হইয়া রহিল, এবং উত্তরে কিছুই বলিতে না পারিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। ইতিপূর্ব্বে সে ভাবিয়াছিল, মাতুলকে অনেক কথা অছ্য বুঝাইয়া বলিবে ও তিরস্কার করিবে—তাহার কিছুই করা হইল না।

শরীর এবং মন উভয়ের দ্বারা ঠাকুরের জাত্যভিমান নাশের, 'সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন' হইবার ও সর্ব্বজীবে শিবজ্ঞান লাভের জন্য অনুষ্ঠান।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাপ্রসঙ্গে একটী কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল। কারণ, উহা জানা থাকিলে ঠাকুরের জীবনের পরবর্ত্তী অনেকগুলি ঘটনা আমরা সহজে বুঝিতে পারিব। আমরা দেখিলাম, অষ্টপাশের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য কেবলমাত্র মনে মনে ঐ সকলকে ত্যাগ করিয়াই ঠাকুর নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, কিন্তু শরীরের দ্বারা ঐ সকলকে যতদূর ত্যাগ করা যাইতে পারে তাহা করিয়াছিলেন। পরজীবনে অন্য সকল বিষয়েও ঐরূপ করিতে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই। যথা—

জাত্যভিমান নাশ করিয়া মনে যথার্থ দীনতা আনয়নের জন্য তিনি, অপরে যে স্থানকে অশুদ্ধ ভাবিয়া

সর্ব্বথা পরিহার করে, সে স্থান বহুপ্রযত্নে স্বহস্তে পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন।

'সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ' না হইলে অর্থাৎ ইতরসাধারণের নিকটে বহুমূল্য বলিয়া পরিগণিত স্বর্ণাদি ধাতু ও প্রস্তরসকলকে মৃণ্ময় ইষ্টকখণ্ডের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিতে না পারিলে, মানব-মন শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-লাভরূপ উদ্দেশ্য হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখে সম্পূর্ণ ধাবিত হয় না এবং যোগারূঢ় হইতে পারে না—একথা শুনিয়াই ঠাকুর কয়েক খণ্ড মুদ্রা ও লোষ্ট্র হস্তে গ্রহণ করিয়া বারম্বার 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলিতে বলিতে উহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

সর্ব্ব জীবে শিবজ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্য কালীবাটীতে কাঙ্গালীদের ভোজন সাঙ্গ হইলে, দেবতার প্রসাদজ্ঞানে তিনি তাহাদের উচ্ছিষ্টান্ন কিঞ্চিৎ গ্রহণ (ভক্ষণ) ও মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। পরে, উচ্ছিষ্ট পত্রাদি মস্তকে বহন করিয়া গঙ্গাতীরে নিক্ষেপপূর্ব্বক স্বহস্তে মার্জ্জনী ধরিয়া ঐ স্থান ধৌত করিয়াছিলেন এবং নিজ নশ্বর শরীরের দ্বারা ঐরূপে দেবসেবা যৎকিঞ্চিৎ সাধিত হইল ভাবিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ত্যাগের ক্রম

ঐরূপ নানা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সকল স্থলেই দেখা যায়, ঈশ্বরলাভের পথে প্রতিকূল বিষয়সকলকে কেবলমাত্র মনে মনে ত্যাগ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। কিন্তু, স্থূলভাবে ঐ সকলকে প্রথমে ত্যাগ করিয়া অথবা, নিজ শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গকে ঐ সকল বিষয় হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখিয়া

তদ্বিপরীত অনুষ্ঠানসকল করিতে তিনি উহাদিগকে বলপূর্ব্বক নিয়োজিত করিতেন। দেখা যায়, ঐরূপ অনুষ্ঠানে তাঁহার মনের পূর্ব্ব সংস্কারসকল এককালে উৎসন্ন হইয়া যাইত এবং তদ্বিপরীত নবীন সংস্কারসকলকে উহা এমন দৃঢ়ভাবে ধারণ করিত যে, কখনই সে আর বিপরীত কার্য্যসকল করিতে পারিত না। এইরূপে কোন নবীনভাব মনের দ্বারা প্রথম গৃহীত হইয়া শরীরেন্দ্রিয়াদিসহায়ে কার্য্যে কিঞ্চিন্মাত্রও যতক্ষণ না অনুষ্ঠিত হইত ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ের যথাযথ ধারণা হইয়া উহার বিপরীত ভাবের ত্যাগ হইয়াছে, একথা তিনি স্বীকার করিতেন না।

ঐ ক্রম সম্বন্ধে 'মনঃকল্পিত সাধন পথ' বলিয়া আপত্তি ও তাহার মীমাংসা।

পূর্ব্ব সংস্কারসমূহ ত্যাগ করিতে নিতান্ত পরাঙ্মুখ আমরা ভাবি, ঠাকুরের ঐরূপ আচরণের কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না। তাঁহার ঐরূপ আচরণসকলের আলোচনা করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলিয়া বসিয়াছেন—"অপবিত্র কদর্য্য স্থান পরিষ্কৃত করা, 'টাকা, মাটি, মাটি টাকা' বলিয়া মৃত্তিকাসহ মুদ্রা-খণ্ডসকল গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া প্রভৃতি ঘটনাবলী তাঁহার নিজ মনঃকল্পিত সাধনপথ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব উপায়সকল অবলম্বনে তিনি মানসিক যে সকল ফল পাইয়াছিলেন তাহা অতি শীঘ্রই তদপেক্ষা সহজ উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে।" উত্তরে বলিতে হয়—উত্তম কথা, কিন্তু ঐরূপ বাহ্য অনুষ্ঠানসকল না করিয়া কেবলমাত্র মনে মনে বিষয়-ত্যাগরূপ তোমাদের তথাকথিত সহজ উপায়ের অবলম্বনে কয় জন লোক এ পর্য্যন্ত

পূর্ণভাবে রূপরসাদি-বিষয়সমূহ হইতে বিমুখ হইয়া ষোল আনা মন ঈশ্বরে অর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছে ? উহা কখনই হইবার নহে। মন একরূপ চিন্তা করিয়া একদিকে চলিবে, এবং শরীর ঐ চিন্তা বা ভাবের বিপরীত কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া অন্য পথে চলিবে—এই প্রকারে কোন মহৎ কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না, ঈশ্বরলাভ ত দূরের কথা। কিন্তু রূপরসাদি ভোগলোলুপ মানব ঐকথা বুঝে না! কোন বিষয় ত্যাগ করা ভাল বলিয়া বুঝিয়াও সে পূর্ব্বসংস্কারবশে নিজ শরীরে ন্দ্রিয়াদির দ্বারা উহা ত্যাগ করিতে অগ্রসর হয় না এবং ভাবিতে থাকে, 'শরীর যেরূপ কার্য্য করুক না কেন, মনে ত আমি অন্যরূপ ভাবিতেছি!' যোগ ও ভোগ একত্রে গ্রহণ করিবে ভাবিয়া সে আপনাকে আপনি ঐরূপে প্রতারিত করিয়া থাকে। কিন্তু আলোকান্ধকারের ন্যায় যোগ ও ভোগরূপ দুই পদার্থ কখন একত্রে থাকিতে পারে না। কাম-কাঞ্চনময় সংসার ও ঈশ্বরের সেবা যাহাতে একত্রে একই কালে সম্পন্ন করিতে পারা যায় এরূপ সহজ পথের আবিষ্কার, আধ্যাত্মিক জগতে এ পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারে নাই।* শাস্ত্র সেজন্য আমাদিগকে বারম্বার বলিতেছেন, 'যাহা ত্যাগ করিতে হইবে তাহা কায়মনোবাক্যে ত্যাগ করিতে হইবে এবং যাহা গ্রহণ করিতে হইবে তাহাও ঐরূপ কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিতে হইবে, তবেই সাধক ঈশ্বরলাভের অধিকারী হইবেন।' ঋষিগণ সে জন্যই বলিয়াছেন, মানসিক ভাবোদ্দীপক শারীরিক চিহ্ন ও অনুষ্ঠানরহিত তপস্যাসহায়ে,—"তপসাবাপ্যলিঙ্গাৎ,"—মানব কখন আত্মসাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ

---

* Ye cannot serve God and Mammon together.
(Holy Bible)

হয় না। যুক্তিও বলে, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে কারণে মানবমন ক্রমশঃ অগ্রসর হয়—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

ঠাকুর এই সময়ে যে ভাবে পূজাদি করিতেন।

সে যাহা হউক, দেখিতে পাওয়া যায়, অগ্রজের মৃত্যুর পর ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য যাহাই অনুকূল বলিয়া বুঝিতেছেন তাহাই বিশ্বস্তচিত্তে ব্যগ্র হইয়া সম্পন্ন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে যথারীতি পূজা সমাপনান্তে ৺দেবীকে নিত্যরাম প্রসাদ-প্রমুখ সিদ্ধ ভক্তদিগের রচিত সঙ্গীতসমূহ শ্রবণ করান তিনি পূজাঙ্গের অন্যতম বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ ঐ সকল গীত গাহিতে গাহিতে তাঁহার চিত্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিত। ভাবিতেন—রামপ্রসাদপ্রমুখ ভক্তেরা মার দর্শন পাইয়াছিলেন; জগজ্জননীর দর্শন তবে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়; আমি কেন তবে তাঁহার দর্শন পাইব না? ব্যাকুলহৃদয়ে বলিতেন—"মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমায় তবে কেন দেখা দিবি না? আমি ধন, জন, ভোগসুখ, কিছুই চাহি না, আমায় দেখা দে!"—প্রার্থনা করিতে করিতে নয়নধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত এবং ঐরূপ কাতর ক্রন্দনে হৃদয়ের ভার কিঞ্চিৎ লঘু হইলে বিশ্বাসের মুগ্ধ প্রেরণায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় গীত গাহিয়া ৺দেবীকে প্রসন্না করিতে উদ্যত হইতেন। এইরূপে পূজা ধ্যান ও ভজনে দিন যাইতে লাগিল এবং ঠাকুরের মনের অনুরাগ ও ব্যাকুলতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিল।

অদ্ভুত পূজকের দেবীর পূজা ও সেবা সম্পন্ন করিবার নির্দ্দিষ্ট

কাল এই সময় হইতে দিনদিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। পূজা করিতে বসিয়া তিনি যথাবিধি নিজ মস্তকে একটী পুষ্প দিয়াই হয়ত দুই ঘণ্টাকাল স্থাণুর ন্যায় স্পন্দহীনভাবে ধ্যানস্থ রহিলেন, অন্নাদি নিবেদন করিয়া, মা খাইতেছেন ভাবিতে ভাবিতেই হয়ত বহুক্ষণ কাটাইলেন, প্রত্যূষে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া মালা গাঁথিয়া ৺দেবীকে সাজাইতে কত সময় ব্যয় করিলেন, অথবা অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে সন্ধ্যারতিতেই বহুক্ষণ ব্যাপৃত রহিলেন। আবার অপরাহ্ণে বা আরতির অন্তে জগন্মাতাকে যদি গান শুনাইতে আরম্ভ করিলেন তবে এমন তন্ময় ও ভাববিহ্বল হইলেন যে, সময় অতীত হইতেছে একথা বারম্বার স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে আরাত্রিক বা সান্ধ্য শীতলাদি কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইল!—এইরূপে কিছুকাল পূজা চলিতে লাগিল।

ঠাকুরের এইকালে পূজাদি কার্য্যসম্বন্ধে মথুরপ্রমুখ সকলে যাহা ভাবিত।

ঐরূপ নিষ্ঠা, ভক্তি ও ব্যাকুলতা দেখিয়া ঠাকুরবাটীর জনসাধারণের দৃষ্টি যে, এখন ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। সাধারণে সচরাচর যে পথে চলিয়া থাকে তাহা ছাড়িয়া নূতনভাবে কাহাকেও চলিতে বা কিছু করিতে দেখিলে লোকে প্রথম বিদ্রূপ পরিহাসাদি করিয়া থাকে। কিন্তু দিনের পর যত দিন যাইতে থাকে এবং ঐ ব্যক্তি দৃঢ়তাসহকারে নিজ গন্তব্য পথে যত অগ্রসর হয় ততই সাধারণের মনে পূর্ব্বোক্ত ভাব পরিবর্ত্তিত হয় এবং উহার স্থল শ্রদ্ধা আসিয়া অধিকার করে। ঠাকুরের ভাগ্যেও যে ঐরূপ হয় নাই তাহা নহে। কিছুদিন ঐরূপে পূজা করিতে না করিতেই তিনি অনেকেরই বিদ্রূপ-ভাজন হইলেন। কিছুকাল পরে কেহ কেহ আবার তাঁহার প্রতি

শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিল। শুনা যায়, মথুর বাবু এই সময়ে ঠাকুরের পূজাদি দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে রাণী রাসমণিকে বলিয়াছিলেন, "অদ্ভুত পূজক পাওয়া গিয়াছে, ৺দেবী শীঘ্রই জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন!" লোকের ঐরূপ মতামতে ঠাকুর কিন্তু কোন দিন নিজ গন্তব্য পথ হইতে বিচলিত হন নাই। সাগরগামিনী নদীর ন্যায় তাঁহার মন এখন হইতে অবিরাম একভাবেই শ্রীজগন্মাতার শ্রীপাদোদ্দেশে প্রধাবিত হইয়াছিল।

ঈশ্বরানুরাগের বৃদ্ধিতে ঠাকুরের শরীরে যে সকল বিকার উপস্থিত হয়।

দিনের পর যত দিন যাইতে লাগিল ঠাকুরের মনে অনুরাগ, ব্যাকুলতাও, তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং মনের ঐ প্রকার অবিরাম একদিকে গতি তাঁহার শরীরে নানা প্রকার বাহ্য লক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঠাকুরের আহার কমিয়া গেল, নিদ্রা কমিয়া গেল। শরীরের রক্তপ্রবাহ বক্ষে ও মস্তিষ্কে নিরন্তর দ্রুত প্রধাবিত হওয়ায়, বক্ষঃস্থল সর্ব্বদা আরক্তিম হইয়া রহিল, চক্ষু মধ্যে মধ্যে সহসা জলভারাক্রান্ত হইতে লাগিল, এবং ভগবদ্দর্শনের জন্য একান্ত ব্যাকুলতাবশতঃ তাঁহার মন 'কি করিব, কেমনে পাইব' এইরূপ একটা চিন্তা নিরন্তর পোষণ করায় ধ্যান পূজাদি কাল ভিন্ন অন্য সময়ে তাঁহার শরীরে একটা অশান্তি ও চাঞ্চল্যের ভাব সদাই লক্ষিত হইতে লাগিল।

ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে একদিন তিনি জগদম্বাকে গান শুনাইতেছিলেন এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, 'মা, এত যে ডাক্‌চি তার কিছুই তুই কি শুন্‌চিস্ না? রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েচিস্, আমাকে কি দেখা দিবি না?" ঠাকুর বলিতেন—

শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রথম দর্শনলাভের বিবরণ। ঠাকুরের ঐ সময়ের ব্যাকুলতা।

মা'র "দেখা পাইলাম না বলিয়া তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা; জলশূন্য করিবার জন্য লোকে যেমন সজোরে গামছা নিঙ্‌ড়াইয়া থাকে, মনে হইল, ভিতরে হৃদয় মনটাকে ধরিয়া কে যেন তদ্রূপ করিতেছে! মার দেখা বোধ হয় কোন কালেই পাইব না ভাবিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। অস্থির হইয়া ভাবিলাম, তবে আর এ জীবনে আবশ্যক নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল, দৃষ্টি সহসা তাহারই উপর পড়িল। উহার সাহায্যে এই দণ্ডেই জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা হস্তে লইয়াছি, এমন সময়ে সহসা মা'র অদ্ভুত অপূর্ব্ব দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম! তাহার পর বাহিরে কি যে হইয়াছে, কোন্ দিক দিয়া সেদিন ও তৎপরদিন যে গিয়াছে তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই! অন্তরে অন্তরে কিন্তু একটা অননুভূতপূর্ব্ব জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মা'র সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম!"

কালীমন্দিরের পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত দর্শনের কথা ঠাকুর অন্য একদিন আমাদিগকে এইরূপে বিবৃত করিয়া বলেন, "ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই!—আর দেখিতেছি কি?—এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র!—যে দিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল উর্ম্মিমালা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা অগ্রসর হইয়া আমার উপরে নিপতিত হইল এবং এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া, হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম!" ঐরূপে প্রথম দর্শনকালে

ঠাকুর, চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্রের দর্শনলাভের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু, চৈতন্য-ঘন, জগদম্বার বরাভয়করা মূর্ত্তি?—ঠাকুর কি এখন তাহারও দর্শন এই জ্যোতিঃ-সমুদ্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন? পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, কারণ শুনিয়াছি, প্রথম দর্শনের সময়ে তাঁহার কিছু-মাত্র সংজ্ঞা যখনি হইয়াছিল তখনি তিনি কাতরকণ্ঠে 'মা', 'মা' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত দর্শনের বিরাম হইলে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী মূর্ত্তির অবাধ অবিরাম দর্শনলাভের জন্য ঠাকুরের প্রাণে একটা অবিশ্রান্ত আকুল ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল! বাহ্য ক্রন্দন ও নয়নধারায় সকল সময়ে প্রকাশিত না হইলেও উহা অন্তরে সকল সময়ে বিদ্যমান থাকিত, এবং কখন কখন এত বৃদ্ধি পাইত যে, আর চাপিতে না পারিয়া ভূমিতে লুটাইয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে 'মা আমার কৃপা কর্, দেখা দে'—বলিয়া এমন ক্রন্দন করিতেন যে, চারি পার্শ্বে লোক দাঁড়াইয়া যাইত!—ঐরূপ অস্থির চেষ্টায় লোকে কি বলিবে, এ কথার বিন্দুমাত্রও তখন তাঁহার মনে আসিত না। তিনি বলিতেন, "চারি দিকে লোক দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহাদিগকে ছায়া বা ছবিতে আঁকা মূর্ত্তির ন্যায় অবাস্তব মনে হইত এবং তজ্জন্য মনে কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচের উদয় হইত না! ঐরূপ অসহ্য যন্ত্রণায় বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইবার পরেই কিন্তু দেখিতাম, মা'র ঐ বরাভয়করা চিণ্ময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি!—দেখিতাম ঐ মূর্ত্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে!"

সপ্তম অধ্যায়।

সাধনা ও দিব্যোন্মত্ততা।

প্রথম দর্শনের পরের অবস্থা।

শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রথম দর্শনলাভের আনন্দ ও উত্তেজনায় ঠাকুর কয়েক দিনের জন্য একেবারে কাজের বাহির হইয়া পড়িলেন। মন্দিরে পূজাদি কার্য্য নিয়মিতভাবে প্রত্যহ সম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। হৃদয় উহা অন্য এক ব্রাহ্মণের সহায়ে কোনরূপে সম্পাদন করিতে লাগিল এবং মাতুল বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার চিকিৎসায় মনোনিবেশ করিল। ভূকৈলাসের রাজবাটীতে নিযুক্ত এক সুযোগ্য বৈদ্যের সহিত হৃদয়ের ইতিপূর্ব্বে কোনও সূত্রে পরিচয় হইয়াছিল, হৃদয় এখন তাঁহারই দ্বারা ঠাকুরের চিকিৎসা করাইতে লাগিল এবং রোগের শীঘ্র উপশমের সম্ভাবনা না দেখিয়া কামারপুকুরে ঠাকুরের মাতা ও ভ্রাতার নিকটে সংবাদ পাঠাইল।

ঠাকুরের ঐ সময়ের শারীরিক ও মানসিক প্রত্যক্ষ এবং দর্শনাদি।

ভগবদ্দর্শনের জন্য উদ্দাম ব্যাকুলতায় ঠাকুর যেদিন একেবারে অস্থির হইয়া না পড়িতেন সেদিন পূর্ব্ববৎ নিয়মিতভাবে পূজা করিতে অগ্রসর হইতেন। পূজা ও ধ্যানাদি করিবার কালে ঐ সময়ে তাঁহার যেরূপ চিন্তা ও অনুভব উপস্থিত হইত তিনি তদ্বিষয়ে আমাদিগকে কখন কখন কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। বলিতেন, "মার নাটমন্দিরের ছাদের আলিশায় যে ধ্যানস্থ ভৈরব মূর্ত্তি আছে, ধ্যান করিতে যাইবার সময় তাহাকে দেখাইয়া মনকে বলিতাম, 'ঐরূপ স্থির নিস্পন্দভাবে বসিয়া মার



ঠাকুরের সাধন স্থান পঞ্চবটী।

পাদপদ্ম চিন্তা করিতে হইবে।' ধ্যান করিতে বসিবামাত্র শুনিতে পাইতাম শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গ্রন্থিসকলে, পায়ের দিক হইতে উর্দ্ধে, খট্ খট্ করিয়া আওয়াজ হইতেছে এবং একটার পর একটা করিয়া গ্রন্থিগুলি আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে, কে যেন ভিতরে ঐ সকল স্থান তালাবদ্ধ করিয়া দিতেছে! যতক্ষণ ধ্যান করিতাম ততক্ষণ শরীর যে, একটুও নাড়িয়া চাড়িয়া আসন পরিবর্ত্তন করিয়া লইব, অথবা ইচ্ছামাত্রেই ধ্যান ছাড়িয়া অন্যত্র গমন বা অন্য কর্ম্মে লিপ্ত হইব তাহার সামর্থ্য থাকিত না! পূর্ব্ববৎ খট্ খট্ করিয়া—এবার উপরের দিক হইতে পা পর্য্যন্ত—আওয়াজ হইয়া ঐ সকল গ্রন্থি পুনরায় যতক্ষণ না খুলিয়া যাইত ততক্ষণ একভাবে কে যেন জোর করিয়া বসাইয়া রাখিত! ধ্যান করিতে বসিয়া প্রথম প্রথম খদ্যোৎপুঞ্জের ন্যায় জ্যোতিবিন্দুসমূহ দেখিতে পাইতাম; কখন বা কুয়াসার ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতিতে চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত দেখিতাম; আবার কখন বা গলিত রূপার ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিঃতরঙ্গে সমুদয় পদার্থ পরিব্যাপ্ত দেখিতাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঐরূপ দেখিতাম; আবার অনেক সময়ে চক্ষু চাহিয়াও ঐরূপ দেখিতে পাইতাম। কি দেখিতেছি তাহা বুঝিতাম না, ঐরূপ দর্শন হওয়া ভাল কি মন্দ তাহাও জানিতাম না। সুতরাং মার (৺জগন্মাতার) নিকট ব্যাকুলহৃদয়ে প্রার্থনা করিতাম—'মা, আমার কি হচ্চে, কিছুই বুঝি না; তোকে ডাকিবার মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি না; যাহা করিলে তোকে পাওয়া যায়, তুইই তাহা আমাকে শিখিয়ে দে। তুই না শিখালে আমাকে কে আর শিখাবে মা; তুই ছাড়া আমার গতি ও সহায় আর কেহই যে নাই!' এক মনে ঐরূপে প্রার্থনা করিতাম এবং প্রাণের ব্যাকুলতায় কাতর ক্রন্দন করিতাম!"

প্রথম দর্শনলাভে ঠাকুরের প্রত্যেক চেষ্টা ও ভাবে কিরূপ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়।

ঠাকুরের পূজা ধ্যানাদি এই সময়ে এক অভিনব অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিয়াছিল। সে অদ্ভুত তন্ময়ভাব অপরকে বুঝান কঠিন! তাহাতে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে আশ্রয় করিয়া বালকের সরলতা, বিশ্বাস, নির্ভর ও মাধুর্য্যই কেবলমাত্র বর্ত্তমান থাকিত। প্রবীণের গাম্ভীর্য্য, পুরুষকার অবলম্বনে দেশকালপাত্র বুঝিয়া বিধি নিষেধ মানিয়া চলা এবং ভবিষ্যৎ ভাবিয়া একুল ওকুল দুকুল রাখিয়া ব্যবহার করা ইত্যাদির কিছুই লক্ষিত হইত না! দেখিলেই মনে হইত, 'মা, তোর শরণাগত বালককে যাহা কিছু বলিতে ও করিতে হইবে তাহা তুইই বলা ও করা'— হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে ঐরূপ বলিয়া ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার ভিতর আপনার ক্ষুদ্র ইচ্ছা ও অভিমানকে ডুবাইয়া দিয়া এককালে যন্ত্রস্বরূপ হইয়াই যেন তিনি যত কিছু কার্য্য করিতেছেন। উহাতে সংসারের ইতরসাধারণের বিশ্বাস ও কার্য্যকলাপের সহিত তাঁহার ব্যবহার-চেষ্টাদির বিশেষ বিরোধ উপস্থিত হইয়া নানালোকে নানা কথা, প্রথম অস্ফুট জল্পনায়, পরে উচ্চ স্বরে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু ঐরূপ হইলে ও করিলে কি হইবে? জগদম্বার বালক এখন তাঁহারই অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে চলিতে ফিরিতে এবং যাহা করিবার তাহা করিতেছিল, সংসারের ক্ষুব্ধ কোলাহল তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছিল না। ঠাকুর এখন সংসারে থাকিয়াও সংসারে ছিলেন না। বহির্জগৎ এখন তাঁহার নিকট স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল এবং চেষ্টা করিয়াও তিনি উহাতে পূর্ব্বের ন্যায় বাস্তবতা আনিতে পারিতেছিলেন না। শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী আনন্দঘনমূর্ত্তিই কেবল তাঁহার নিকটে এখন একমাত্র সার পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।

ঠাকুরের ইতিপূর্ব্বের পূজা ও দর্শনাদির সহিত এই সময়ের ঐ সকলের প্রভেদ।

পূজা ধ্যানদি করিতে বসিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে বহুযত্নে দেখিতেন, কোন দিন মার হাতখানি, বা কোমলোজ্জ্বল পা খানি, বা 'সৌম্যাৎ-সৌম্য' হাস্য-দীপ্ত মধুর স্নিগ্ধ মুখখানি—এখন, পূজাধ্যান-কাল ভিন্ন অন্য সময়েও দেখিতে পাইতেন, সর্ব্বাবয়বসম্পন্না জ্যোতির্ম্ময়ী মা, হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন, 'এটা কর্, ওটা করিস্ না,' বলিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন।

পূর্ব্বে মাকে অন্নাদি নিবেদন করিয়া দেখিতেন, মার "নয়ন হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃরশ্মি 'লক্ লক্' করিয়া নির্গত হইয়া নিবেদিত আহার্য্যসমুদায় স্পর্শ ও তাহার সারভাগ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় নয়নে সংহৃত হইতেছে!"—এখন দেখিতে পাইতেন, ভোগ নিবেদন করিয়া দিবার পূর্ব্বেই সেই মা শ্রীঅঙ্গের প্রভায় মন্দির আলো করিয়া সাক্ষাৎ খাইতে বসিয়াছেন! হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, পূজাকালে একদিন সে সহসা উপস্থিত হইয়া দেখে ঠাকুর জগদম্বার পাদপদ্মে জবাবিল্বার্ঘ্য দিবেন বলিয়া উহা হস্তে লইয়া তন্ময় হইয়া চিন্তা করিতে করিতে সহসা—'রোস্, রোস্, আগে মন্ত্রটা বলি তার পর খাস্'—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং পূজা সম্পূর্ণ না করিয়া অগ্রে নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিলেন!

পূর্ব্বে ধ্যান পূজাদিকালে দেখিতেন, সম্মুখস্থ পাষাণময়ী মূর্ত্তিতে এক অপূর্ব্ব জীবন্ত জাগ্রত অধিষ্ঠান আবির্ভূত হইয়াছে—এখন মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পাষাণময়ীকে আর দেখিতেই পাইতেন না। দেখিতেন, তৎস্থলে জীবিতা জাগ্রতা চিন্ময়ী মাতা বরাভয়কর-সুশোভিতা হইয়া সর্ব্বদা দণ্ডায়মানা। ঠাকুর বলিতেন,

"নাসিকায় হাত দিয়া দেখিয়াছি, মা সত্য সত্যই নিশ্বাস ফেলিতে-ছেন! তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও রাত্রিকালে দীপালোকে মন্দির-দেউলে মার দিব্যাঙ্গের ছায়া কখন পতিত হইতে দেখি নাই! আপন কক্ষে বসিয়া শুনিয়াছি, মা পাঁইজোর পরিয়া বালিকার মত আনন্দিতা হইয়া ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে মন্দিরের উপর তলায় উঠিতেছেন! পরীক্ষা করিবার জন্য কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিয়াছি, সত্য সত্যই মা মন্দিরের দ্বিতলের বারাণ্ডায় আলুলায়িত কেশে দাঁড়াইয়া কখন কলিকাতা, এবং কখন গঙ্গা দর্শন করিতেছেন!"

ঠাকুরের এই সময়ের পূজাদি সম্বন্ধে হৃদয়ের কথা।

হৃদয় বলিতেন, "ঠাকুর যখন শ্রীমন্দিরে থাকিতেন তখন ত কথাই নাই, অন্য সময়েও এখন কালীঘরে প্রবিষ্ট হইলে গা কেমন 'ছম্ ছম্' করিত! অথচ, পূজাকালে ঠাকুর কিরূপ ব্যবহার করেন তাহা দেখিবার প্রলোভনও ছাড়িতে পারিতাম না। অনেক সময়ে সহসা উপস্থিত হইতাম এবং যাহা দেখিতাম তাহাতে তখন বিস্ময় ভক্তিতে অন্তর পূর্ণ হইলেও পরে, বাহিরে আসিয়া মনে সন্দেহ হইত। ভাবিতাম, মামা কি সত্য সত্যই পাগল হইলেন না কি?—নতুবা পূজায় এরূপ অনাচার করেন কেন? আবার ভাবিতাম—রাণী-মাতা ও মথুর বাবু এইরূপ পূজার কথা জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন ও বলিবেন? ঐকথা ভাবিয়া মনে বিষম ভয়ও হইত। মামার কিন্তু ঐরূপ কথা একবারও মনে আসিত না, এবং বলিলেও তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না! আবার, অধিক কথাও তাঁহাকে এখন বলিতে পারিতাম না; কে জানে কেন, একটা অব্যক্ত ভয় ও সঙ্কোচ আসিয়া অনেক সময় মুখ চাপিয়া ধরিত!

—এবং কি জানি কিসের জন্য, তাঁহার ও আমার মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয় দূরত্বের ব্যবধান অনুভব করিতাম। অগত্যা চুপ করিয়া তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিতাম। কিন্তু মনে মনে ভাবিতাম যে, কোন দিন ইনি একটা কাণ্ড না বাঁধাইয়া বসেন।”

পূজাকালে মন্দির-মধ্যে সহসা উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের যে সকল চেষ্টা দেখিয়া হৃদয়ের বিস্ময়, ভয় ও ভক্তি যুগপৎ উপস্থিত হইত তৎসম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে এইরূপে বলিয়াছিলেন—

“দেখিতাম, জবাবিল্বার্ঘ্য সাজাইয়া মামা, প্রথমতঃ উহা দ্বারা নিজ মস্তক, বক্ষ, সর্ব্বাঙ্গ, এমন কি নিজ পদ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া পরে উহা জগদম্বার পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন।

“দেখিতাম, মাতালের ন্যায় তাঁহার বক্ষ ও চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে এবং তদবস্থায় টলিতে টলিতে পূজাসন ত্যাগ করিয়া সিংহাসনের উপর উঠিয়া সস্নেহে জগদম্বার চিবুক ধরিয়া আদর ও গান করিতে, হাস্য, পরিহাস ও কথোপকথন করিতে, অথবা হাত ধরিয়া নৃত্য করিতেই আরম্ভ করিলেন!

“দেখিতাম, শ্রীশ্রীজগদম্বাকে অন্নাদি ভোগ নিবেদন করিতে করিতে তিনি সহসা উঠিয়া পড়িলেন এবং থাল হইতে এক গ্রাস অন্নব্যঞ্জন লইয়া দ্রুতপদে সিংহাসনে উঠিয়া মার মুখে স্পর্শ করাইতে করাইতে বলিতে লাগিলেন—‘খা, মা, খা, বেশ ক’রে খা!’ পরে হয়ত বলিলেন, ‘আমাকে খেতে বল্‌চিস্? আমি খাব এখন? আচ্ছা আমি খাচ্চি!’—এই বলিয়া উহার কিয়দংশ নিজেই গ্রহণ করিলেন, এবং অবশিষ্টাংশ পুনরায় মার মুখে দিয়া বলিতে লাগিলেন—‘আমি ত খেয়েছি, এইবার তুই খা!’ একদিন দেখি, ভোগ নিবেদন করিবার সময় একটা বিড়ালকে

কালীঘরে ঢুকিয়া ম্যাও ম্যাও করিয়া ডাকিতে দেখিয়া মামা, 'খাবি মা, খাবি মা' বলিয়া ভোগের অন্ন তাহাকেই খাওয়াইতে লাগিলেন!

"দেখিতাম, রাত্রে এক এক দিন জগন্মাতাকে শয়ন দিয়া মামা, 'আমাকে কাছে শুতে বল্‌চিস্,—আচ্ছা, শুচ্ছি', বলিয়া জগন্মাতার রৌপ্যনির্ম্মিত খট্টায় কিছুক্ষণ শুইয়া রহিলেন!

"আবার দেখিতাম, পূজা করিতে বসিয়া তিনি এমন তন্ময়ভাবে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন যে বহুক্ষণ তাঁহার বাহ্যজ্ঞানের লেশমাত্র রহিল না!

"প্রত্যুষে উঠিয়া মা কালীর মালা গাঁথিবার নিমিত্ত মামা নিত্য পুষ্পচয়ন করিতেন। দেখিতাম, তখনও তিনি যেন কাহার সহিত কথা কহিতেছেন, হাসিতেছেন, আদর, আবদার, রঙ্গ, পরিহাসাদি করিতেছেন!"

"আর দেখিতাম, রাত্রিকালে মামার আদৌ নিদ্রা নাই! যখনি জাগিয়াছি তখনই দেখিয়াছি তিনি ঐরূপে ভাবের ঘোরে কথা কহিতেছেন, গান করিতেছেন বা পঞ্চবটীতে যাইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন!"

ঠাকুরের রাগাত্মিকা পূজা দেখিয়া কালীবাটীর খাজাঞ্চী প্রমুখ কর্ম্মচারীদিগের জল্পনা ও মথুর বাবুর নিকট সংবাদ প্রেরণ।

হৃদয় বলিতেন, ঠাকুরকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া মনে আশঙ্কা হইলেও উহা অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিষয়ে পরামর্শ লইবার তাঁহার উপায় ছিল না। কারণ, পাছে সে উহা ঠাকুরবাটীর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের নিকট প্রকাশ করে, এবং তাহারা শুনিয়া, ঐ কথা বাবুদের কাণে তুলিয়া তাঁহার মাতুলের অনিষ্ট সাধন করে। কিন্তু প্রতিদিন, প্রায় প্রতিদণ্ডেই যখন

ঐরূপ হইতে লাগিল তখন ঐকথা আর কেমনে চাপা যাইবে? অন্য কেহ কেহ তাঁহার ন্যায় পূজাকালে কালীঘরে আসিয়া ঠাকুরের ঐরূপ আচরণ স্বচক্ষে দেখিয়া যাইয়া খাজাঞ্চী-প্রমুখ কর্ম্মচারী-দিগের নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করিল। তাহারা ঐকথা শুনিয়া কালীঘরে আসিয়া স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিল; কিন্তু ঠাকুরের দেবতাবিষ্টের ন্যায় উগ্র উত্তেজিত আকার, অসঙ্কোচ ব্যবহার ও নির্ভীক উন্মনাভাব দেখিয়া একটা অনির্দ্দিষ্ট ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া সেই মুহূর্ত্তে সহসা তাঁহাকে কিছু বলিতে বা নিষেধ করিতে পারিল না! ঠাকুরবাটীর দপ্তরখানায় ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগের পরামর্শ চলিল। পরামর্শে স্থির হইল—হয় ভট্টাচার্য্য পাগল হইয়াছেন, না হয় ত তাঁহাতে উপদেবতার আবেশ হই-য়াছে! নতুবা পূজাকালে কেহ কখন ঐরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্বেচ্ছাচার করিতে পারে না; যাহাই হউক, ৺দেবীর পূজা ভোগ রাগাদি কিছুই হইতেছে না; ভট্টাচার্য্য সকল নষ্ট করিয়াছেন; বাবুদের এ বিষয়ে সংবাদ না দিলেই নয়।

জানবাজারে মথুর বাবুর নিকটে সংবাদ প্রেরিত হইল। উত্তরে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি শীঘ্রই স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ে যথাবিধান করিবেন; যদবধি তাহা না করিতেছেন তদ-বধি ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ভাবে পূজাদি করিতেছেন সেই ভাবেই করুন; তদ্বিষয়ে কেহ বাধা দিবে না। মথুর বাবুর ঐরূপ পত্র পাইয়া সকলে তাঁহার আগমনের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল এবং তাহাদের মধ্যে—"এইবারেই ভট্টাচার্য্য পদচ্যুত হইলেন, বাবু আসিয়াই ভট্টাচার্য্যকে দূর করিবেন—দেবতার নিকট অপরাধ, দেবতা কতদিন সহিবে বল"—ইত্যাদি নানা জল্পনা চলিতে লাগিল।

ঠাকুরের পূজা দেখিতে মথুর বাবুর আগমন ও তদ্বিষয়ে ধারণা।

মথুর বাবু কাহাকেও কিছু না জানাইয়া একদিন পূজাকালে সহসা আসিয়া কালীঘরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাকুরের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন। ভাববিভোর ঠাকুর কিন্তু তৎপ্রতি আদৌ লক্ষ্য করিলেন না। পূজাকালে মাকে লইয়াই তিনি নিত্য তন্ময় হইয়া থাকিতেন, মন্দিরে কে আসিতেছে যাইতেছে সে বিষয়ে তাঁহার আদৌ জ্ঞান থাকিত না। শ্রীযুত মথুরামোহন ঐ বিষয়টী আসিয়াই বুঝিতে পারিলেন। পরে শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট তাঁহার বালকের ন্যায় আবদার অনুরোধ প্রভৃতি দেখিয়া উহা যে ঐকান্তিক প্রেমভক্তিপ্রসূত তাহাও ধরিতে পারিলেন। তাঁহার মনে হইল,—ঐরূপ অকপট ভক্তি বিশ্বাসে যদি মাকে না পাওয়া যায় তবে কিসে তাঁহার দর্শন লাভ হইবে? পূজা করিতে করিতে ভট্টাচার্য্যের কখন গলদশ্রুধারা, কখন অকপট উদ্দাম উল্লাস এবং কখন বা জড়ের ন্যায় সংজ্ঞাশূন্যতা, অবিচলতা ও বাহ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ লক্ষ্যরাহিত্য দেখিয়া তাঁহার চিত্ত একটা অপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, শ্রীমন্দির দেবপ্রকাশে যথার্থই জম্ জম্ করিতেছে! তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইল ভট্টাচার্য্য জগন্মাতার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছেন! অনন্তর ভক্তিপূতচিত্তে সজলনয়নে শ্রীশ্রীজগন্মাতা ও তাঁহার অপূর্ব্ব পূজককে দূর হইতে বারম্বার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "এতদিনের পর ৺দেবীপ্রতিষ্ঠা সার্থক হইল, এতদিনের পর ৺ দেবীপ্রতিষ্ঠা হইল, এতদিনে মার ঠিক্ ঠিক্ পূজা হইল!" মথুর বাবু সেদিন কর্ম্মচারীদিগের কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটীতে ফিরিলেন। পর দিন

মন্দিরের প্রধান কর্ম্মচারীর উপর তাঁহার নিয়োগ আসিল, 'ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ভাবেই পূজা করুন না কেন, তাঁহাকে বাধা দিবে না!'*

প্রবল ঈশ্বরপ্রেমে ঠাকুরের রাগাত্মিকা ভক্তিলাভ—ঐ ভক্তির ফল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলী শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পাঠক একথা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, ঠাকুরের মনে এই সময়ে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল। বৈধী ভক্তির বিধিবদ্ধ সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া উহা এখন অহেতুক প্রেমভক্তির উচ্চমার্গে প্রবল-বেগে ধাবিত হইয়াছিল। ঐ পরিবর্ত্তন আবার, এমন সরল স্বাভাবিকভাবে উদয় হইয়াছিল যে, অপরের কথা দূরে থাকুক তিনি নিজেও ঐ কথা বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কেবল বুঝিয়াছিলেন যে, জগন্মাতার প্রতি ভালবাসার প্রবল প্রেরণায় তিনি ঐরূপ চেষ্টাদি না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না—কে যেন তাঁহাকে জোর করিয়া ঐরূপ করাইতেছে! ঐজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে হইতেছে, 'আমার এ কি প্রকার অবস্থা হইতেছে? আমি ঠিক পথে চলিতেছি ত?' ঐজন্য দেখা যায়, তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে জগদম্বাকে জানাইতেছেন—'মা, আমার এসব কি হইতেছে কিছুই জানি না, বুঝি না; তুই আমাকে যাহা করিবার করা, যাহা শিখাইবার শিখাইয়া দেখা দে! সর্ব্বদা আমার হাত ধরিয়া থাক্!' কাম, কাঞ্চন, মান, যশ, পৃথিবীর সমস্ত ভোগৈশ্বর্য্য হইতে মন ফিরাইয়া অন্তরের অন্তর হইতে তিনি জগন্মাতাকে ঐ কথা নিবেদন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতাও তাহাতে তাঁহার হস্ত ধরিয়া সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া তাঁহার

* গুরুভাব পূর্ব্বার্দ্ধ—৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৭১ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাধক-জীবনের পরিপুষ্টি ও পূর্ণতার জন্য যখনি যাহা কিছু ও যেরূপ লোকের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, তখনি ঐ সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে অযাচিত-ভাবে তাঁহার নিকটে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধ জ্ঞান ও শুদ্ধা ভক্তির চরম সীমায় স্বাভাবিক সহজভাবে আরূঢ় করাইয়াছিলেন! গীতামুখে শ্রীভগবান ভক্তের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

গীতা—৯ম—২২।

যে সকল ব্যক্তি অনন্যচিত্তে উপাসনা কবিয়া আমার সহিত নিত্য-যুক্ত হইয়া থাকে—সম্পূর্ণ মন আমাতে রাখিয়া শরীরধারণোপযোগী আহার-বিহারাদি বিষয়ের জন্যও চিন্তা না করে— প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই আমি (অযাচিত হইয়াও) তাহাদিগের নিকট আনয়ন করি। গীতার ঐ প্রতিজ্ঞা ঠাকুরের জীবনে কিরূপ বর্ণে বর্ণে সাফল্য লাভ করিয়াছিল তাহা আমরা ঠাকুরের এই সময়ের জীবন যত আলোচনা করিব তত সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইব! কামকাঞ্চনৈকলক্ষ্য স্বার্থপর বর্ত্তমান যুগে শ্রীভগবানের ঐ প্রতিজ্ঞার সত্যতা সুস্পষ্টরূপে পুনঃ প্রমাণিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। যুগে যুগে সাধকেরা, "সব্ ছোড়ে সব্ পাওয়ে"—শ্রীভগবানের নিমিত্ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলে প্রয়ো-জনীয় কোন বিষয়ের জন্য সাধককে অভাবগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইতে হয় না—একথা মানবকে উপদেশ করিয়া আসিলেও দুর্ব্বলহৃদয় বিষয়াবদ্ধ মানব তাহা বর্ত্তমান যুগে আবার পূর্ণভাবে না দেখিয়া বিশ্বাসী হইতে পারিতেছিল না। সেজন্য সম্পূর্ণ

অনন্যচিত্ত ঠাকুরকে লইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার শাস্ত্রীয় ঐ বাক্যের সফলতা মানবকে দেখাইবার এই অদ্ভুত লীলাভিনয়! হে মানব, পূতচিত্তে একথা শ্রবণ করিয়া ত্যাগের পথে যথাসাধ্য অগ্রসর হও!

ঠাকুরের কথা—রাগাত্মিকা বা রাগানুগা ভক্তির পূর্ণ প্রভাব, কেবল অবতার পুরুষদিগের শরীর মন ধারণ করিতে সমর্থ।

ঠাকুর বলিতেন, ঈশ্বরীয় ভাবের প্রবল বন্যা যখন অতর্কিতভাবে মানবজীবনে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহাকে চাপিবার ঢাকিবার সহস্র চেষ্টা করিলেও পারা যায় না। শুধু তাহাই নহে, অনেক সময়ে স্থূল জড় দেহ মনের সেই প্রবল বেগ ধারণ করিতে সক্ষম না হইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়। ঐরূপে অনেক সাধক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন! পূর্ণজ্ঞান বা পূর্ণা ভক্তির উদ্দাম বেগ ধারণ করিবার জন্য, উপযোগী শরীরের প্রয়োজন। অবতারপ্রথিত মহাপুরুষদিগের শরীরসকলকেই কেবলমাত্র উহার পূর্ণ বেগ সর্ব্বক্ষণ ধারণ করিয়া সংসারে জীবিত থাকিতে এপর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। ভক্তিশাস্ত্র সেজন্য তাঁহাদিগকে শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহবান্ বলিয়া বারম্বার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, রজঃ ও তমোগুণ-সম্পর্কশূন্য শুদ্ধ সত্ত্বগুণমাত্র উপাদানে গঠিত শরীর ধারণ করিয়া সংসারে আগমন করেন বলিয়াই তাঁহারা আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের পূর্ণবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন। ঐরূপ শরীর ধারণ করিয়াও তাঁহাদিগকে ঈশ্বরীয় ভাবের প্রবল বেগে অনেক সময় ক্লিষ্ট ও মুহ্যমান হইতে দেখা গিয়া থাকে, বিশেষতঃ ভক্তিমার্গ-সঞ্চরণশীল অবতারপুরুষদিগকে! ভাবের প্রবল প্রেরণায় শ্রীযুক্ত ঈশা ও শ্রীচৈতন্যের শরীরের অঙ্গগ্রন্থিসকল শিথিল হওয়া, ঘর্ম্মের ন্যায় শরীরের প্রতি রোমকূপ দিয়া

বিন্দু বিন্দু করিয়া শোণিত নির্গত হওয়া প্রভৃতি কথাতেই উহা বুঝিতে পারা যায়। ঐ সকল শারীরিক বিকার ক্লেশকর বলিয়া উপলব্ধ হইলেও উহাদের সহায়েই তাঁহাদিগের শরীর পূর্ব্বোক্ত অসাধারণ মানসিক বেগ ধারণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া আসে। পরে, ঐ বেগ-ধারণ যখন তাঁহাদিগের শরীরের সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থা হয়, দেখা যায়, ঐ বিকৃতিসকলও তখন আর তাঁহাদিগের ভিতর পূর্ব্বের ন্যায় সকল সময়ে পরিলক্ষিত হয় না।

ঐ ভক্তিপ্রভাবে ঠাকুরের শারীরিক বিকার ও তজ্জনিত কষ্ট। যথা, গাত্রদাহ। প্রথম গাত্রদাহ, পাপপুরুষ দগ্ধ হইবার কালে; দ্বিতীয়, প্রথম দর্শনলাভের পর ঈশ্বরবিরহে; তৃতীয় মধুরভাব সাধনকালে।

ভাব-ভক্তির প্রবল প্রেরণায় ঠাকুরের শরীরে এখন হইতে নানা প্রকার অদ্ভুত বিকারপরম্পরা উপস্থিত হইয়াছিল। সাধনার প্রারম্ভ হইতে তাঁহার গাত্রদাহের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। উহার বৃদ্ধিতে তাঁহাকে অনেক সময় বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ঠাকুর স্বয়ং আমাদের নিকট অনেক সময় উহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলিতেন, সন্ধ্যা-পূজাদি করিবার সময় শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে ভিতরের পাপপুরুষ দগ্ধ হইয়া গেল এইরূপ চিন্তা করিতাম। তখন কে জানিত, শরীরে সত্য সত্যই পাপ-পুরুষ আছে এবং উহাকে বাস্তবিক দগ্ধ ও বিনষ্ট করা যায়! সাধনার প্রারম্ভ হইতে গাত্রদাহ উপস্থিত হইল; ভাবিলাম, এ আবার কি রোগ হইল। ক্রমে উহা খুব বাড়িয়া অসহ্য হইয়া উঠিল। নানা কবিরাজী তেল মাখা গেল; কিন্তু কিছুতেই উহা কমিল না। পরে একদিন পঞ্চবটীতে বসিয়া আছি; দেখ্‌চি কি—মিস্ কালো রঙ্, আরক্তলোচন, ভীষণাকার একটা পুরুষ যেন মদ খাইয়া টলিতে টলিতে (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর হইতে বাহির

হইয়া সম্মুখে বেড়াইতে লাগিল ; আবার দেখি কি—আর এক-জন সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষও, গৈরিক ও ত্রিশূল ধারণ করিয়া ঐরূপে শরীরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বোক্ত ভীষণাকার পুরুষকে সবলে আক্রমণ ও কিছুক্ষণ পরে নিহত করিল ! ঐরূপ দর্শনের পরে কিছুদিনের জন্য গাত্রদাহ কমিয়া গেল ! পাপপুরুষ দগ্ধ হইবার কালে ছয় মাস কাল অনবরত বিষম গাত্রদাহে কষ্ট পাইয়াছিলাম !'

ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, পাপ-পুরুষ বিনষ্ট হইবার পরে গাত্রদাহ নিবারিত হইলেও অল্পকাল পরেই উহা তাঁহার আবার আরম্ভ হইয়াছিল। তখন ঠাকুর বৈধী ভক্তির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাগমার্গে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজাদিতে নিযুক্ত। ক্রমে ঐ গাত্রদাহ এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে ভিজা গামছা মাথায় দিয়া তিনি তিন চারি ঘণ্টাকাল গঙ্গাগর্ভে শরীর ডুবাইয়া বসিয়া থাকিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। পরে ব্রাহ্মণী আসিয়া ঐ গাত্রদাহ, শ্রীভগবানের পূর্ণ দর্শনলাভের জন্য উৎকণ্ঠা ও বিরহবেদনাপ্রসূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যেরূপ সহজ উপায়ে উহা নিবারণ করেন, সে সকল কথা আমরা অন্যত্র বিবৃত করিয়াছি।* উহার পরে ঠাকুর মধুরভাব সাধন করিবার কাল হইতে আবার গাত্রদাহে পীড়িত হইয়াছিলেন। হৃদয় বলিয়াছিলেন —বুকের ভিতর এক মালসা আগুন রাখিলে যেরূপ উত্তাপ ও যন্ত্রণা হয়, ঠাকুর ঐকালে সেইরূপ অনুভব করিতেন এবং অস্থির হইয়া পড়িতেন। ঐরূপ গাত্রদাহ মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বহুকাল পর্য্যন্ত কষ্ট দিয়াছিল। অনন্তর সাধনকালের কয়েক বৎসর পরে তিনি বারাসাতনিবাসী

* গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায়—৮ পৃষ্ঠা।

মোক্তার শ্রীযুক্ত কানাই লাল ঘোষালের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি উন্নত শক্তিসাধক ছিলেন এবং তাঁহার ঐরূপ দাহের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ইষ্টকবচ অঙ্গে ধারণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। ঐ কবচধারণে পূর্ব্বোক্ত দাহ নিবারিত হইয়াছিল।

পূজা করিতে করিতে বিষয়কর্ম্মের চিন্তার জন্য রাণী রাসমণিকে ঠাকুরের দণ্ড প্রদান।

সে যাহা হউক, ঠাকুরের ঐরূপ অদ্ভুত পূজা দেখিয়া জানবাজারে ফিরিয়া মথুরামোহন রাণী মাতাকে শুনাইলেন। ভক্তিমতী রাণী উহা শুনিয়া বিশেষ পুলকিতা হইলেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বাটীতে আসিয়া ভট্টাচার্য্যের মুখনিঃসৃত ভক্তি-মাখা সঙ্গীত শুনিয়া তিনি তাঁহার প্রতি ইতিপূর্ব্বেই স্নেহপরায়ণা হইয়াছিলেন এবং শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ-ভগ্নকালে ভট্টাচার্য্যের ভক্তিপূত বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিস্মিতা হইয়াছিলেন। * অতএব শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপালাভ যে, ঠাকুরের ন্যায় পবিত্র হৃদয়ের সম্ভবপর একথা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। ইহার অল্পকাল পরে কিন্তু এমন একটী ঘটনা উপস্থিত হইল যাহাতে রাণী ও মথুর বাবুর ঐ বিশ্বাস বিচলিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা হইয়াছিল। রাণী একদিন মন্দিরে শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন ও পূজাদি করিতে যাইয়া তদ্বিষয়ে তন্ময় না হইয়া বিষয়কর্ম্মসম্পর্কীয় একটী মামলার ফলাফল সাগ্রহে চিন্তা করিতেছিলেন! ঠাকুর অনুরুদ্ধ হইয়া সে সময় তাঁহাকে ঐ স্থানে বসিয়া সঙ্গীত শুনাইতেছিলেন। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তাঁহার মনের তদবস্থা জানিতে পারিয়া, 'এখানেও ঐ চিন্তা'— বলিয়া তাঁহার কোমলাঙ্গে আঘাত করিয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগ-

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৯০ পৃষ্ঠা।

ন্মাতার সম্মুখে বিষয়চিন্তা হইতে নিরস্ত হইতে শিক্ষাপ্রদান করেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতার কৃপাপাত্রী সাধিকা রাণী উহাতে নিজ মনের দুর্ব্বলতা ধরিতে পারিয়া অনুতপ্তা হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভক্তি ঐ ঘটনায় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ সকল কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছি। *

ভক্তির পরিণতিতে ঠাকুরের বাহ্য পূজা ত্যাগ। এইকালে তাঁহার অবস্থা।

শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে লইয়া ঠাকুরের অনুরাগ ও আনন্দোল্লাস ইহার অল্পদিন পরেই এত বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল যে, তাঁহার দ্বারা দেবীসেবার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যকলাপ কোনরূপে চলাও এখন অসম্ভব হইল। আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতিতে বৈধী কর্ম্মের ত্যাগ কিরূপ স্বাভাবিকভাবে হইয়া থাকে তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্তরূপে ঠাকুর বলিতেন, 'যেমন গৃহস্থের বধূর যে পর্য্যন্ত গর্ভ না হয় ততদিন তাহার শ্বশ্রূ তাহাকে সকল জিনিস খাইতে ও সকল কাজ করিতে দেয়; গর্ভ হইলেই ঐ সকল বিষয়ে একটু আধটু বাচবিচার আরম্ভ হয়; পরে সেই গর্ভ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই তাহার কাজ কমাইয়া দেওয়া হয়; ক্রমে যখন সে আসন্নপ্রসবা হয়, গর্ভস্থ শিশুর অনিষ্টাশঙ্কায় তখন তাহাকে আর কোন কার্য্যই করিতে দেওয়া হয় না; পরে যখন তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন ঐ সন্তানকে নাড়াচাড়া করিয়াই তাহার দিন কাটিতে থাকে!' শ্রীশ্রীজগদম্বার বাহ্যপূজা ও সেবাদি ত্যাগও ঠাকুরের ঠিক ঐরূপ স্বাভাবিকভাবে হইয়া আসিয়াছিল। এখন আর ঠাকুরের পূজা ও সেবার কালাকাল জ্ঞান ছিল না। সদাই আপনভাবে বিভোর হইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার যখন যেরূপে সেবা করিবার ইচ্ছা হইত

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৫ম অধ্যায় ১৫৬।৫৭ পৃষ্ঠা।

তখন সেইরূপই করিতেন। যথা—পূজা না করিয়াই হয়ত ভোগ নিবেদন করিয়া দিলেন! অথবা, ধ্যানে তন্ময় হইয়া আপনার পৃথগস্তিত্ব এককালে ভুলিয়া গিয়া দেবীপূজার নিমিত্ত আনীত পুষ্পচন্দনাদিতে নিজাঙ্গ ভূষিত করিয়া বসিলেন! ভিতরে বাহিরে নিরন্তর জগদম্বার দর্শনেই যে, ঠাকুরের এই কালের কার্য্যকলাপ ঐরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, একথা আমরা তাঁহার নিকটে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। আর শুনিয়াছি যে, ঐ তন্ময়তার অল্পমাত্র হ্রাস হইয়া যদি এই সময়ে কয়েক দণ্ডের নিমিত্তও তিনি মাতৃদর্শনে বাধা প্রাপ্ত হইতেন ত এমন আকুল ব্যাকুলতা আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিত যে, তখন আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া মুখ ঘর্ষণ করিতে করিতে ব্যাকুল ক্রন্দনে দিক পূর্ণ করিতেন! প্রাণ ছট্‌ফট্ করিয়া দম বন্ধ হইয়া আসিত! আছাড় খাইয়া পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরলিপ্ত হইয়া যাইতেছে, সে বিষয় লক্ষ্যই হইত না! জলে পড়িলেন বা অগ্নিতে পড়িলেন, তাহারও জ্ঞান থাকিত না! পরক্ষণেই আবার শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন পাইয়া সে ভাব কাটিয়া যাইত এবং তাঁহার মুখমণ্ডল অদ্ভুত জ্যোতি ও উল্লাসে পূর্ণ হইত—তিনি যেন আর একব্যক্তি হইয়া যাইতেন!

পূজাত্যাগসম্বন্ধে হৃদয়ের কথা এবং ঠাকুরের বর্ত্তমান অবস্থাসম্বন্ধে মথুরের সন্দেহ।

ঠাকুরের ঐরূপ অবস্থালাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মথুর বাবু তাঁহার দ্বারা পূজাকার্য্য কোনরূপে চালাইয়া লইতেছিলেন। এখন আর তদ্রূপ করা অসম্ভব বুঝিয়া পূজাকার্য্যের অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিতে সংকল্প করিলেন। হৃদয় বলেন, "মথুর বাবুর ঐরূপ সংকল্পের একটী কারণও উপস্থিত হইয়াছিল। ভাবাবিষ্ট হইয়া পূজাসন হইতে সহসা

উত্থিত হইয়া ঠাকুর একদিন মথুরবাবু ও হৃদয়কে মন্দির-মধ্যে নিকটে দেখিলেন এবং হৃদয়ের হাত ধরিয়া পূজাসনে বসাইয়া এবং মথুর বাবুকে লক্ষ্য করিরা বলিলেন, 'আজ হইতে হৃদয় পূজা করিবে ; মা বলিতেছেন, আমার পূজার ন্যায় হৃদয়ের পূজা মা সমভাবে গ্রহণ করিবেন !' বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরের ঐ কথা দেবাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন।" হৃদয়ের ঐ কথা কত-দূর সত্য তাহা বলিতে পারি না ; তবে বর্ত্তমান অবস্থায় ঠাকু-রের নিত্য পূজাদি করা যে অসম্ভব একথা মথুরের বুঝিতে বাকি ছিল না।

গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবি-রাজের চিকিৎসা।

প্রথমদর্শনকাল হইতে মথুর বাবুর মন যে ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, একথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঐ দিন হইতে তিনি সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর-বাটীতে রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পরে ক্রমশঃ তাঁহাতে অদ্ভুত গুণরাশির তিনি যত পরিচয় পাইতেছিলেন ততই মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কিছু কিছু সেবা আবশ্যকমত করিতেছিলেন, এবং স্নেহের চক্ষে দেখিয়া তাঁহাকে অপরের অযথা অত্যাচার হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। যথা—ঠাকুরের বায়ুপ্রবণ ধাতু জানিয়া মথুর তাঁহার নিমিত্ত নিত্য মিছরির সরবৎ পানের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন ; ঠাকুর রাগানুগা ভক্তিপ্রসূত পূজায় প্রবৃত্ত হইলে বাধা পাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন ; ঐরূপ আরও কয়েকটী কথার আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি।* কিন্তু রাণী রাসমণির অঙ্গে আঘাত করিয়া ঠাকুর

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৭৫ পৃষ্ঠা।

যে দিন তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে মথুরের মন যে, কিছু সন্দিগ্ধ হইয়াছিল এবং ঠাকুরের বায়ুরোগ হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, একথা আমাদিগের সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। বোধ হয়, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মথুর ঠাকুরের উন্নত অবস্থার কথা এখন হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাঁহাতে আধ্যাত্মিকতার সহিত উন্মত্ততার সংযোগ অনুমান করিয়াছিলেন। কারণ এই সময়ে তিনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দ্বারা ঠাকুরের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

শারীরিক ব্যাধি হইয়াছে অনুমান করিয়া ঐরূপে ঠাকুরের জন্য চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই মথুর এখন ক্ষান্ত হন নাই। কিন্তু নিজ মনকে সুসংযত রখিয়া যাহাতে তিনি সাধনায় অগ্রসর হন, তর্কযুক্তিসহায়ে তাঁহাকে তদ্বিষয় বুঝাইতে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। লাল জবাফুলের গাছে একত্র এক সঙ্গে শ্বেত জবা কুসুম প্রস্ফুটিত হইতে দেখিয়া কিরূপে মথুরের ঐসকল তর্ক নিস্ফল হইয়াছিল এবং কিরূপে তিনি এখন ঠাকুরের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন, সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।*

সে যাহা হউক, মন্দিরের নিত্য নিয়মিত ৺দেবীসেবা ঠাকুরের দ্বারা এখন নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া মথুর বাবু ঐ বিষয়ের অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, এবং ঠাকুরের খুল্লতাতপুত্র শ্রীযুক্ত রামতারক চট্টোপাধ্যায় এই সময়ে কর্ম্মান্বেষণে ঠাকুর-বাটীতে উপস্থিত হওয়ায় ঠাকুর আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে,

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৭৩ পৃষ্ঠা।

৺দেবীপূজায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সকল ঘটনা সন ১২৬৫ সালে, ইংরাজী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উপস্থিত হইয়াছিল।

হলধারীর আগমন।

শ্রীযুত রামতারককে ঠাকুর হলধারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। আমরা তাঁহার নিকটে ইঁহার সম্বন্ধে অনেক সময়ে অনেক কথা শুনিয়াছি। হলধারী সুপণ্ডিত ও নিষ্ঠাচারী সাধক ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যাত্ম রামায়ণাদি গ্রন্থে তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল ও তিনি উহাদিগকে নিত্য পাঠ করিতেন। ৺দেবী অপেক্ষা ৺বিষ্ণুতে তাঁহার অধিক প্রীতি থাকিলেও ৺শক্তির উপর তাঁহার দ্বেষ ছিল না। সেজন্য বিষ্ণুভক্ত হইয়াও তিনি মথুর বাবুর অনুরোধে এখন শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজাকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তবে ঐ কার্য্যে ব্রতী হইবার অগ্রে তিনি মথুর বাবুকে বলিয়া সিধা লইয়া নিত্য স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাই-বার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, মথুর বাবু তাহাতে প্রথম আপত্তি করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কেন, তোমার ভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভাগিনেয় হৃদয় ঠাকুর-বাড়ীতে প্রসাদ পাইতেছে?" বুদ্ধিমান হলধারী তাহাতে বলেন, "আমার ভ্রাতার আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা; তাহার কিছুতেই দোষ নাই; আমার ঐরূপ অবস্থা হয় নাই, নিষ্ঠাভঙ্গে দোষ হইবে।" মথুর বাবু তাঁহার ঐরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট হন, এবং তদবধি হলধারী সিধা লইয়া পঞ্চবটীতলে নিত্য স্বপাক ভোজন করিতেন।

শক্তিদ্বেষী না হইলেও হলধারীর ৺দেবীকে পশুবলিদানে প্রবৃত্তি হইত না; এবং ঠাকুর-বাটীতে পর্ব্বকালে ৺জগদম্বাকে পশুবলি প্রদান করা বিধি থাকায় ঐকালে আনন্দে ও উৎসাহে পূজা করিতে পারিতেন না। কথিত আছে, হলধারী প্রায় এক মাস পূজা করিবার পরে, এক দিবস সন্ধ্যা করিতে বসিয়াছেন

এমন সময় দেখিলেন, ৺দেবী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বলেন, "তুই এস্থান হইতে উঠিয়া যা; তোর পূজা করিতে হইবে না; পূজাপরাধে তোর সন্তানের মৃত্যু হইবে!" শুনা যায়, এই ঘটনার কয়েক দিন পরে হলধারী, পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পান এবং ঠাকুরের নিকট ঐ বিষয় আদ্যোপান্ত বলিয়া ৺দেবীপূজায় বিরত হন। সেজন্য এখন হইতে তিনি শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের পূজা করিতে এবং হৃদয় ৺দেবীপূজা করিতে থাকেন। ঘটনাটী আমরা হৃদয়ের ভ্রাতা শ্রীযুত রাজারামের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম।

অষ্টম অধ্যায়।

প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা।

সাধনকালের সময়-নিরূপণ।

ঠাকুরের সাধনকালের আলোচনা করিতে হইলে, তিনি আমাদিগকে ঐ কালসম্বন্ধে নিজমুখে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই ঐ কালের একটা সময় নির্দ্দেশ করা অসম্ভব হইবে না। পাঠককে আমরা বলিয়াছি, আমরা তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল নিরন্তর নানা মতের সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। রাণী রাসমণির মন্দির-সংক্রান্ত দেবোত্তর দানপত্র দর্শনে

নিশ্চয় সাব্যস্ত হয়, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৩১ মে বৃহস্পতিবারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সন ১২৬২ সালেই ঠাকুর পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব সন ১২৬২ হইতে সন ১২৭৩ সাল পর্য্যন্তই যে তাঁহার সাধনকাল, একথা সুনিশ্চিত। কিন্তু উক্ত দ্বাদশ বৎসর ঠাকুরের সাধনকাল বলিয়া বিশেষ-ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইলেও উহার পরে তীর্থদর্শনে গমন করিয়া ঐ সকল স্থলে এবং তথা হইতে ফিরিয়া দক্ষিণেশ্বরে তিনি কখন কখন সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা দেখিতে পাইব।

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ বৎসরকে আমরা তিনভাগে ভাগ করিয়া উহার প্রত্যেক অংশের আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। প্রথম ১২৬২ হইতে ১২৬৫, চারি বৎসর—যে কালের প্রধান প্রধান কথার আমরা ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয়, ১২৬৬ হইতে ১২৬৯ পর্য্যন্ত, চারি বৎসর—যে কালে ঠাকুর, ব্রাহ্মণীর নির্দ্দেশে গোকল ব্রত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান প্রধান চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সকল সাধন যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৃতীয় ১২৭০ হইতে ১২৭৩ পর্য্যন্ত, চারি বৎসর—যে কালে তিনি 'জটাধারী' নামক রামাইত সাধুর নিকট হইতে রাম-মন্ত্রে উপদিষ্ট হন ও শ্রীশ্রীরামলালাবিগ্রহ লাভ করেন, বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্ত সখীভাবলাভের জন্য ছয়মাস কাল স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া সাধনায় নিযুক্ত থাকেন—আচার্য্য শ্রীতোতাপুরীর নিকট হইতে বৈদিক মহাবাক্য গ্রহণ করিয়া সমাধির নির্ব্বিকল্প ভূমিতে আরোহণ করেন এবং পরিশেষে শ্রীযুক্ত গোবিন্দের নিকট

ঐ কালের তিনটী প্রধান বিভাগ।

হইতে ইস্‌লামী ধর্ম্মে উপদেশ গ্রহণ করেন। উক্ত দ্বাদশ বৎসরের ভিতরেই তিনি বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত সখ্যভাব সাধন এবং কর্ত্তাভজা নবরসিক প্রভৃতি বৈষ্ণবমতের অবান্তর সম্প্রদায় সকলের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব মতের অবান্তর সম্প্রদায়সকলের সহিত তিনি যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, একথা বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী প্রমুখ ঐ সকল পথের সাধকবর্গের তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক সহায়তালাভের জন্য আগমনেই স্পষ্ট বুঝা যায়। ঠাকুরের সাধনকালকে পূর্ব্বোক্তরূপে তিনভাগে ভাগ করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখিলে ঐ তিন ভাগের প্রত্যেকটীতে অনুষ্ঠিত তাঁহার সাধনসকলের মধ্যে একটা শ্রেণীগত বিভিন্নতা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুরের অবস্থা ও দর্শনাদির পুনরাবৃত্তি।

আমরা দেখিয়াছি—সাধনকালের প্রথম ভাগে ঠাকুর বাহিরের সহায়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টের নিকট দীক্ষামাত্র গ্রহণ করিয়া সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঈশ্বরলাভের জন্য অন্তরের একান্ত ব্যাকুলতাই ঐকালে তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিল এবং ঐ ব্যাকুলতাই ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর ভাব ধারণ করিয়া অচিরকাল মধ্যে তাঁহার শরীর মনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আশাতীত নবীনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল। তদ্ভিন্ন উপাস্যের প্রতি অসীম ভালবাসা আনিয়া উহা, বৈধী ভক্তির কঠোর বহিঃশাসন উল্লঙ্ঘন করাইয়া তাঁহাকে রাগানুগা ভক্তিপথে অগ্রসর করিয়াছিল এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রত্যক্ষ দর্শনে ধনী করিয়া তাঁহাকে যোগ-বিভূতিসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিল।

ঐকালে শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন লাভ হইবার পরে ঠাকুরকে আবার সাধন কেন করিতে হইয়াছিল। গুরুপদেশ শাস্ত্রবাক্য ও নিজ কৃত প্রত্যক্ষের একতাদর্শনে শান্তিলাভ।

পাঠক হয়ত বলিবেন—'তবে আর বাকি রহিল কি ?—ঐকালেই ত ঠাকুর যোগসিদ্ধি ও ঈশ্বরলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন; তবে পরে আবার সাধন কেন ?' উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হয়—একভাবে ঐ কথা যথার্থ হইলেও পরবর্ত্তীকালে সাধনার প্রয়োজন ছিল। ঠাকুর বলিতেন—'বৃক্ষ ও লতাসকলের সাধারণ নিয়মে আগে ফুল, পরে ফল হইয়া থাকে; উহাদের কোন কোনটী কিন্তু এমন আছে যাহাদিগের আগেই ফল দেখা দিয়া পরে ফুল দেখা দেয়!' সাধনক্ষেত্রে ঠাকুরের মনের বিকাশও ঠিক ঐরূপভাবে হইয়াছিল। এজন্য পাঠকের পূর্ব্বোক্ত কথাটা আমরা এক ভাবে সত্য বলিতেছি। কিন্তু সাধনকালের প্রথম ভাগে ঐরূপে দর্শনাদি হইলেও ঐ সকলকে, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ সাধককুলের উপলব্ধির সহিত যতক্ষণ না মিলাইতে পারিতেছিলেন, শাস্ত্রীয় প্রণালী অবলম্বনে অগ্রসর হইয়া যতক্ষণ না নিজ উপলব্ধিসকলকে পুনরায় উপলব্ধি করিতে-ছিলেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ সকলের সত্যতা এবং উহাদিগের চরম সীমা সম্বন্ধে ঠাকুর দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারিতেছিলেন না। সেজন্য পরবর্ত্তীকালে তাঁহার সাধনার প্রয়োজন হইয়াছিল। সেজন্য শ্রীশ্রীজগন্মাতার অচিন্ত্য কৃপায় কেবলমাত্র অন্তরের ব্যাকুলতা-সহায়ে যাহা তিনি ইতিপূর্ব্বে দেখিয়া শুনিয়াছিলেন তাহাই আবার শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ ও প্রণালী অবলম্বনে প্রত্যক্ষ করিবার তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছিল। শাস্ত্র বলেন গুরুমুখে শ্রুত অনুভব ও শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সাধককুলের অনুভবের সহিত সাধক আপন ধর্ম্মজীবনের দিব্যদর্শন ও অলৌকিক অনুভব-

সকল যতক্ষণ না মিলাইয়া সমসমান বলিয়া দেখিতে পায় ততক্ষণ সে এককালে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না; এবং গুরু-মুখে শ্রুত অনুভব, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ প্রাচীন সাধককুলের অনুভব, ও সাধক নিজে যাহা অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিতেছে, এই তিনটী বিষয়কে মিলাইয়া সাধক যখনি এক বলিয়া দেখিতে পায় তখনই সে সর্ব্বতোভাবে ছিন্নসংশয় হইয়া পূর্ণ শান্তির অধিকারী হয়।

ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেব গোস্বামীর ঐরূপ হইবার কথা।

পূর্ব্বোক্ত কথার দৃষ্টান্ত-স্বরূপে আমরা পাঠককে ব্যাসপুত্র পরমহংসাগ্রণী শ্রীযুক্ত শুকদেব গোস্বামীর জীবন-ঘটনা নির্দ্দেশ করিতে পারি। মায়া-রহিত শুকের জন্মাবধি জীবনে নানাপ্রকার দিব্যদর্শন ও অনুভব উপস্থিত হইত। ঐ সকলের সত্যাসত্য ও চরম সীমা নির্দ্ধারণের জন্য তিনি নিজ পিতা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ব্যাসের নিকট ষড়ঙ্গ বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। স্বাধ্যায় সমাপ্ত হইলে তিনি পিতাকে বলিলেন, শাস্ত্রে যে সকল অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ আছে তাহা ত আমি জন্মাবধিই অনুভব করিতেছি; কিন্তু ঐ সকল অবস্থা ও অনুভবই যে চরম সত্য তদ্বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হইতে পারিতেছি না; অতএব ঐ বিষয়ে আপনি যাহা অনুভব করিয়াছেন তাহাই এখন আমাকে বলুন। মহাবুদ্ধি ব্যাস মনে মনে জল্পনা করিলেন, সাধনপ্রসূত নিজ জীবনের অনুভবসমূহের উল্লেখ করিয়া আমি শুককে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও চরম সত্যসম্বন্ধে উপদেশ সতত করিয়া আসিয়াছি, তাহাতেও তাহার মন হইতে সন্দেহ দূর হয় নাই, সে ভাবিয়াছে সত্য-লাভার্থী পুত্রের মানসিক ব্যাকুলতার প্রশমনের জন্য পুত্র-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া আমি তাহাকে ঐরূপ বলিয়াছি; সেজন্য

অন্য কোন মনীষী ব্যক্তির নিকটে তাহার ঐ বিষয় শ্রবণ করা ভাল। ঐ কথা ভাবিয়া ব্যাস বলিলেন, আমি তোমার ঐ সন্দেহ নিরসনে অসমর্থ; মিথিলার বিদেহরাজ জনকের যথার্থ জ্ঞানী বলিয়া প্রতিপত্তির কথা তোমার অবিদিত নাই; তাঁহার নিকটে গমন করিয়া তুমি সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লও। মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে, শুক পিতার ঐ কথা শুনিয়া অবিলম্বে মিথিলা গমন করিলেন এবং রাজর্ষি জনকের নিকট ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের যেরূপ অনুভূতি উপস্থিত হয়, শুনিয়া গুরূপদেশ শাস্ত্রবাক্য ও নিজ জীবনানুভবের সহিত উহার একতা দেখিয়া শান্তিলাভ করিলেন।

ঠাকুরের সাধনার অন্য কারণ স্বার্থে নহে—পরার্থে।

পূর্ব্বোক্ত কারণ ভিন্ন, ঠাকুরের পরবর্ত্তী কালে সাধনার অন্য গভীর কারণসমূহও ছিল। ঐ সকলের উল্লেখমাত্রই আমরা এখানে করিতে পারিব। নিজ জীবনে শান্তিলাভই ঠাকুরের সাধনার উদ্দেশ্য ছিল না। শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহাকে জগতের কল্যাণের জন্য শরীর-পরিগ্রহ করাইয়াছিলেন। সুতরাং যথার্থ আচার্য্য-পদবী গ্রহণের জন্য তাঁহাকে সকল প্রকার ধর্ম্মমতের সাধনা ও চরমোদ্দেশ্যের সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছিল। সেজন্যই স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া ঠাকুরের সকল প্রকার ধর্ম্মমতের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের অদ্ভুত প্রয়াস। শুধু তাহাই নহে, নিরক্ষর পুরুষের জীবনে, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ অবস্থাসকলের কেবলমাত্র অনুষ্ঠান-সহায়ে স্বভাবতঃ উদয় করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বা ঠাকুরের শরীর-মনাবলম্বনে বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণাদি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্যতাও বর্ত্তমান যুগে প্রমাণিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেজন্য স্বয়ং শান্তিলাভ করিবার পরেও ঠাকুরের

সাধনার বিরাম হয় নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মমতের সিদ্ধপুরুষ ও পণ্ডিত-সকলকে ঠাকুরের নিকট যথাকালে উপস্থিত করিয়া, তাঁহাকে সাধন ও ধর্ম্মশাস্ত্রসকল শ্রবণ করাইয়া, শ্রুতিধরত্বগুণসহায়ে ঐ সকল আয়ত্ত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা যে জগন্মাতা ঠাকুরকে পূর্ব্বোক্ত প্রয়োজনবিশেষ সাধনের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন, একথা আমরা এই অদ্ভুত জীবনালোচনায় যত অগ্রসর হইব ততই স্পষ্ট বুঝিতে পারিব।

যথার্থ ব্যাকুলতার উদয়ে সাধকের ঈশ্বরলাভ। ঠাকুরের জীবনে উক্ত ব্যাকুলতা কতদূর উপস্থিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঈশ্বর দর্শনের জন্য অন্তরের ব্যাকুল আগ্রহই ঠাকুরের প্রধান অবলম্বনীয় হইয়াছিল। তখনও এমন কোন লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হন নাই যিনি তাঁহাকে সকল বিষয়ে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি-বদ্ধ পথে চালিত করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর করিবেন। সুতরাং সকল সাধনপ্রণালীর অন্তর্গত তীব্র আগ্রহরূপ সাধারণ বিধিই তাঁহার একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়াছিল। কেবল মাত্র উহার সহায়ে ঠাকুরের ৺জগদম্বার দর্শন লাভ হওয়ায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, বাহ্য কোন বিষয়ের সহায়তা না পাইলেও একমাত্র ব্যাকুলতা থাকিলেই সাধকের ঈশ্বরলাভ হইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র উহার সহায়ে সিদ্ধকাম হইতে হইলে ঐ ব্যাকুলাগ্রহের পরিমাণ যে কত অধিক হওয়া আবশ্যক তাহা আমরা অনেক সময় অনুধাবন করিতে ভুলিয়া যাই। ঠাকুরের এই সময়ের জীবনালোচনা করিলে সে কথা আমাদিগের স্পষ্ট প্রতীতি হয়। আমরা দেখিয়াছি, তীব্র ব্যকুলতার প্রেরণায় তাঁহার আহার, নিদ্রা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়-বদ্ধ সংস্কার ও অভ্যাসসকল যেন কোথায় লুপ্ত হইয়াছিল, এবং

শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা দূরে থাকুক, জীবনরক্ষার দিকেও কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না! ঠাকুর বলিতেন, "শরীর সংস্কারের দিকে মন আদৌ না থাকায় ঐ কালে মস্তকের কেশ বড় হইয়া ধূলা মাটি লাগিয়া আপনা আপনি জটা পাকাইয়া গিয়াছিল। ধ্যান করিতে বসিলে মনের একাগ্রতায় শরীরটা এমন স্থাণুবৎ স্থির হইয়া থাকিত যে পক্ষিসকল জড়পদার্থজ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে মাথার উপর আসিয়া বসিয়া থাকিত এবং কেশমধ্যগত ধূলিরাশি চঞ্চুদ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া তন্মধ্যে তণ্ডুলকণার অন্বেষণ করিত! আবার সময়ে সময়ে ভগবদ্বিরহে অধীর হইয়া ভূমিতে এমন মুখঘর্ষণ করিতাম যে কাটিয়া যাইয়া স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইত! ঐরূপে ধ্যান, ভজন, প্রার্থনা, আত্মনিবেদনাদিতে সমস্ত দিন যে কোথা দিয়া এসময়ে চলিয়া যাইত তাহার হুঁসই থাকিত না! পরে সন্ধ্যাসমাগমে যখন চারিদিকে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি হইতে থাকিত তখন মনে পড়িত—দিবা অবসান হইল, আর একটা দিন বৃথা চলিয়া গেল, মার দেখা পাইলাম না! তখন তীব্র আক্ষেপ আসিয়া প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে, আর স্থির থাকিতে পারিতাম না; আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া 'মা, এখনও দেখা দিলি না' বলিয়া চীৎকার ক্রন্দনে দিক্ পূর্ণ করিতাম ও যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতাম। লোকে বলিত, 'পেটে শূল ব্যথা ধরিয়াছে তাই অত কাঁদিতেছে'।" আমরা যখন ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছি তখন সময়ে সময়ে তিনি আমাদিগকে ঈশ্বরের জন্য প্রাণে তীব্র ব্যাকুলতার প্রয়োজন বুঝাইতে সাধনকালের পূর্ব্বোক্ত কথাসকল শুনাইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেন—"লোকে পত্নী পুত্রাদির মৃত্যুতে বা বিষয় হারাইয়া ঘটী ঘটী চোখের জল ফেলে; কিন্তু ঈশ্বর লাভ হইল না বলিয়া কে আর ঐরূপ করে বল? অথচ

বলে, 'তাঁহাকে এত ডাকিলাম, তত্রাচ তিনি দর্শন দিলেন না!' ঈশ্বরের জন্য ঐরূপ ব্যাকুলভাবে একবার ক্রন্দন করুক্ দেখি, কেমন না তিনি দর্শন দেন।" কথাগুলি আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করিত; শুনিলেই বুঝা যাইত, তিনি নিজ পূর্ব্বজীবনে ঐকথা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়াই অত নিঃসংশয়ে উহা এখন বলিতে পারিতেছেন।

মহাবীরের পদানুগ হইয়া ঠাকুরের দাস্য ভক্তি সাধনা।

আবার সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর ৺জদম্বার দর্শন মাত্র করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ভাবমুখে শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শন লাভের পর নিজ কুলদেবতা ৺রঘুবীরের দিকে তাঁহার চিত্ত স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হইয়াছিল। মহাবীর হনুমানের ন্যায় ভক্তি-সহায়ে শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ সম্ভবপর বুঝিয়া দাস্য ভক্তিতে সিদ্ধ হইবার জন্য তখন তিনি আপনাতে মহাবীরের ভাবারোপ করিয়া কিছু দিনের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, ঐ সময়ে তিনি নিরন্তর মহাবীরের চিন্তা করিতে করিতে এতদূর তন্ময় হইয়া যান যে, আপনার পৃথক অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের কথা কিছুকালের জন্য একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বলিতেন, "এ সময়ে আহার বিহারাদি সকল কার্য্য হনুমানের ন্যায় করিতে হইত।—ইচ্ছা করিয়া যে করিতাম তাহা নহে, আপনা আপনিই ঐরূপ হইয়া পড়িত। পরিবার কাপড়খানাকে লেজের মত করিয়া কোমরে জড়াইয়া বাঁধিতাম, উল্লম্ফনে চলিতাম, ফলমূলাদি ভিন্ন অপর কিছুই খাইতাম না—তাহাও আবার খোষা ফেলিয়া খাইতে প্রবৃত্তি হইত না, বৃক্ষের উপরেই অনেক সময় অতিবাহিত করিতাম, এবং নিরন্তর 'রঘুবীর, রঘুবীর' বলিয়া গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিতাম। চক্ষুদ্বয় তখন ঐ জাতীয় পশুর ন্যায় সর্ব্বদা

চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং আশ্চর্যের বিষয়, মেরুদণ্ডের শেষ ভাগটা ঐ সময়ে প্রায় এক ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছিল।"* শেষোক্ত কথাটী শুনিয়া, আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মহাশয় আপনার শরীরের ঐ অংশ কি এখনও ঐরূপ আছে?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "না; মনের উপর হইতে ঐ ভাবের প্রভুত্ব চলিয়া যাইবার পরে কালে উহা ধীরে ধীরে পূর্ব্বের ন্যায় স্বভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে।"

দাস্যভক্তি সাধনকালে শ্রীশ্রীসীতাদেবীর দর্শন-লাভ বিবরণ।

দাস্যভক্তি সাধনকালে ঠাকুরের জীবনে এক অভূতপূর্ব্ব দর্শন ও অনুভব আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ দর্শন ও অনুভব তাঁহার ইতিপূর্ব্বের দর্শন প্রত্যক্ষাদি হইতে এত নূতন ধরণের ছিল যে, উহা তাঁহার মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া স্মৃতিতে সর্ব্বদাই জাগরুক ছিল। তিনি বলিতেন, "এইকালে পঞ্চবটীতলে একদিন বসিয়া আছি—তখন ধ্যানচিন্তা কিছু যে করিতেছিলাম তাহা নহে, অমনি বসিয়া ছিলাম—এমন সময়ে নিরুপমা জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া স্থানটীকে আলোকিত করিয়া তুলিল। ঐ মূর্ত্তিটিকেই তখন যে কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম তাহা নহে, পঞ্চবটীর গাছ, পালা, গঙ্গা ইত্যাদি সকল পদার্থই দেখিতে পাইতেছিলাম। দেখিলাম, মুর্ত্তিটি মানবীর, কারণ ত্রিনয়নাদি দেবীলক্ষণ তাহাতে নাই। কিন্তু প্রেম-দুঃখ-করুণা-সহিষ্ণুতাপূর্ণ সেই মুখের ন্যায় অপূর্ব্ব ওজস্বী গম্ভীরভাব দেবীমূর্ত্তিসকলেও সচরাচর দেখা যায় না! দেখিলাম, প্রসন্নদৃষ্টিতে আমার দিকে দেখিতে দেখিতে ঐ দেবী-মানবী ধীর মন্থরপদে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে, আমার

* Enlargement of the Coccyx.

দিকে অগ্রসর হইতেছেন! স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছি, 'কে ইনি?' এমন সময়ে একটা হনুমান কোথা হইতে সহসা উ-উপ শব্দ করিয়া তাহার পদপ্রান্তে আসিয়া উপবিষ্ট হইল এবং মনের ভিতরে কে বলিয়া উঠিল 'সীতা, জনম-দুঃখিনী সীতা, জনকরাজনন্দিনী সীতা, রামময়জীবিতা সীতা!' তখন 'মা', 'মা' বলিয়া অধীর হইয়া পদে নিপতিত হইতে যাইতেছি এমন সময় তিনি চকিতের ন্যায় আসিয়া (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন!—আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেলাম। ধ্যানচিন্তাদি কিছু না করিয়া এমনভাবে কোন দর্শন ইতি পূর্ব্বে আর হয় নাই; ইহাই ঐরূপ ভাবের প্রথম দর্শন। জনম-দুঃখিনী সীতাকে ঐরূপে সর্ব্বাগ্রে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার ন্যায় আজন্ম দুঃখভোগ করিতেছি!"

ঠাকুরের স্বহস্তে পঞ্চবটী রোপণ।

তপস্যার উপযুক্ত পবিত্র ভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ঠাকুর এই সময়ে হৃদয়ের নিকট নূতন একটী পঞ্চবটী* স্থাপনের বাসনা প্রকাশ করেন। হৃদয় বলিত, "পঞ্চবটীর নিকটবর্ত্তী হাঁসপুকুর নামক ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটী তখন ঝালান হইয়াছে এবং

* অশ্বত্থ বিল্ববৃক্ষঞ্চ বটধাত্রী অশোককম্।
বটীপঞ্চকমিত্যুক্তং স্থাপয়েৎ পঞ্চদিক্ষু চ॥
অশ্বত্থং স্থাপয়েৎ প্রাচি বিল্বমুত্তরভাগতঃ।
বটং পশ্চিমভাগেতু ধাত্রীং দক্ষিণতঃস্তথা॥
অশোকং বহ্নিদিক্‌স্থাপ্যং তপস্যার্থং সুরেশ্বরি।
মধ্যে বেদীং চতুর্হস্তাং সুন্দরীং সুমনোহরাম্॥

ইতি—স্কন্দপুরাণ।

পুরাতন পঞ্চবটীর নিকটস্থ নিম্ন জমিখণ্ড ঐ মাটিতে ভরাট করিয়া সমতল করান হওয়ায় ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে যে আমলকী বৃক্ষের নিম্নে ধ্যান করিতেন তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।” তখন, এখন যেখানে সাধনকুটীর আছে তাহারই পশ্চিমে ঠাকুর স্বহস্তে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিয়া হৃদয়কে দিয়া বক, অশোক, বেল ও আমলকী বৃক্ষের চারা রোপণ করাইলেন এবং অনেকগুলি তুলসী ও অপরাজিতার চারা পুতিয়া সমগ্র স্থানটীকে বেষ্টন করাইয়া লইলেন। গরু ছাগলের হস্ত হইতে ঐ সকল চারা গাছগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য যে অদ্ভুত উপায়ে ঠাকুর 'ভর্ত্তাভারী' নামক ঠাকুরবাটীর উদ্যানের জনৈক মালীর সাহায্যে ঐ স্থানে বেড়া লাগাইয়াছিলেন তাহা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি।* ঠাকুরের যত্ন এবং নিয়মিত জলসিঞ্চনে তুলসী ও অপরাজিতা গাছগুলি অতি শীঘ্রই এত বড় ও নিবিড় হইয়া উঠে যে, উহার ভিতরে বসিয়া যখন তিনি ধ্যান করিতেন তখন ঐ স্থানের বাহিরের ব্যক্তিরা তাঁহাকে কিছুমাত্র দেখিতে পাইত না।

রাণী রাসমণির কালীবাটী প্রতিষ্ঠার কথা জানাজানি হইবার পর হইতে গঙ্গাসাগর ও ৺জগন্নাথ দর্শন প্রয়াসী পথিক সাধু-কুল, ঐ তীর্থদ্বয়ে যাইবার ও সেখান হইতে আসিবার কালে, কয়েকদিনের জন্য শ্রদ্ধাসম্পন্না রাণীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে বিশ্রাম করিয়া যাইতে আরম্ভ করেন।† ঠাকুর বলিতেন, ঐরূপে ঐ কাল হইতে বিশিষ্ট সাধক ও অনেক সিদ্ধপুরুষেরা এখানে পদার্পণ করিতেন। ইহাদিগের কাহারও নিকট হইতে উপদিষ্ট হইয়া ঠাকুর এইকালে প্রাণায়ামাদি

ঠাকুরের হঠযোগ অভ্যাস।

* গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ, ৭৭ পৃষ্ঠা। † গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ৪৬ পৃষ্ঠা।

হট্‌যোগের ক্রিয়াসকল অভ্যাস করিতেন বলিয়া বোধ হয়। নিম্নলিখিত হলধারী-সম্পর্কীয় ঘটনাটী বলিতে বলিতে একদিন তিনি আমাদিগকে ঐ বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। ঐরূপে হট-যোগোক্ত ক্রিয়াসকল স্বয়ং অভ্যাস ও উহাদিগের ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি পরজীবনে আমাদিগকে ঐ সকল অভ্যাস করিতে নিষেধ করিতেন। আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐ বিষয়ে উপদেশ লাভের জন্য কখন কখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উত্তর পাইয়াছে—"ও সকল সাধন একালের পক্ষে নয়! কলিতে জীব অল্পায়ু ও অন্নগতপ্রাণ; এখন হটযোগ অভ্যাস করিয়া শরীর দৃঢ় করিয়া লইয়া রাজযোগ অভ্যাস করিবে, ঈশ্বরকে ডাকিবে তাহার সময় কোথায়? আবার হটযোগের ঐ সকল ক্রিয়া অভ্যাস করিতে হইলে ঐ বিষয়ে সিদ্ধ গুরুর সঙ্গে নিরন্তর থাকিয়া আহার বিহারাদি সকল বিষয়ে তাঁহার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া অনেক কাল পর্য্যন্ত বিশেষ কঠোর নিয়মে চলিতে হয়; নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রমে শরীরে ব্যাধি উপস্থিত হয় এবং অনেক সময়ে সাধকের মৃত্যুও হইয়া থাকে। সেজন্য ঐসকল করিবার আবশ্যকতা নাই। আর এক কথা, মন নিরোধের জন্যই ত প্রাণায়াম ও কুম্ভকাদি করিয়া বায়ু নিরোধ করা? ঈশ্বরের ভক্তিসংযুক্ত ধ্যানে মন ও বায়ু উভয়ই আপনা আপনি নিরুদ্ধ হইয়া আসিবে, দেখিতে পাইবে। কলিতে জীব অল্পায়ু ও অল্পশক্তি বলিয়াই ভগবান কৃপা করিয়া তাহার জন্য ঈশ্বর-লাভের পথ এত সুগম করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রী পুত্রের বিয়োগে প্রাণে যেরূপ ব্যাকুলতা ও অভাববোধ আসে, ঈশ্বরের জন্য সেই-রূপ ব্যাকুলতা চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র কাহারও প্রাণে স্থায়ী হইলে একালে তিনি তাহাকে দেখা দিবেনই দিবেন।"

হলধারীর অভিশাপ।

লীলাপ্রসঙ্গের অন্যত্র এক স্থলে আমরা পাঠককে বলিয়াছি যে, বর্ত্তমানকালে ভারতে স্মৃত্যনুসারী সাধক ভক্তেরা প্রায়ই অনুষ্ঠানে তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত ঐরূপ ব্যক্তিরা প্রায়ই পরকীয়া প্রেমসাধনরূপ পথে ধাবিত হন।* হলধারী সুপণ্ডিত বৈষ্ণব ও নিষ্ঠাচারী ছিলেন একথাও আমরা পাঠককে ইতি-পূর্ব্বে বলিয়াছি; দক্ষিণেশ্বরে ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজায় কিছু কাল নিযুক্ত হইবার পরে তিনিও গোপনে পূর্ব্বোক্ত-সাধনপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ক্রমে লোকে সে কথা জানিতে পারিয়া কাণাকাণি করিতে থাকে; কিন্তু হলধারী বাক্‌সিদ্ধ অর্থাৎ যাহাকে যাহা বলিবে তাহাই হইবে, এইরূপ একটা প্রসিদ্ধি থাকায় তাঁহার কোপে পড়িবার আশঙ্কায় কেহই ঐ কথা লইয়া তাঁহার সম্মুখে আলোচনা বা হাস্য-পরিহাসাদি করিতে সাহসী হইত না। ঠাকুর ক্রমে অগ্রজের ঐরূপ আচরণের কথা লোকমুখে জানিতে পারিলেন। স্পষ্টবক্তা নির্ভীক ঠাকুর তখন লোকে ঐ কথা জল্পনা করিয়া ভিতরে ভিতরে তাঁহার নিন্দাবাদ করিতেছে দেখিয়া হলধারীকে সকল কথা খুলিয়া বলি-লেন। হলধারী তাহাতে সাতিশয় রুষ্ট হইয়া বলিলেন—"কনিষ্ঠ হইয়া তুই আমাকে এইরূপে অবজ্ঞা করিলি? তোর মুখ দিয়া রক্ত উঠিবে।" ঠাকুর তাঁহাকে ঐ বিষয় বলিবার কারণ বুঝাইয়া নানারূপে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলেও তিনি সে সময়ে উহার কোন কথা শ্রবণ করিলেন না।

ঐ ঘটনার কিছুকাল পরে এক দিন রাত্রি ৮৷৯টা আন্দাজ

---

* গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ৩২ পৃষ্ঠা।

সময়ে ঠাকুরের তালুদেশ সহসা সাতিশয় সড়্ সড়্ করিয়া মুখ দিয়া সত্য সত্যই রক্ত বাহির হইতে লাগিল! ঠাকুর বলিতেন—"সিম্ পাতার রসের মত তার মিস্ কাল রং—এত গাঢ় যে কতক বাহিরে পড়িতে লাগিল এবং কতক মুখের ভিতরে জমিয়া গিয়া সন্মুখের দাঁতের অগ্রভাগ হইতে বটের জটের মত ঝুলিতে লাগিল! মুখের ভিতর কাপড় দিয়া চাপিয়া ধরিয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তথাপি থামিল না! দেখিয়া বড় ভয় হইল। সংবাদ পাইয়া সকলে ছুটিয়া আসিল। হলধারী তখন মন্দিরে সেবার কাজ সারিতেছিল; ঐ সংবাদে সেও ভয় পাইয়া শশব্যস্তে আসিয়া পড়িল। তাকে দেখিয়া সজলনয়নে বলিলাম, 'দাদা, শাপ দিয়া তুমি আমার এ কি অবস্থা কর্‌লে, দেখ দেখি?' আমার কাতরতা দেখিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল।"

উক্ত অভিশাপ কিরূপে সফল হইয়াছিল।

"ঠাকুরবাড়ীতে সে দিন একজন ভাল সাধু আসিয়াছিলেন। গোলমাল শুনিয়া তিনি ঐ সময়ে আসিয়া পড়িলেন এবং রক্তের রং ও মুখের ভিতরে যে স্থানটা হইতে উহা নির্গত হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিলেন—'ভয় নাই, রক্ত বাহির হইয়া বড় ভালই হইয়াছে। দেখিতেছি, তুমি যোগসাধনা করিতে। ঐ সাধনাপ্রভাবে তোমার সুষুম্নাদ্বার খুলিয়া যাইয়া শরীরের রক্ত মাথায় উঠিতেছিল। মাথায় না উঠিয়া উহা যে এইরূপে মুখের ভিতরে একটা নির্গত হইবার পথ আপনা আপনি করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল ইহাতে বড়ই ভাল হইল। ঐ রক্ত মাথায় উঠিলে তোমার জড়সমাধি হইত এবং ঐ সমাধি আর কিছুতেই ভাঙ্গিত না। তোমার শরীরটার দ্বারা ৺জগন্মাতার বিশেষ কোন কার্য্য আছে; তাই উহাকে এইরূপে রক্ষা করিলেন,

বোধ হইতেছে। সাধুর ঐ কথা শুনিয়া যেন প্রাণ পাইলাম।” ঠাকুরের সম্বন্ধে হলধারীর শাপ ঐরূপে কাকতালীয়ের ন্যায়ে সফলতা দেখাইয়া বরে পরিণত হইয়াছিল।

হলধারীর সহিত ঠাকুরের আচরণে বেশ একটা মধুর রহস্যের ভাব ছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি হলধারী ঠাকুরের খুল্লতাত-পুত্র ও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আন্দাজ ১২৬৫ সালে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া তিনি ৺রাধা-গোবিন্দজীর পূজাকার্য্যে ব্রতী হন, এবং ১২৭২ সালের কিছুকাল পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য সম্পন্ন করেন। অতএব ঠাকুরের সাধনকালের দ্বিতীয় চারিবৎসর এবং তাহার পরেও দুই বৎসরের অধিক কাল দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া তিনি ঠাকুরকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তত্রাচ তিনি ঠাকুরের উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা স্থির ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। হলধারী নিষ্ঠাচারী ছিলেন; সুতরাং ভাবাবেশে ঠাকুরের পরিধানের কাপড়, পৈতা প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়াটা তাঁহার ভাল লাগিত না। ভাবিতেন, কনিষ্ঠ যথেচ্ছাচারী অথবা পাগল হইয়াছে। হৃদয় বলিত—“তিনি কখন কখন আমাকে বলিয়াও ফেলিয়াছেন, ‘হৃদু, উনি কাপড় ফেলিয়া দেন, পৈতা ফেলিয়া দেন, এটা বড় দোষের কথা; কত জন্মের পুণ্যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হয়, উনি কি না সেই ব্রাহ্মণত্বকে সামান্য জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণাভিমান ত্যাগ করিতে চান? এমন কি উচ্চাবস্থা হইয়াছে যাহাতে উনি ঐরূপ করিতে পারেন? হৃদু, উনি তোমারই কথা যাহা একটু শুনেন, তোমার উচিৎ যাহাতে উনি ঐরূপ না করিতে পারেন তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা; এমন কি বাঁধিয়া রাখিয়াও উঁহাকে

ঠাকুরের সম্বন্ধে হলধারীর ধারণার পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনের কথা।

যদি তুমি ঐরূপ কার্য্য হইতে নিরস্ত করিতে পার, তাহাও করা উচিত'।"

আবার পূজা করিতে করিতে ঠাকুরের নয়নে প্রেমধারা, ভগবদ্‌গুণশ্রবণে অদ্ভুত উল্লাস ও ভগবদ্দর্শনলাভের জন্য অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ব্যাকুলতা প্রভৃতি দেখিয়া তিনি মোহিত হইয়া ভাবিতেন, নিশ্চয়ই কনিষ্ঠের ঐসকল অবস্থা ঐশ্বরিক আবেশে হইয়া থাকে, নতুবা মানুষের কখন ত ঐরূপ হইতে দেখা যায় না! দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া হলধারী কখন কখন আবার হৃদয়কে বলিতেন, 'হৃদয়, তুমি নিশ্চয় উঁহার ভিতর হইতে কোনরূপ আশ্চর্য্য দর্শন পাইয়াছ, নতুবা এত করিয়া উঁহার কখন সেবা করিতে না।"

ঐরূপে হলধারীর মন সর্ব্বদা সন্দেহে দোলায়মান থাকিয়া ঠাকুরের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একটা স্থির মীমাংসায় কিছুতেই উপনীত হইতে পারিত না। ঠাকুর বলিতেন, "হলধারী মন্দিরে পূজাদি কালে তাঁহাকে দেখিয়া মোহিত হইয়া কতদিন বলিয়াছে, 'রামকৃষ্ণ, এইবার আমি তোকে চিনিয়াছি।' তাহাতে কখন কখন আমি রহস্য করিয়া বলিতাম, 'দেখো আবার যেন গোলমাল হয়ে যায় না!' সে বলিত, এবার আর তোর ফাঁকি দিবার যো নাই; তোতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরীয় আবেশ আছে; এবার একেবারে ঠিক ঠাক বুঝিয়াছি।' শুনিয়া বলিতাম, 'আচ্ছা দেখা যাবে।' অনন্তর মন্দিরের দেবসেবা সম্পূর্ণ করিয়া হলধারী এক টিপ নস্য লইয়া শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা বা অধ্যাত্ম রামায়ণাদিশাস্ত্রবিচার করিতে বসিয়াই অভিমানে একবারে অন্য এক লোক হইয়া যাইত। তখন আমি সেখানে উপস্থিত

নস্য লইয়া শাস্ত্র বিচার করিতে বসিয়াই হলধারীর উচ্চ ধারণার লোপ।

হইয়া বলিতাম, 'তুমি শাস্ত্রে যা যা পোড়েছ সে সব অবস্থা আমার উপলব্ধি হয়েছে, আমি ওসব কথা বুঝ্‌তে পারি।' শুনিয়াই হলধারী বলিয়া উঠিত, 'হাঁ; তুই গণ্ডমূর্খ, তুই আবার এ সব কথা বুঝ্‌বি!' আমি বলিতাম (নিজের শরীর দেখাইয়া) 'সত্য বল্‌ছি, এর ভিতরে যে আছে সে সকল কথা বুঝিয়ে দেয়। এই যে তুমি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে বোল্‌লে ইহার ভিতর ঈশ্বরীয় আবেশ আছে—সেই-ই সকল কথা বুঝিয়ে দেয়।' হলধারী ঐকথা শুনিয়া গরম হইয়া বলিত—'যাঃ যাঃ মূর্খ কোথাকার, কলিতে কল্কি ছাড়া আবার ঈশ্বরের অবতার হবার কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে? তুই উন্মাদ হইয়াছিস্ তাই ঐরূপ ভাবিস্।' হাসিয়া বলিতাম—'এই যে বলেছিলে আর গোল হবে না;'—কিন্তু সে কথা তখন শোনে কে? এইরূপ এক আধ দিন নয় অনেক দিন হইয়াছিল! পরে একদিন সে দেখিতে পাইল, উলঙ্গ হইয়া পঞ্চবটীর বটবৃক্ষের ডালে বসিয়া মূত্র ত্যাগ করিতেছি—সেই দিন হইতে সে একেবারে পাকা করিল (স্থির নিশ্চয় করিল) আমাকে ব্রহ্মদৈত্যে পাইয়াছে!"

৺কালীকে তমোগুণময়ী বলায় ঠাকুরের হলধারীকে শিক্ষাদান।

বৈষ্ণব হলধারীর শিশুপুত্রের মৃত্যুর কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ঐদিন হইতে তিনি ৺কালীমূর্ত্তিকে তমোগুণময়ী বা তামসী বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। একদিন ঠাকুরকে ঐকথা বলিয়াও ফেলেন, "তামসী মূর্ত্তির উপাসনায় কখন আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে কি? তুমি কেন অত করিয়া ঐ দেবীর আরাধনা কর?" ঠাকুর ঐ কথা শুনিয়া তখন তাহাকে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ইষ্টনিন্দাশ্রবণে তাঁহার

অন্তর ব্যথিত হইল। অনন্তর কালীমন্দিরে যাইয়া সজল নয়নে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “মা, হলধারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—সে তোকে তমোগুণময়ী বলে; তুই কি সত্যই ঐরূপ?” অনন্তর ৺জগদম্বার মুখে ঐ বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিয়া ঠাকুর উল্লাসে উৎসাহিত হইয়া হলধারীর নিকট ছুটিয়া যাইলেন এবং একেবারে তাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া উত্তেজিত স্বরে বারম্বার বলিতে লাগিলেন—‘তুই মাকে তামসী বলিস্? মা কি তামসী? মা যে সব—ত্রিগুণময়ী, আবার শুদ্ধ সত্ত্বগুণময়ী!’ ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐরূপ কথায় ও স্পর্শে হলধারীর তখন যেন অন্তরের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল! তিনি তখন পূজার আসনে বসিয়াছিলেন—ঠাকুরের ঐকথা অন্তরের সহিত স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার ভিতর সাক্ষাৎ জগদম্বার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া সম্মুখস্থ ফুলচন্দনাদি লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তিভরে অঞ্জলি প্রদান করিলেন! উহার কিছুক্ষণ পরে হৃদয় আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘মামা, এই তুমি বল, রামকৃষ্ণকে ভূতে পাইয়াছে, তবে আবার তাঁহাকে ঐরূপে পূজা করিলে যে?’ হলধারী বলিলেন “কি জানি হৃদু, কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে আমাকে কি যে একরকম করিয়া দিল, আমি সব ভুলিয়া তার ভিতর সাক্ষাৎ ঈশ্বর-প্রকাশ দেখিতে পাইলাম! কালী মন্দিরে যখনই আমি রামকৃষ্ণের কাছে যাই তখনই আমাকে ঐরূপ করিয়া দেয়! এ এক চমৎকার ব্যাপার—কিছু বুঝিতে পারি না।”

ঐরূপে হলধারী, ঠাকুরের ভিতর বারম্বার দৈব প্রকাশ দেখিতে পাইলেও নস্য লইয়া শাস্ত্রবিচার করিতে বসিলেই

পাণ্ডিত্যাভিমানে মত্ত হইয়া 'পুনর্মূষিকত্ব' প্রাপ্ত হইতেন।

কাঙ্গালীদিগের পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে দেখিয়া হলধারীর ঠাকুরকে ভৎর্সনা ও ঠাকুরের উত্তর।

কামকাঞ্চনে আসক্তি দূর না হইলে বাহ্যশৌচাচার এবং শাস্ত্রজ্ঞান যে, বিশেষ কোন কাজে লাগে না এবং মানবকে সত্য তত্ত্বের ধারণা করাইতে পারে না, হলধারীর পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার হইতে একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর বাড়ীতে প্রসাদ পাইতে সমাগত কাঙ্গালীদিগকে নারায়ণজ্ঞানে ঠাকুর এক সময়ে তাহাদের পাত্রাবশেষ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন—একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হলধারী উহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, 'তোর ছেলে মেয়ের কেমন করিয়া বিবাহ হয় তাহা দেখিব!' ঠাকুর বেদান্তজ্ঞানাভিমানী হলধারীর মুখে ঐরূপ কথা শুনিয়া ক্ষোভে ক্রোধে অধীর হইয়া বলিয়াছিলেন, "তবে রে শালা, তুই না বলিস্, শাস্ত্রে বলেছে জগৎ মিথ্যা ও সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি কর্‌তে হয়? তুই বুঝি ভাবিস্ আমি তোর মত জগৎ মিথ্যা বল্‌বো অথচ ছেলে মেয়েও হবে! ধিক্ তোর শাস্ত্রজ্ঞানে!"

হলধারীর পাণ্ডিত্যে ঠাকুরের মনে সন্দেহের উদয় ও শ্রীশ্রীজগদম্বার পুনর্দ্দর্শন ও প্রত্যাদেশ লাভ—'ভাবমুখে থাক্।'

বালকস্বভাব ঠাকুর আবার, কখন কখন হলধারীর পাণ্ডিত্যে ভুলিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে শ্রীশ্রীজগন্মাতার মতামত গ্রহণ করিতে ছুটিতেন! আমরা শুনিয়াছি, ভাবসহায়ে ঐশ্বরিক স্বরূপ সম্বন্ধে যে সকল অনুভূতি হয় সে সকলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া এবং ঈশ্বরকে ভাবাভাবের অতীত বলিয়া শাস্ত্রসহায়ে নির্দ্দেশ করিয়া হলধারী ঠাকুরের মনে একদিন বিষম সন্দেহের উদয় করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ভাবিলাম, তবে তো ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্বরীয় রূপ দেখি-

য়াছি, কথা শুনিয়াছি সে সমস্তই ভুল; মা তো তবে আমায় ফাঁকি দিয়াছে! মন বড়ই ব্যাকুল হইল এবং অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে বলিতে লাগিলাম—মা নিরক্ষর মূখ্খু বলে আমাকে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয়—সে কান্নার তোড় (বেগ) আর তখন থামে না! কুঠির ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি কি, সহসা মেজে হইতে কুয়াসার মত ধোঁয়া উঠিয়া সামনের কতকটা স্থান পূর্ণ হইয়া গেল! তার পর দেখি তাহার ভিতরে আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রু একখানি গৌরবর্ণ জীবন্ত সৌম্য মুখ! ঐ মূর্ত্তি আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'ওরে, তুই ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্!'—তিনবার মাত্র ঐকথাগুলি বলিয়াই ঐমূর্ত্তি ধীরে ধীরে আবার ঐ কুয়াসায় গলিয়া গেল এবং ঐ কুয়াসার মত ধূমও কোথায় অন্তর্হিত হইল! ঐরূপ দেখিয়া তবে সেবার শান্ত হইলাম।" ঘটনাটী ঠাকুর একদিন স্বামী প্রেমানন্দকে স্বমুখে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, হলধারীর কথায় ঐ সন্দেহ আর একবার মনে উঠিয়াছিল; "সেবার পূজা করিতে বসিয়া মাকে ঐ বিষয়ের মীমাংসার জন্য কাঁদিয়া ধরিয়াছিলাম; মা ঐ সময়ে 'রতির মা' নাম্নী একটী স্ত্রীলোকের বেশে ঘটের পার্শ্বে আবির্ভূতা হইয়া বলিয়াছিলেন, 'তুই ভাবমুখেই থাক্!' আবার পরিব্রাজকাচার্য্য তোতাপুরী গোস্বামী বেদান্তজ্ঞান উপদেশ করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যাইবার পর ঠাকুর যখন ছয় মাস কাল ধরিয়া নিরন্তর নির্ব্বিকল্প ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন তখনও ঐকালের অন্তে শ্রীশ্রীজগদম্বার অশরীরী বাণী প্রাণে প্রাণে শুনিতে পাইয়াছিলেন—'তুই ভাবমুখে থাক্!'

হলধারী কালীবাটীতে কতকাল ছিলেন।

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে হলধারী প্রায় সাত বৎসর বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং পিশাচবৎ আচারবান পূর্ণজ্ঞানী সাধু, ব্রাহ্মণী, জটাধারী নামক রামায়েৎ সাধু ও শ্রীমৎ তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে পর পর আগমন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনা গিয়াছে, তিনি শ্রীমৎ তোতাপুরীর সহিত একত্রে বসিয়া কখন কখন অধ্যাত্ম রামায়ণাদি শাস্ত্র পাঠও করিতেন। হলধারী সংক্রান্ত পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি তাঁহার দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে থাকিবার কালে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। বলিবার সুবিধার জন্যই আমরা ঐসকল এখানে পাঠককে একত্রে বলিয়া লইলাম।

ঠাকুরের দিব্যোন্মাদাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা।

ঠাকুরের সাধক-জীবনের কথা আমরা যতদূর আলোচনা করিলাম তাহাতে একথা নিঃসংশয় বুঝা যায় যে, কালীবাটীর জনসাধারণের নয়নে তিনি এখন উন্মত্ত বলিয়া পরিগণিত হইলেও মস্তিষ্কের বিকার বা ব্যাধিপ্রসূত সাধারণ উন্মাদাবস্থা তাঁহার উপস্থিত হয় নাই। ঈশ্বর দর্শনের জন্য তাঁহার অন্তরে সাতিশয় তীব্র ব্যাকুলতার উদয় হইয়াছিল। ঐ ব্যাকুলতার প্রবল বেগে তিনি ঐকালে আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না। ঈশ্বরলাভের জন্য অগ্নিময় ব্যাকুলতা হৃদয়ে নিরন্তর ধারণ করিয়া সাধারণের সহিত সাধারণ বিষয় লইয়া তিনি হাসিতে কাঁদিতে সক্ষম হইতেছিলেন না বলিয়াই লোকে বলিতেছিল, তিনি উন্মাদ হইয়াছেন। কেই বা ঐরূপ করিতে পারে? হৃদয়ের যাতনা যখন কোন বিষয় লইয়া আমাদিগের স্বাভাবিক সহ্যগুণকে অতিক্রম করিয়া যায়, তখন কেহই আপনাকে সামলাইয়া মুখে

একখানা ভিতরে একখানা রাখিয়া কামকাঞ্চনোন্মত্ত সংসারের সহিত একযোগে চলিতে পারে না! বলিতে পার, সহ্যগুণের সীমা কিন্তু সকলের পক্ষে এক নহে, কেহ অল্প সুখদুঃখেই বিচলিত হইয়া পড়ে, আবার কেহবা তদুভয়ের গভীর বেগ হৃদয়ে ধরিয়াও সমুদ্রবৎ অচল অটল থাকে; অতএব ঠাকুরের সহ্যগুণের সীমার পরিমাণটা বুঝিব কিরূপে? উত্তরে বলি, তাঁহার জীবনের অন্যান্য ঘটনাবলীর অনুধাবন করিলেই উহা যে অসাধারণ ছিল একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে; দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল অর্দ্ধাশন, অনশন ও অনিদ্রায় থাকিয়াও যিনি স্থির থাকিতে পারেন, বারম্বার অতুল সম্পত্তি পদে আসিয়া পড়িলে ঈশ্বরলাভের পথে অন্তরায় বলিয়া যিনি উহা ততোধিকবার প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন—ঐরূপ কত কথাই না বলিতে পারা যায়—তাঁহার শরীর ও মনের অসাধারণ ধৈর্য্যের কথা কি আবার বলিতে হইবে?

অজ্ঞ ব্যক্তিরাই ঐ অবস্থাকে ব্যাধিজনিত ভাবিয়াছিল, সাধকেরা নহে।

আবার, এই কালের অনুধাবনে দেখা যায় যে, ঘোর বিষয়াবদ্ধ জীবের চক্ষেই তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অবস্থা ব্যাধিজনিত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল! দেখা যায়, মথুরানাথকে ছাড়িয়া দিলে, কল্পনাযুক্তি-সহায়ে তাঁহার মানসিক অবস্থার বিষয় আংশিকভাবেও নির্দ্ধারণ করিতে পারে এমন কোন লোক ঐ কালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত ছিল না। শ্রীযুত কেনারাম ভট্ট ঠাকুরকে দীক্ষা দিয়াই কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, বলিতে পারি না; কারণ ঐ ঘটনার পরে তাঁহার কথা হৃদয় বা অন্য কাহারও মুখে আর শুনিতে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ঠাকুরের ঐ কালের ক্রিয়াকলাপ ও মানসিক অবস্থার বিষয়ে বিচার করিতে

তখন যে কেবল মাত্র মূর্খ লুব্ধ কালীবাটীর কর্ম্মচারীরাই অবশিষ্ট ছিল একথা বুঝা যায়। তাহাদের কথা প্রমাণের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না। অতএব কালীবাটীতে ঐ কালে সমাগত সাধু-সাধককুলের কথাই যে, ঐ বিষয়ে একমাত্র বিশ্বস্ত প্রমাণ একথা সুনিশ্চিত; এবং ঠাকুরের নিজের ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকটে ঐ বিষয়ে যাহা শুনা গিয়াছে তাহাতে জানা যায় ঐ সকল সাধক ও সিদ্ধেরা তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত স্থির করা দূরে থাকুক, তাঁহার সম্বন্ধে সর্ব্বদা অতি উচ্চ ধারণা করিয়া গিয়াছিলেন।

এই কালের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া ঠাকু-রকে ব্যাধিগ্রস্ত বলা চলে না।

এই কালের পরবর্ত্তী কথাসকলের আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাইব ঈশ্বরলাভের প্রবল ব্যাকুলতায় যতক্ষণ না তিনি এককালে দেহবোধরহিত হইয়া দিগ্-বিদিক্‌শূন্য ও নিজ জীবনে পর্য্যন্ত মমতাবিহীন হইয়া পড়িতেন, ততক্ষণ শারীরিক কল্যাণের জন্য তাঁহাকে যে যাহা করিতে বলিত তাহা তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠান করিতেন। নিজ জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য কখন সচেষ্ট হইতেন না। পাঁচজনে বলিল, তাঁহার চিকিৎসা করান হউক, তাহাতেই সম্মত হইলেন; কামারপুকুরে তাঁহার মাতার নিকট লইয়া যাওয়া হউক, তাহাতেই সম্মত হইলেন; বিবাহ দেওয়া হউক, তাহাতেও অমত করিলেন না!—এরূপাবস্থায় উন্মত্তের কার্য্যকলাপের সহিত তাঁহার আচরণাদির কেমন করিয়া তুলনা করা যাইতে পারে?

আবার দেখিতে পাওয়া যায়, বিষয়ী লোক ও বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপার হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতে যত্নবান্ হইলেও বহুলোক একত্র হইয়া যেখানে কোনভাবে ঈশ্বরের পূজাকীর্ত্তনাদি করিতেছে ঠাকুর ঐ কাল হইতে সেখানে যাইতে ও তাহাদিগের সহিত

যোগদান করিতে কোনরূপ আপত্তি করা দূরে থাকুক, অনেক সময়ে বিশেষ আগ্রহের সহিত উপস্থিত হইতেন। বরাহনগরের ৺দশ-মহাবিদ্যার স্থান দর্শন, কালীঘাটে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে কখন কখন দেখিতে গমন এবং এখন হইতে প্রায় প্রতি বৎসর পানিহাটির মহোৎসবে তাঁহার যোগদান হইতে ঐ কথা বেশ বুঝা যায়। ঐ সকল স্থানেও শাস্ত্রজ্ঞ সাধককুলের সহিত কখন কখন তাঁহার দর্শনসম্ভাষণাদি হইয়াছিল। তদ্বিষয়ে অল্প স্বল্প আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি ঐ সকল সাধকেরা তাঁহাকে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

১২৬৫ সালে পানিহাটির মহোৎসবে বৈষ্ণবচরণের ঠাকুরকে প্রথম দর্শন ও ধারণা।

ঐ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা ঠাকুরের সন ১২৬৫ সালে, ইংরাজী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে, পানিহাটি মহোৎসব-দর্শনে গমন করিবার কথা উল্লেখ করিতে পারি। শ্রীযুত উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র বৈষ্ণবচরণকে তিনি ঐদিন ঐ স্থানেই প্রথম দেখেন। হৃদয়ের নিকটে এবং ঠাকুরের নিজমুখেও আমাদের কেহ কেহ শুনিয়াছেন, ঠাকুর পানিহাটিতে গমন করিয়া ঐ দিন শ্রীযুত মণিমোহন সেনের ঠাকুরবাটীতে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে বৈষ্ণবচরণ তথায় উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে দেখিয়াই আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থাসম্পন্ন অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলিয়া স্থির নিশ্চয় করেন। শ্রীযুত বৈষ্ণবচরণ সেদিন অধিকাংশ কাল উৎসবক্ষেত্রে তাঁহার সঙ্গে অতিবাহিত করেন এবং নিজ ব্যয়ে চিঁড়া, মুড়্‌কি, আম ইত্যাদি ক্রয় করিয়া 'মালসা ভোগের' বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিয়াছিলেন। আবার উৎসবান্তে কলিকাতা ফিরিবার সময় বৈষ্ণবচরণ ঠাকুরের পুনরায় দর্শনলাভের জন্য রাণী রাসমণির কালীবাটীতে নামিয়া তাঁহার

অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ; এবং ঠাকুর তখনও উৎসবক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করেন নাই জানিতে পারিয়া ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার তিন চারি বৎসর পরে বৈষ্ণবচরণ কিরূপে পুনরায় ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, সে সকল কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছি।*

ঠাকুরের এই কালের অন্যান্য সাধন—'টাকা মাটি', 'মাটি টাকা'; অশুচিস্থান পরিষ্কার; চন্দনবিষ্ঠায় সমজ্ঞান।

এই চারিবৎসরের ভিতরেই আবার, ঠাকুর, মন হইতে কাঞ্চনাসক্তি এককালে দূর করিবার জন্য কয়েক খণ্ড মুদ্রা মৃত্তিকার সহিত একত্রে হস্তে গ্রহণ করিয়া সদসদ্বিচারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ; এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্যবস্তু ঈশ্বরকে লাভ করা যে ব্যক্তি নিজ জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছে সে, ঐ বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে মৃত্তিকার ন্যায় কাঞ্চন হইতে বিশেষ কোন সহায়তা লাভ করিতে পারে না, যুক্তিসহায়ে একথা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া মনে ঐ মীমাংসা ধারণার জন্য বারম্বার 'টাকা মাটি,' 'মাটি টাকা' বলিতে বলিতে উহাদিগকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকল বস্তু ও ব্যক্তিই শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ ও অংশ, একথা ধারণার জন্য ঠাকুরবাটীর কাঙ্গালীদের পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ ও তাহাদের ভোজন-স্থান পরিষ্কার করা—মন হইতে অভিমান ও অহঙ্কার এককালে দূর করিবার এবং সকলের ঘৃণার পাত্র অপেক্ষাও তিনি কোন অংশে বড় নহেন একথা ধারণার জন্য মেথরের ন্যায় অশুচি স্থান স্বহস্তে ধৌত করা—ঘৃণা ত্যাগ করিবার এবং চন্দন ও বিষ্ঠা উভয় পদার্থই পঞ্চভূতের বিকারপ্রসূত,

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায়।

অতএব স্বরূপতঃ সমতুল্য, একথা ধারণার জন্য নির্ব্বিকারচিত্তে স্বীয় জিহ্বার দ্বারা অপরের বিষ্ঠা স্পর্শ করা প্রভৃতি যে সকল অশ্রুতপূর্ব্ব সাধনকথা ঠাকুরের সম্বন্ধে শুনিতে পাওয়া যায় তাহাও এই কালেই সাধিত হইয়াছিল। ঠাকুরের প্রথম চারি বৎসরের ঐ সকল সাধন ও দিব্যদর্শনের বিবরণ অনুধাবন করিলে ঈশ্বরলাভের জন্য তাঁহার মনে ঐকালে কি অসাধারণ আকুলাগ্রহ যে, আধিপত্য করিতেছিল এবং কি অলৌকিক বিশ্বাসের সহিত যে, তিনি সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও নিশ্চয় ধারণা হইয়া পড়ে যে, অপর কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য না পাইয়া একমাত্র ব্যাকুলতাসহায়ে তিনি ঐ কালের ভিতরেই শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণ দর্শন লাভ করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন এবং সাধনার ফল করগত করিয়া পরবর্ত্তী কালে তিনি উহা গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের সহিত মিলাইতেই অগ্রসর হইয়াছিলেন!

পরিশেষে নিজ মনই সাধকের গুরু হইয়া দাঁড়ায়। ঠাকুরের মনের এই কালে গুরুবৎ আচরণের দৃষ্টান্ত (১) সূক্ষ্মদেহে কীর্ত্তনানন্দ।

ত্যাগ ও সংযমের অভ্যাস দ্বারা সাধক যখন নিজ ইন্দ্রিয়গ্রাম ও মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া শুদ্ধ ও পবিত্র হয়, ঠাকুর বলিতেন, নিজ মনই তখন তাহার নিকট গুরুস্থানীয় হইয়া দাঁড়ায়; তাহার শুদ্ধ মনে তখন যে সকল ভাবতরঙ্গ উঠিতে থাকে সে সকল, বিপথগামী করা দূরে থাকুক, পথ প্রদর্শন করিয়া তাহাকে গন্তব্য লক্ষ্যে আশু পৌঁছাইয়া দেয়। সাধনার প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুরের শুদ্ধ পবিত্র মন, কেবল যে ঐরূপ হইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কোন্ কার্য্য করিতে হইবে এবং কোন্টী হইতে বিরত থাকিতে হইবে

একথা শিক্ষা দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল তাহা নহে, কিন্তু অনেক সময়ে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পৃথক এক ব্যক্তির ন্যায় দেহমধ্য হইতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সাধনপথে উৎসাহিত করিত, ভয়প্রদর্শন করতঃ সাধনাবিশেষে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিত, অনুষ্ঠানবিশেষ কেন করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিত এবং কখন কখন সাধনার ফলাফলও বিজ্ঞাত করাইয়া দিত! সেইজন্যই ঠাকুর ধ্যান করিতে বসিয়া দেখিয়াছিলেন, শাণিতত্রিশূলধারী জনৈক সন্ন্যাসী, নিজদেহমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া বলিতেছেন, 'অন্য সকল চিন্তা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া ইষ্ট-চিন্তা যদি না করিবি ত এই ত্রিশূল তোর বুকে বসাইয়া দিব!' দেখিয়াছিলেন—ভোগবাসনাময় পাপপুরুষ নিজ শরীরমধ্য হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলে, ঐ সন্ন্যাসী যুবকও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া ঐ পুরুষকে নিহত করিলেন!—দূরস্থ দেবদেবীর মূর্ত্তি বা কীর্ত্তনাদি দর্শনে অভিলাষী হইয়া, তাঁহারই অনুরূপ আকারবিশিষ্ট ঐ সন্ন্যাসী যুবক জ্যোতির্ম্ময় শরীরে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় পথে ঐ সকল স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং দর্শন ও ভজনানন্দ কিয়ৎকাল উপভোগ করিয়া পুনরায় পূর্ব্বোক্ত জ্যোতির্ম্ময় বর্ত্ম অবলম্বন করিয়া স্থূল শরীরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন!—ঐরূপ নানা দর্শনের কথা আমরা ঠাকুরের স্বমুখ হইতে সময়ে সময়ে শ্রবণ করিয়াছি।

(২) নিজ শরীরের ভিতরে যুবক সন্ন্যাসীর দর্শন ও উপদেশ লাভ।

সাধনকালের প্রায় প্রারম্ভ হইতেই শরীরমধ্যগত ঐ যুবক সন্ন্যাসীর দর্শন আরব্ধ হইয়াছিল এবং ক্রমে সকল কার্য্যের বিধি-নিষেধ মীমাংসা স্থলেই ঠাকুর, তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পরামর্শমত চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। সাধকজীবনের ঐ সকল অপূর্ব্ব

দর্শনাদির প্রসঙ্গ করিতে করিতে ঠাকুর একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন,—“ভিতর হইতে, দেখিতে আমারই অনুরূপ, এক যুবক সন্ন্যাসীমূর্ত্তি যখন তখন বাহির হইয়া আমাকে সকল বিষয়ে উপদেশ করিত; সে ঐরূপে বাহির হইলে কখন কিছু কিছু বাহ্যজ্ঞান থাকিত এবং কখন বা বাহ্যজ্ঞান এককালে হারাইয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকিতাম, কেবল তাহারই চেষ্টা ও কথা দেখিতে ও শুনিতে পাইতাম; পরে এই স্থূল দেহটায় সে পুনরায় প্রবেশ করিলে আবারবাহ্যজ্ঞান পূর্ণভাবে আসিত। তাহার মুখ হইতে যাহা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম তাহাই ব্রাহ্মণী, ন্যাঙ্গটা (শ্রীমৎ তোতাপুরী) প্রভৃতি আসিয়া পুনরায় উপদেশ করিয়াছিলেন। যাহা জানিতাম, তাহাই আবার জানাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রগত বিধির মান্য রক্ষা করাইবার জন্যই তাঁহারা গুরুরূপে জীবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নতুবা ন্যাঙ্গটা প্রভৃতিকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার অন্য কোন বিশেষ প্রয়োজন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।”

(৩) সিহড় যাইবার পথে ঠাকুরের দর্শন। উক্ত দর্শন সম্বন্ধে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মীমাংসা।

সাধনার এই কালের শেষভাগে ঠাকুর যখন কামারপুকুরে গিয়াছিলেন তখন আর একটী অপূর্ব্ব দর্শন তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল। কামারপুকুর হইতে শিবিকারোহণে হৃদয়ের বাটী সিহড় গ্রামে যাইতে যাইতে তাঁহার ঐ দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল। সুনীল অম্বরাবৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, পুঞ্জীভূতহরিৎ-শ্যামল ধান্যক্ষেত্রের পর ধান্যক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে শীতলছায়াপ্রদ অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষরাজি দেখিতে দেখিতে প্রফুল্লমনে অগ্রসর হইবার কালে ঠাকুর দেখিলেন, সহসা তাঁহার দেহমধ্য হইতে দুইটী কিশোরবয়স্ক সুন্দর বালকমূর্ত্তি বহির্গত হইয়া কখন ধীরপদে

এবং কখন ক্রীড়াচ্ছলে ছুটাছুটি করিয়া, বন্যপুষ্পাদির অন্বেষণে কখন প্রান্তরমধ্যে বহুদূরে গমন করিয়া আবার কখন বা শিবিকার সন্নিকটে থাকিয়া, বাল-সুলভ হাস্য, পরিহাস, কথোপকথন প্রভৃতি নানা চেষ্টা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপে আনন্দ করিয়া অগ্রসর হইয়া তাহারা পুনরায় তাঁহার দেহমধ্যে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। ঐ দর্শনের প্রায় দেড় বৎসর পরে বিদূষী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে প্রথম আসিয়া উপস্থিত হন এবং ঠাকুরের মুখে ঐ দর্শনের কথা শুনিয়া কিছুমাত্র বিস্মিতা না হইয়া বলেন—'বাবা, তুমি ঠিক্‌ই দেখিয়াছ; এবার যে, নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য যে এবার, একাধারে একসঙ্গে আসিয়াছেন এবং তোমার ভিতরে রহিয়াছেন!' হৃদয়রাম বলিতেন, এই বলিয়াই ব্রাহ্মণী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে নিম্নের কয়েকটী শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

অদ্বৈতের গলা ধরি কহেন বার বার।
পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার।
কীর্ত্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার॥
অদ্যাবধি গৌরলীলা করেন গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

উক্ত দর্শন হইতে যাহা বুঝিতে পারা যায়।

আমরা যখন তাঁহার নিকট যাইতেছি তখন ঐ দর্শনের কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, 'ঐরূপ দেখিয়াছিলাম সত্য। ব্রাহ্মণী তাহা শুনিয়া ঐরূপ বলিয়াছিল একথাও সত্য। কিন্তু উহার যথার্থ অর্থ যে কি, তাহা কেমন করিয়া বলি বল!' ঐ সকল দর্শনের কথা শুনিয়া আমাদের মনে হয়, ঠাকুর এই সময়ে বিশেষ আভাস পাইয়াছিলেন যে, বহুপূর্ব্ব যুগ হইতে পৃথিবীতে পরিচিত

কোন প্রাচীন আত্মাই তাঁহার শরীর মনে আমিত্বাভিমান লইয়া বিশেষ কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অবস্থান করিতেছেন!—মনে হয় ঐ সকল দর্শনাদিসহায়ে তিনি এখন নিজ ব্যক্তিত্বের যে অলৌকিক আভাস পাইতেছিলেন, তাহাই কালে সুস্পষ্ট হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল—যিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য অযোধ্যা ও শ্রীবৃন্দাবনে জানকীবল্লভ শ্রীরামচন্দ্র ও রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্ররূপে উদিত হইয়াছিলেন, তিনিই এখন পুনরায় ভারত ও জগৎকে নবীন ধর্ম্মাদর্শদানের জন্য নব শরীর পরিগ্রহ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কারণ, তাঁহার নিকটে গমন করিয়া আমরা তাঁহাকে সুস্থ অসুস্থ সকল অবস্থাতেই একথা বারম্বার বলিতে শুনিয়াছি যে, "যে রাম, যে কৃষ্ণ (হইয়াছিল) সেই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতরে—তবে এবার (তাঁহার) গুপ্তভাবে আসা!"

ঠাকুরের দর্শনসমূহ কখন মিথ্যা হয় নাই।

শেষোক্ত দর্শনটীর সত্যতা অনুধাবন করিতে হইলে স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকটে অন্য সময়ে উচ্চারিত ঠাকুরের নিজ বাক্যে বিশ্বাস ভিন্ন অপর কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ দর্শনের কথা ছাড়িয়া দিলে তাঁহার এই কালের অপর দর্শনসমূহের সত্যতাসম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত ধারণা করিতে পারি। কারণ ঐরূপ দর্শনাদি আমাদের গমনাগমনকালের সময় নিত্যই ঠাকুরের জীবনে উপস্থিত হইত এবং তাঁহার ইংরাজীশিক্ষাসম্পন্ন সন্দেহশীল শিষ্যবর্গ অনেক সময় ঐ সকলের সত্যতা নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া আপনারাই পরাজিত হইয়াছিল। লীলাপ্রসঙ্গের অন্যত্র আমরা

ঐ বিষয়ের কয়েকটী উদাহরণের * উল্লেখ করিলেও পাঠকের তৃপ্তির জন্য এখানে আর একটী ঐরূপ দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি—

উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীসুরেশ চন্দ্র মিত্রের বাটীতে ৺দুর্গাপূজা-কালে ঠাকুরের দর্শন-বিবরণ।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ, আশ্বিন মাস, ৺শারদীয়া পূজা মহোৎসবে কলিকাতা নগরীর আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতি বৎসর যেমন মাতিয়া থাকে সেইরূপ মাতিয়াছে। সে আনন্দের প্রবাহ ঠাকুরের ভক্তদিগের প্রাণে বিশেষরূপে অনুভূত হইলেও উহার বাহ্য প্রকাশের পথে বিশেষ বাধা উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, যাঁহাকে লইয়া তাঁহাদের আনন্দোল্লাস তাঁহার শরীরই বিশেষ অসুস্থ—ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত। কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীস্থ একটী দ্বিতল বাটী ভাড়া † করিয়া প্রায় মাসাবধি হইল ভক্তেরা তাঁহাকে আনিয়া রাখিয়াছে এবং সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া ঠাকুরকে রোগমুক্ত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। এপর্য্যন্ত কিন্তু রোগের কিছুমাত্র উপশম হয় নাই, উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতেছে। গৃহস্থ ভক্তেরা সকাল সন্ধ্যা ঐ বাটীতে আগমন করিয়া সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও বন্দোবস্ত করিতেছেন, এবং যুবক ছাত্র-ভক্তদলের ভিতর অনেকে নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করিতে যাওয়া ভিন্ন অপর সকল সময়ে এখানে ঠাকুরের সেবায় লাগিয়া রহিয়াছে, কেহ কেহ

---

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৬৭—১৭৫।

† গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাটী।

আবার আবশ্যক বুঝিয়া তাহাও করিতে না যাইয়া চব্বিশ ঘণ্টা এখানে কাটাইতেছে।

অধিক কথা কহিলে এবং বারম্বার সমাধিস্থ হইলে, শরীরের রক্তপ্রবাহ উর্দ্ধে প্রবাহিত হইয়া ক্ষত স্থানটাকে নিরন্তর আঘাত পূর্ব্বক রোগের উপশম হইতে দিবে না বলিয়া, চিকিৎসক, ঠাকুরকে ঐ সকল বিষয় হইতে সংযত থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন। ঠাকুরও ঐ ব্যবস্থামত চলিবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু বারম্বার ব্যবস্থার বিপরীত কার্য্য করিয়া বসিতেছেন। কারণ, 'হাড় মাসের খাঁচা' বলিয়া চিরকাল অবজ্ঞা করিয়া যে শরীরটা হইতে মন উঠাইয়া লইয়াছেন, তাহাকে সাধারণ মানবের ন্যায় পুনরায় বহুমূল্য জ্ঞান করিতে ঠাকুর কিছুতেই সক্ষম হইতেছেন না। ভগবৎপ্রসঙ্গ উঠিলেই তিনি শরীর ও শরীররক্ষার কথা একেবারে ভুলিয়া যাইয়া উহাতে প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় যোগদান করিয়া বারম্বার সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেছেন! নূতন নূতন ধর্ম্মপিপাসুর সমাগম বহুল হইতেছে; তাহাদিগের হৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখিয়া ঠাকুর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না, মৃদুস্বরে তাহাদিগকে সাধনপথসকল নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। ঐরূপ কার্য্যে তাঁহার নিরন্তর উৎসাহ ও আনন্দ দেখিয়া ভক্তদিগের অনেকে ঠাকুরের ব্যাধিটাকে সামান্য ও সহজসাধ্য জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন; কেহ কেহ আবার, নবাগত ঐ সকল ভক্তদিগকে কৃপা করিবার এবং বহুজনমধ্যে ধর্ম্মভাব প্রচারের জন্যই ঠাকুর স্বেচ্ছায় শারীরিক ব্যাধিরূপ একটা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন—অন্তরের এইরূপ ধারণা প্রকাশ করিয়া স্বীয় আধ্যাত্মিক-অর্থ-গ্রহণ-পটুতার পরিচয় দিতেছেন।

ডাক্তার কোন দিন সকালে এবং কোন দিন অপরাহ্ণে প্রায় নিত্য আসিতেছেন এবং রোগের হ্রাসবৃদ্ধি পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থাদি করিবার পর ঠাকুরের মুখ হইতে ভগবদালাপ শুনিতে শুনিতে এতই মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন যে তন্ময় হইয়া দুই তিন ঘণ্টাকাল অতীত হইলেও বিদায় গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না! আবার, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ঐ সকলের অদ্ভুত সমাধান শ্রবণ করিতে করিতে বহুক্ষণ অতীত হইলে কখন কখন তিনি অনুতপ্ত হইয়া বলিতেছেন, 'আজ তোমাকে বহুক্ষণ বকাইয়াছি, অন্যায় হইয়াছে; তা হউক, সমস্ত দিন আর কাহারও সহিত কোনও কথা কহিও না, তাহা হইলেই আর কোন অপকার হইবে না; তোমার কথায় এরূপ আকর্ষণ যে, এই দেখ না, তোমার কাছে আসিলেই সমস্ত কাজকর্ম্ম ফেলিয়া দুই তিন ঘণ্টা না বসিয়া আর উঠিতে পারি না; জানিতেই পারি না কোন্ দিক দিয়া সময় চলিয়া গেল! সে যাহা হউক, আর কাহারও সহিত এরূপে এতক্ষণ ধরিয়া কথা কহিও না; (কতক রহস্যে এবং কতক ভালবাসা ও আনন্দে) কেবল আমি আসিলে এইরূপে কথা কহিবে, তাহাতে দোষ হইবে না।' (ডাক্তারের ও সকল ভক্তদিগের হাস্য)।

ঠাকুরের পরম ভক্ত, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—ঠাকুর যাঁহাকে কখন কখন 'সুরেশ মিত্র' বলিতেন—তাঁহার সিমলার ভবনে এ বৎসর পূজা আনিয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহাদিগের বাটীতে প্রতি বৎসর পূজা হইত, কিন্তু এক বৎসর বিশেষ বিঘ্ন হওয়ায় তদবধি পূজা বন্ধ ছিল। বাটীর কেহই আর এপর্য্যন্ত পূজা আনিতে সাহসী হয়েন নাই; অথবা, ইতিপূর্ব্বে কেহ আনিতে উদ্যোগী হইলেও অপর সকলে ধরিয়া পড়িয়া তাহাকে ঐ সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের বলে বলীয়ান সুরেন্দ্রনাথ

দৈববিঘ্নের ভয় রাখিতেন না এবং একবার কোন বিষয় করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিলে কাহারও কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য করিতেন না। সুতরাং বাটীর সকলে নানা ওজর করিয়াও তাঁহাকে এবৎসর পূজার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। তিনি ঠাকুরকে জানাইয়া সমস্ত ব্যয়ভার নিজেই বহন করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে বাটীতে আনয়ন করিয়াছেন। শরীরের অসুস্থতা বশতঃ ঠাকুর আসিতে পারিবেন না বলিয়াই কেবল সুরেন্দ্রের আনন্দে নিরানন্দ। আবার পূজাপ্রারম্ভের অল্পদিন পূর্ব্বে বাটীতে কয়েক জন আত্মীয় কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ায় তিনি ঐ বিষয়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়া বাটীর অপর সকলের মনোমালিন্যের হেতু হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও বিচলিত না হইয়া সুরেন্দ্রনাথ অতি সন্তর্পণে ভক্তির সহিত শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সকল গুরুভ্রাতৃগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সপ্তমী পূজা হইয়া গিয়াছে, আজ মহাষ্টমী। শ্যামপুকুরের বাসায় ঠাকুরের নিকট অনেকগুলি ভক্ত একত্র হইয়া ভগবদালাপ ও ভজনাদি করিয়া আনন্দ করিতেছেন। ডাক্তার বাবু অপরাহ্নে ৪ ঘটিকার সময়ে উপস্থিত হইবার কিছুক্ষণ পরেই শ্রীযুত নরেন্দ্র নাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) ভজন আরম্ভ করিয়াছেন। সকলে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া সে অপূর্ব্ব ভাবসংযুক্ত দিব্য স্বরলহরী শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন। ঠাকুরের মধ্যে মধ্যে ভাব সমাধি হইতেছে, আবার সমাধিভঙ্গে সমীপে উপবিষ্ট ডাক্তারের সহিত মৃদুস্বরে কখন কখন দুই একটী ভগবৎকথা কহিতেছেন ও সঙ্গীতের ভাবার্থ বুঝাইয়া দিতেছেন। ভক্তগণের কেহ কেহ ভাবে বাহ্যচৈতন্য হারাইয়াছেন; একটা

প্রবল আনন্দপ্রবাহে ঘর জম্ জম্ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে রাত্রি সাড়ে সাতটা বাজিয়া গেল। ডাক্তারের এতক্ষণে চৈতন্য হইল। তিনি সস্নেহে স্বামিজীকে পুত্রের ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন এবং ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইবামাত্র ঠাকুরও হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সহসা গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। ভক্তেরা কানাকানি করিতে লাগিল, 'এই সময় সন্ধিপূজা কিনা, সেই জন্যই ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন! ঐ কথা না জানিয়াও সহসা সমাধিমগ্ন হইয়াছেন, ইহা কি অল্প বিচিত্র!' প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল এবং ডাক্তারও বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর এইবার ভক্তগণকে ঐ সমাধির বিষয় বলিতে লাগিলেন, "দেখিলাম এখান হইতে সুরেন্দ্রের বাড়ী পর্য্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলিয়া গেল। দেখিলাম, সুরেন্দ্রের ভক্তিতে প্রতিমাতে মার আবেশ হইয়াছে! তৃতীয় নয়ন দিয়া জ্যোতির রশ্মি নির্গত হইতেছে! সম্মুখে দালানের ভিতর দীপমালা জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে; আর মার সম্মুখে উঠানে বসিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া সুরেন্দ্র রোদন করিতেছে। তোমরা এখন সকলে মিলিয়া তার বাটীতে যাও। তোমাদের দেখিলে তার প্রাণ অনেকটা শীতল হইবে।"

অনন্তর ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সকলে সুরেন্দ্রনাথের বাটীতে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, বাস্তবিকই দালানে নির্দ্দিষ্ট স্থানে দীপমালা জ্বালা হইয়াছিল এবং ঠাকুরের যখন সমাধি হইয়াছিল তখন সুরেন্দ্রনাথ প্রাণের আবেগ আর ধারণ করিতে না পারিয়া প্রতিমার সম্মুখে উঠানে বসিয়া 'মা', 'মা',

বলিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাল ধরিয়া বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন! ঠাকুরের সমাধিকালের দর্শন ঐরূপে বাহ্য ঘটনার সহিত মিলাইয়া পাইয়া ভক্তগণ তখন আনন্দে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন!

রাণী রাসমণি ও মথুর বাবু ভ্রমধারণাবশতঃ ঠাকুরকে যেভাবে পরীক্ষা করেন।

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরের ভিতরেই আবার, শ্রীমতী রাণী রাসমণি ও তজ্জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন কোন সময়ে ভাবিয়াছিলেন যে, অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য-ধারণের ফলেই ঠাকুরের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতারূপে প্রকাশিত হইতেছে। ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ হইলে পুনরায় শারীরিক স্বাস্থ্য লাভের সম্ভাবনা ভাবিয়া ঠাকুরের কল্যাণকামনায় তাঁহারা লছ্‌মীবাই প্রমুখ হাবভাব-পূর্ণা সুন্দরী বারনারীকুলের সহায়ে তাঁহাকে প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এবং পরে কলিকাতার মেছুয়াবাজার পল্লীস্থ এক ভবনে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, ঐ সকল নারীর মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দেখিতে পাইয়া তিনি ঐকালে 'মা', 'মা' বলিতে বলিতে বাহ্যচৈতন্য হারাইয়াছিলেন এবং তাঁহার ইন্দ্রিয় সঙ্কুচিত হইয়া কূর্ম্মাঙ্গের ন্যায় শরীরাভ্যন্তরে এককালে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল! শুনিয়াছি ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং ঠাকুরের বালকের ন্যায় ব্যবহারে মুগ্ধা হইয়া ঐ সকল নারীর হৃদয়ে ঐকালে বাৎসল্যের সঞ্চার হইয়াছিল! অনন্তর তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গে প্রলোভিত করিয়া তাহারাই অপরাধিনী হইয়াছে ভাবিয়া সজল-নয়নে ঠাকুরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা, ও তাঁহাকে বারম্বার প্রণাম করিয়া তাহারা সশঙ্কচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল!

নবম অধ্যায়।

বিবাহ ও পুনরাগমন।

এদিকে ঠাকুর পূজাকার্য্য ছাড়িয়া দিয়াছেন এই সংবাদ কামারপুকুরে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতার কর্ণে পৌঁছিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিয়া তুলিল। রামকুমারের মৃত্যুর পরে দুই বৎসর কাল যাইতে না যাইতে ঠাকুরকে বায়ু-রোগাক্রান্ত হইতে শুনিয়া জননী চন্দ্রমণি দেবী এবং শ্রীযুত রামেশ্বর বিশেষ চিন্তিত হইলেন। লোকে বলে, মানবের অদৃষ্টে যখন দুঃখ আসে তখন একটীমাত্রতু ঘটনায় উহার পরিসমাপ্তি হয় না, কিন্তু নানাপ্রকারের দুঃখ চারিদিক হইতে উপর্য্যুপরি আসিয়া তাহার জীবনাকাশ এককালে আচ্ছন্ন করে—ইঁহাদিগের জীবনে এখন ঐরূপ হইল। শ্রীযুত গদাধর চন্দ্রাদেবীর পরিণত বয়সে প্রাপ্ত, আদরের কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। সুতরাং শোকে দুঃখে অধীরা হইয়া তিনি পুত্রকে বাটীতে ফিরাইয়া আনিবার বন্দোবস্ত করিলেন এবং নিকটে আসিলে পুত্রের উদাসীন, উন্মনা, চঞ্চল ভাব দেখিয়া এবং 'মা' 'মা' বলিয়া তাহার কাতর ক্রন্দন শুনিয়া উদ্বিগ্ন মনে নানারূপ প্রতীকারের চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ঔষধাদি ব্যবহারের সহিত শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, ঝাড়্‌ফুক্

ঠাকুরের কামারপুকুরে আগমন।

প্রভৃতি নানা দৈব প্রক্রিয়ারও অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। তখন সন ১২৬৫ সালের আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাস হইবে।

ঠাকুর উপদেবতাবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া আত্মীয়-দিগের ধারণা।

বাটীতে ফিরিয়া ঠাকুর অনেক সময় পূর্ব্বের ন্যায় থাকিলেও মধ্যে মধ্যে ভাববিহ্বল হইয়া পড়িতেন এবং যখন ঐরূপ হইতেন তখন তাঁহার চাল চলন ব্যবহারাদি সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া যাইত! আবার, গাত্রদাহের জন্য মধ্যে মধ্যে তিনি বিশেষ যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। এইরূপে একদিকে তাঁহার সকলের সহিত সরল অমায়িক ব্যবহার, দেবভক্তি, মাতৃভক্তি ও বয়স্য-প্রেমের যেমন পূর্ব্ববৎ প্রকাশ ছিল, অপর দিকে আবার তেমনি, সময়ে সময়ে সর্ব্ব বিষয়ে উদাসীনতা ও লজ্জা-ভয়-ঘৃণারাহিত্য, সাধারণের অপরিচিত একটা অনির্দ্দিষ্ট বিষয়লাভের জন্য উদ্দাম ব্যাকুলতা এবং নিজ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথের সকল বিঘ্ন বাধা নির্ম্মূল করিবার জন্য অনাশ্রব চেষ্টা তাঁহাতে এক অপূর্ব্ব বিপরীত প্রকাশ উপস্থিত করিয়া লোকের মনে এক অদ্ভুত বিশ্বাসের উদয় করিয়াছিল। লোকে ভাবিয়াছিল তিনি উপদেবতাবিষ্ট হইয়াছেন!

ওঝা আনাইয়া চণ্ড নামান।

ঠাকুরের মাতা, সরলহৃদয়া চন্দ্রাদেবীর প্রাণে ইতিপূর্ব্বে ঐ কথা কখন কখন উদিত হইয়াছিল। এখন অপরেও ঐরূপ আলোচনা করিতেছে শুনিয়া তিনি পুত্রের কল্যাণের জন্য ওঝা আনাইতে মনোনীত করিলেন। ঠাকুর বলিতেন—"একদিন একজন ওঝা আসিয়া একটা মন্ত্রপূত পল্‌তে পুড়াইয়া শুঁকিতে দিল; বলিল, যদি ভূত হয় ত পলাইয়া যাইবে; কিন্তু কিছুই হইল না!" পরে বিশিষ্ট কয়েকজন ওঝার সাহায্যে পূজাদি

করিয়া একদিন রাত্রিকালে চণ্ড নামান হইল! চণ্ড পূজা ও বলি গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হইয়া ওঝাকে বলিল, 'উহাকে (ঠাকুরকে) ভূতে পায় নাই বা উহার কোন ব্যাধিও হয় নাই!'—পরে সকলের সমক্ষে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ও গদাই, তুমি সাধু হতে চাও, তবে অত সুপারী খাও কেন? সুপারীতে যে কামের বৃদ্ধি হয়!" ঠাকুর বলিতেন—'বাস্তবিকই ইতিপূর্ব্বে আমি সুপারী খাইতে বড় ভালবাসিতাম এবং উহা যখন তখন খাইতাম; চণ্ডের ঐরূপ কথাতে উহা তদবধি ত্যাগ করিলাম!"

ঠাকুরের প্রকৃতিস্থ হইবার কারণসম্বন্ধে তাঁহার আত্মীয়বর্গের কথা।

ঠাকুরের বয়স তখন ত্রয়োবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। কামারপুকুরে কয়েক মাস থাকিবার পরে তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। প্রকৃতিস্থ হইবার এবং ব্যাকুল ক্রন্দনের ভাবটা তাঁহাতে প্রশমিত হইবার নিশ্চিত কোন বিশেষ কারণ ছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বার বারম্বার অদ্ভুত দর্শনাদি-লাভেই নিশ্চিত তিনি এখন শান্ত হইতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ের অনেক কথা আমরা তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকট শুনিয়াছি; তাহাতেই আমাদিগের মনে ঐ ধারণা নিঃসংশয় হইয়াছে। ঐ সকল কথা আমরা এখন পাঠককে বলিব।

কামারপুকুরের পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তদ্বয়ে অবস্থিত ভূতির খাল এবং বুধুই মোড়ল নামক জনশূন্য শ্মশানদ্বয়ে দিবা ও রাত্রির অনেক ভাগ তিনি এই সময়ে একাকী অতিবাহিত করিতেন এবং এই কাল হইতে সময়ে সময়ে তাঁহাতে অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তি-প্রকাশের কথা তাঁহার আত্মীয়েরা জানিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের নিকটে শুনিয়াছি, ঠাকুর এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত শ্মশানদ্বয়ে অবস্থিত শিবাসমূহ এবং উপদেবতাদিগকে বলি দিবার জন্য মিষ্টা-

ন্নাদি খাদ্য সংগ্রহ করিয়া নূতন হাঁড়ীতে পুরিয়া লইয়া গৃহ হইতে কখন কখন নিষ্ক্রান্ত হইতেন। ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিয়াছেন, ভূত-বলি নিবেদন করিয়া দিবার পরে ঐ হাঁড়ী বায়ুভরে উর্দ্ধে উঠিয়া শূন্যে লীন হইয়া যাইত এবং ঐ সকল উপদেবতাকে তিনি অনেক সময় স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেন! কোন কোন দিন রাত্রি দ্বি-প্রহর অতীত হইলেও কনিষ্ঠকে গৃহে ফিরিতে না দেখিয়া ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ, শ্রীযুত রামেশ্বর শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইয়া ভ্রাতার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে থাকিতেন। ঠাকুরও ডাক শুনিয়া উচ্চকণ্ঠে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া বলিতেন, 'যাচ্চি গো দাদা; তুমি এদিকে আর অগ্রসর হইও না, তাহা হইলে ইহারা (উপদেব-তারা) তোমার অপকার করিবে!' ভূতির খালের পার্শ্বের শ্মশানে ঠাকুর এই সময়ে একটী বিল্ববৃক্ষ স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন এবং শ্মশানমধ্যে যে প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল তাহার তলে বসিয়া অনেক সময় জপ-ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। ঠাকুরের আত্মীয়-বর্গের ঐ সকল কথায় বুঝিতে পারা যায় যে, জগদম্বার দর্শন-লালসায় তিনি ইতিপূর্ব্বে ভিতরে যে বিষম অভাব অনুভব করিয়া-ছিলেন, তাহা আধ্যাত্মিক রাজ্যের কতকগুলি অপূর্ব্ব দর্শন ও উপ-লব্ধি দ্বারা এই সময়ে প্রশমিত হইয়াছিল। তাঁহার এই কালের জীবনালোচনা করিয়া মনে হয়, শ্রীশ্রীজগদম্বার অসিমুণ্ডধরা, বরাভয়করা, সাধকানুগ্রহকারিণী চিন্ময়ী মূর্ত্তির দর্শন, তিনি এখন প্রায় সর্ব্বদা লাভ করিতেছিলেন এবং তাঁহাকে যখন যাহা প্রশ্ন করিতেছিলেন তাহার উত্তর পাইয়া তদনুযায়ী নিজ জীবন চালিত করিতেছিলেন। মনে হয়, এখন হইতে তাঁহার মনে একথার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ৺জগদম্বার বাধামাত্রশূন্য অবিরাম পূর্ণদর্শন তাঁহার ভাগ্যে অচিরেই উপস্থিত হইবে।

ঐরূপে ভূতবলি এবং শিবাবলি দিবার কথাই যে আমরা এইকালে ঠাকুরের সম্বন্ধে শুনিয়াছি তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎ-দর্শন বিষয়ক অন্য একটী যোগ-বিভূতির কথাও জানিতে পারিয়াছি। হৃদয় এবং কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর অনেকে ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন—এবং ঠাকুরের শ্রীমুখেও আমরা ঐকথা শুনিয়াছি।

ঐ কালে ঠাকুরের যোগবিভূতির কথা।

ঠাকুরের বাহ্য ব্যবহার ও কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহার মাতা ও অন্যান্য পরিবারবর্গ এখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইতিপূর্ব্বে তিনি সহসা যে বায়ুরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, দৈবকৃপায় তাহার অনেকটা শান্তি হইয়াছে। কারণ, তাঁহারা দেখিতেছিলেন, তিনি এখন যখন তখন ব্যাকুল ক্রন্দন করেন না, আহারাদি যথাসময়ে করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার অন্য সকল আচরণও অন্য সকলের ন্যায়। তবে যে, তিনি যখন তখন শ্মশানে যাইয়া বসিয়া থাকেন, পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করিয়া কখন কখন নির্লজ্জভাবে ধ্যান পূজাদি করিতে বসেন, পূজা অনুষ্ঠানাদি যাহা করিবেন ভাবিয়াছেন তাহাতে বাধা পাইলে বিরক্ত হইয়া উঠেন ও কাহারও নিষেধ মানেন না এবং সর্ব্বদা ঠাকুর-দেবতা লইয়া থাকেন —সেটা তাঁহার আবাল্য স্বভাব; উহাতে বায়ুরোগের পরিচয় পাইবার কোন কারণ নাই।

ঠাকুরকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আত্মীয়বর্গের বিবাহদানের সংকল্প।

কিন্তু সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক বিষয়ে ঠাকুরের পূর্ণমাত্রায় উদাসীনতা এবং উন্মনাভাবের জন্য তাঁহারা এখনও বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। দৈনন্দিন সাংসারিক বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া পূর্ব্বোক্ত উন্মনা ভাবটা যতদিন না প্রশমিত হইতেছে ততদিন বায়ু-

রোগে পুনরাক্রান্ত হইবার তাঁহার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে—একথা তাঁহাদের মনে পুনঃ পুনঃ উদিত হইয়া তাঁহাদিগকে এখনও কখন কখন চিন্তাসাগরে মগ্ন করিত। উহার হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ঠাকুরের স্নেহময়ী মাতা ও অগ্রজ নানা উপায়োদ্ভাবনে অনেক সময় নিযুক্ত হইতেন। অশেষ চিন্তা ও আলোচনার পর অবশেষে মাতা ও পুত্রে পরামর্শ স্থির হইল যে, উপযুক্তা পাত্রী দেখিয়া ঠাকুরের এখন বিবাহ দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। সদ্বংশীয়া সুশীলা স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা পড়িলে, ঠাকুরের মন আর অত ঊর্দ্ধসঞ্চরণশীল থাকিবে না। যৌবনে পদার্পণ করিলেও তিনি এখনও পূর্ব্বের ন্যায় সকল বিষয়ে মাতা ও ভ্রাতার মুখাপেক্ষী হইয়া যে বালক সেই বালকই রহিয়াছেন, স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাবে নিজ সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা বা 'আঁট' তাঁহাতে প্রবিষ্ট হয় নাই! ঘাড়ে স্ত্রীপুত্রাদি-পোষণের ভার না পড়িলে উহা কেমন করিয়া আসিবে?

আবার, দেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে পণ দিয়া গৃহে কন্যা আনয়ন করিতে হইবে। দশ বার বৎসর বয়স্কা কন্যার পণে যত টাকা লাগিবে তত টাকা দিবার তাঁহাদিগের সামর্থ্য কোথায়? সাংসারিক নানাবিধ বিপৎপাতে টাকার যোগাড় হইয়া উঠে নাই বলিয়াই ত 'গয়ং গচ্ছ' করিয়া এতদিন গদাধরের বিবাহ দেওয়া হয় নাই। পাঁচ ছয় বৎসরের বালিকার সহিত তখন বিবাহ দিয়া ফেলিলে সে এতদিনে বড় হইয়া পতির মনাকর্ষণ ও সংসারের কাজ কর্ম্মের কত ভার লইতে পারিত। সে যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে, আর কালবিলম্ব উচিত নহে। চারিদিকে পাত্রীর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

গদাধর জানিতে পারিলে পাছে ওজর আপত্তি করে এজন্য

মাতা ও পুত্রে পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ অন্তরালে হইলেও চতুর ঠাকুরের উহা জানিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু বিবাহের প্রস্তাব উঠিলে তিনি ঐ বিষয়ে কোনরূপ আপত্তি না করিয়া বরং বাটীতে কোন একটা অভিনব ব্যাপার উপস্থিত হইলে বালক বালিকারা যেরূপ রঙ্গরস ও আনন্দ করিয়া থাকে তদ্রূপ আচরণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট ঐ বিষয় নিবেদন করিয়া ঐ বিষয়ে কিংকর্ত্তব্য জানিয়াই কি তিনি এই সময়ে ঐরূপ আনন্দের ভাব দেখাইয়াছিলেন? অথবা, বালকের ন্যায় ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও চিন্তারাহিত্যই তাঁহার আনন্দ-প্রকাশের কারণ? সাধারণে দ্বিতীয়টীকে উহার কারণ বলিয়া নির্ণয় করিলেও আমরা উহার যথার্থ কারণ অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।*

ঠাকুরের বিবাহে সম্মতিদানের কারণ।

সে যাহা হউক, চারিদিকের গ্রামসকলে লোক প্রেরিত হইলেও কোথাও মনোমত পাত্রী পাওয়া গেল না। যে কয়েকটী পাওয়া গেল তাহাদের পিতা মাতা অসম্ভব অধিক হারে পণ যাচ্ঞা করায় ঠাকুরের অগ্রজ রামেশ্বর সে সকল স্থানে বিবাহ স্থির করিতে সাহস করিলেন না। গ্রামস্থ বন্ধুগণও তাঁহাকে অত অধিক পণ দিয়া ঐ কার্য্য করিতে পরামর্শ দিলেন না। ঠাকুরের মাতা চন্দ্রাদেবী সুতরাং বিশেষ চিন্তিতা হইলেন। কারণ, দেবতুল্য স্বামী ও জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমারের অবর্ত্তমানে তিনি অনাবিল সুখের আশায় গদাধরের বিবাহদানে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, কিন্তু পুত্রের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ভাবিয়াই ঐ কর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

বিবাহের জন্য ঠাকুরের পাত্রী নির্ব্বাচন।

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায় ১৩০—১৪৫ পৃষ্ঠা দেখ।

সুতরাং পাত্রী পাইলেন না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার তাঁহার উপায় ছিল না। পুনরায় তন্ন তন্ন করিয়া পাত্রীর অনুসন্ধান চলিল। ঐরূপ অনুসন্ধানেও পাত্রী মিলিতেছে না দেখিয়া তাঁহার মাতা ও ভ্রাতা যখন নিতান্ত বিরস ও চিন্তামগ্ন হইয়াছেন তখন সহসা একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—'হেথায় হোথায় অনুসন্ধান বৃথা, জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরাম মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে খুঁজিয়া দেখগে, বিবাহের পাত্রী কুটাবাঁধা হইয়া সেখানে রক্ষিতা আছে!'*

বিবাহ।

ঠাকুরের ঐ কথায় সহসা বিশ্বাস স্থাপন না করিলেও ঠাকুরের মাতা ও ভ্রাতা ঐ স্থানে একবার অনুসন্ধান করিতে লোক প্রেরণ করিলেন। লোক যাইয়া সংবাদ আনিল, অন্য সকল বিষয়ে যাহাই হউক পাত্রী কিন্তু নিতান্ত বালিকা, বয়স—পঞ্চম বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র। অন্য কোথাও হইতে অপর কোন পাত্রীর সন্ধান না আসায় এবং ঐরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে এই পাত্রীর সন্ধানলাভে ঠাকুরের মাতা অগত্যা ঐস্থানেই পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃতা হইলেন। অল্প দিনেই সকল কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেল। অনন্তর শুভদিন ও শুভ মুহূর্ত্ত দেখাইয়া শ্রীযুত রামেশ্বর নিজালয় হইতে দুই ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত জয়রামবাটী গ্রামে ভ্রাতাকে লইয়া যাইয়া শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চম বর্ষীয়া একমাত্র কন্যার সহিত শুভ-পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া আসিলেন। বিবাহে তিন শত টাকা পণ লাগিল। তখন সন ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসের শেষভাগ এবং ঠাকুর চতুর্বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায়, ১৩২ পৃষ্ঠা দেখ।

বিবাহের পরে শ্রীমতী চন্দ্রমণি এবং ঠাকুরের আচরণ।

গদাধরের বিবাহ দিয়া শ্রীমতী চন্দ্রমণি দেবী এখন যে অনেকটা নিশ্চিন্তা হইয়াছিলেন, একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। অন্য সকল বিষয়ের ন্যায় বিবাহ-বিষয়ে তাঁহার নিয়োগ পুত্রকে শ্রদ্ধাসম্পন্নচিত্তে যথাযথ সম্পন্ন করিতে দেখিয়া তিনি ভাবিলেন দেবতা এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। কারণ, দেবতা অনুকূল না হইলে সকল কার্য্য কি কখন এরূপ সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইত? উন্মনা পুত্র গৃহে ফিরিল, সদ্বংশীয়া পাত্রী জুটিল, অর্থের অনটন—তাহাও অচিন্তনীয়ভাবে পূর্ণ হইল, পুত্র সংসারী হইল! অতএব দৈব অনুকূল নহেন, একথা আর কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? সুতরাং সরল-হৃদয়া ধর্ম্মপরায়ণা চন্দ্রাদেবী যে, এখন কথঞ্চিৎ সুখী হইয়াছিলেন, একথা আমরা বলিতে পারি। কিন্তু, বৈবাহিকের মনস্তুষ্টি ও বাহিরের সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য জমীদার বন্ধু লাহাবাবুদের বাটী হইতে যে কন্যা-গহনাগুলি চাহিয়া বধূকে বিবাহের দিনে সাজাইয়া আনিয়াছিলেন, বিবাহের কয়েক দিন পরে তাহা ফিরাইয়া দিবার যখন সময় উপস্থিত হইল তখন তিনি যে আবার নিজ সংসারের দারিদ্র্য-চিন্তায় অভিভূতা হইয়াছিলেন, ইহাও আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। গদাধরের আদরের পাত্রী হইবে বলিয়া নববধূকে তিনি বিবাহের দিন হইতেই আপনার হইতে আপনার করিয়া লইয়া-ছিলেন। সুতরাং বালিকার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি তিনি কোন্ প্রাণে খুলিয়া লইবেন, এই চিন্তায় বৃদ্ধার চক্ষু জলপূর্ণ হইয়াছিল। হৃদয়ের পূর্ব্বোক্ত বেদনার কথা তিনি কাহাকেও না বলিলেও গদা-ধরের উহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি দুই চারি কথায় মাতাকে শান্ত করিয়া নিদ্রিতা বধূর অঙ্গ হইতে গহনাগুলি এমন কৌশলে

খুলিয়া লইলেন যে, বালিকা উহা কিছুই জানিতে পারিল না। অলঙ্কারগুলি লাহাবাবুদের বাটীতে তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু এখানেই ঐ বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইল না। বুদ্ধিমতী বালিকা নিদ্রাভঙ্গে বলিতে লাগিল, 'আমার গায়ে যে এইরূপ সব গহনা ছিল, তাহা কোথায় গেল ?' চন্দ্রাদেবী তাহাতে সজল নয়নে বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা প্রদানের জন্য বলিতে লাগিলেন, 'মা ! গদাধর তোমাকে ঐ সকলের অপেক্ষাও উত্তম অলঙ্কার সকল, ইহার পর কত দিবে,' ইত্যাদি। কন্যার খুল্লতাত ঐ দিন তাহাকে দেখিতে আসিয়া ঐ কথা জানিতে পারিলেন এবং বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া ঐ দিনেই তাহাকে পিত্রালয়ে লইয়া যাইলেন। চন্দ্রাদেবীর মনে উহাতে আবার বিশেষ কষ্ট হইল। ঠাকুর তাহাতে, 'উহারা এখন যাহাই বলুক্ ও করুক্ না কেন, বিবাহ ত আর ফিরিবে না ?'—ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া বালকের ন্যায় রঙ্গ-পরিহাসাদি করিয়া মাতার মনের সে দুঃখ অচিরে দূর করিয়াছিলেন।

বিবাহের পরে ঠাকুর প্রায় সাত মাস কাল কামারপুকুরেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বহুকাল পরে নিকটে পাইয়া তাঁহার জননী তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় যাইতে সহজে অনুমতি দেন নাই। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হইয়া কলিকাতায় ফিরিলে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার বায়ুরোগ হইতে পারে এই আশঙ্কাতেই বোধ হয় শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী তাঁহাকে সহসা যাইতে দেন নাই। সে যাহা হউক, সন ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বধূ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলে কুলপ্রথানুসারে ঠাকুরের কয়েক দিনের জন্য শ্বশুরালয়ে যাইতে হইয়াছিল এবং শুভদিন দেখিয়া বধূকে

ঠাকুরের কলিকাতায় পুনরাগমন।

সঙ্গে লইয়া একত্রে কামারপুকুরে আগমন করিতে হইয়াছিল। ঐরূপে যোড়ে আসিবার অনতিকাল পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিতে সঙ্কল্প করিলেন। কারণ, কলিকাতায় না আসিলে চলে কি করিয়া? মাতা ও ভ্রাতা তাঁকে কামারপুকুরে আরও কিছু কাল অবস্থান করিতে বলিলেও সংসারের অভাব অনটনের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। স্নেহ-ভালবাসাপূর্ণ ঠাকুরের হৃদয় ঐ কথা জানিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিবে? তিনি, তাঁহাদিগের ঐ কথা না শুনিয়া কালীবাটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং পূর্ব্ববৎ শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবাকার্য্যে ব্রতী হইলেন।

ঠাকুরের দ্বিতীয়বার দেবোন্মাদাবস্থা।

কলিকাতায় ফিরিয়া কয়েক দিন পূজা করিতে না করিতেই তাঁহার মন ঐ কার্য্যে এত তন্ময় হইয়া যাইল যে, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, সংসার, অনটন প্রভৃতি কামারপুকুরের সকল কথা তাঁহার মনের কোন্ এক নিভৃত কোণে চাপা পড়িয়া গেল; এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সকল সময়ে, সকলের মধ্যে কিরূপে দেখিতে পাইবেন —এই বিষয়ই উহার সকল স্থল অধিকার করিয়া বসিল। দিবারাত্র স্মরণ, মনন, জপ, ধ্যানে তাঁহার বক্ষ পুনরায় সর্ব্বক্ষণ আরক্তিমভাব ধারণ করিল, সংসার ও সাংসারিক বিষয়ের প্রসঙ্গ বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল, বিষম গাত্রদাহ পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং নয়নকোণ হইতে নিদ্রা যেন দূরে কোথায় অপসৃত হইল! তবে, শারীরিক ও মানসিক ঐ প্রকার অবস্থা ইতিপূর্ব্বে একবার অনুভব করায় তিনি উহাতে পূর্ব্বের ন্যায় এককালে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন না।

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, মথুর বাবুর নির্দ্দেশে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ, ঠাকুরের বায়ুপ্রকোপ, অনিদ্রা

ও গাত্রদাহাদি রোগের উপশমের জন্য এইকালে চতুর্মুখাদিবটী এবং মধ্যমনারায়ণাদি নানা তৈল ক্রমে ক্রমে ব্যবহার করাইয়াছিলেন। চিকিৎসায় আশু ফল না পাইলেও হৃদয় নিরাশ না হইয়া মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া কবিরাজের কলিকাতাস্থ ভবনে চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ঠাকুর বলিতেন, একদিন ঐরূপে হৃদয়ের সহিত গঙ্গাপ্রসাদের ভবনে উপস্থিত হইলে তিনি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার জন্য নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। গঙ্গাপ্রসাদের নিকট তখন পূর্ব্ববঙ্গীয় অন্য একজন বৈদ্যও উপস্থিত ছিলেন। ঐ বৈদ্য ঠাকুরের দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার রোগের বিষয় অনুধাবন করিতে করিতে বলিলেন, 'লক্ষণ দেখিয়া ইঁহার দেবোন্মাদ অবস্থা বলিয়া বোধ হইতেছে; উহা যোগজ ব্যাধি; ঔষধে সারিবার নহে।* ঠাকুর বলিতেন, এই বৈদ্যই, ব্যাধির ন্যায় প্রতীয়মান তাঁহার শারীরিক বিকারসমূহের যথার্থ কারণ প্রথম নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার বাক্যে কেহই তখন আস্থা প্রদান করেন নাই। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং মথুর বাবু প্রমুখ ঠাকুরের হিতৈষী বন্ধুবর্গ চিন্তান্বিত হইয়া তাঁহার অসাধারণ ব্যাধির নানারূপে চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। রোগের কিন্তু ক্রমশঃ বৃদ্ধি ভিন্ন উপশম দেখা গেল না।

সংবাদ ক্রমে কামারপুকুরে পৌঁছিল। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী উপায়ান্তর না দেখিয়া পুত্রের কল্যাণকামনায় ৺মহাদেবের নিকট

---

* কেহ কেহ বলেন ৺গঙ্গাপ্রসাদের ভ্রাতা, শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদই ঠাকুরকে দেখিয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

হত্যা দিবার সংকল্প স্থির করিলেন, এবং কামারপুকুরের 'বুড়ো শিব'কে জাগ্রত দেবতা জানিয়া তাঁহারই মাড়ে (মন্দিরে) যাইয়া প্রায়োপবেশন করিয়া পড়িয়া রহিলেন। মুকুন্দপুরের শিবের নিকট হত্যা দিলে তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে, তিনি এখানে এইরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিলেন এবং ঐস্থানে গমন করিয়া পুনরায় প্রায়োপবেশনের অনুষ্ঠান করিলেন। মুকুন্দপুরের শিবের নিকট ইতিপূর্ব্বে কামনা পূরণের জন্য কেহ হত্যা দিত না। প্রত্যাদিষ্টা বৃদ্ধা উহা জানিয়াও মনে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। দুই তিন দিন পরেই তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, জ্বলজ্জটাসুশোভিত বাঘাম্বর-পরিহিত রজতদলিতকান্তি মহাদেব সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দানপূর্ব্বক বলিতেছেন—'ভয় নাই, তোমার পুত্র পাগল হয় নাই, ঐশ্বরিক আবেশে তাহার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে! ধর্ম্মপরায়ণা বৃদ্ধা ঐরূপ দেবাদেশলাভে আশ্বস্তা হইয়া ভক্তিপূতচিত্তে শ্রীশ্রীমহাদেবের পূজা দিয়া গৃহে ফিরিলেন এবং পুত্রের মানসিক শান্তিবিধানের জন্য কুলদেবতা ৺রঘুবীর ও ৺শীতলা মাতার একমনে সেবা করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, মুকুন্দপুরের শিবের নিকট তদবধি অনেক নরনারী প্রতি বৎসর হত্যা দিয়া সফলকাম হইতেছে।

চন্দ্রাদেবীর হত্যাদান।

এই কালের কথা স্মরণ করিয়া ঠাকুর আমাদিগকে পরে অনেক সময় বলিয়াছেন—"সাধারণ জীবের শরীর-মনে আধ্যাত্মিক ভাবে ঐরূপ দূরে থাকুক্ উহার এক চতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হইলে শরীর ত্যাগ হয়। দিবা-রাত্রির অধিকাংশ ভাগ, মার কোন না কোনরূপ দর্শনাদি পাইয়া ভুলিয়া থাকিতাম তাই রক্ষা, নতুবা (নিজ শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা থাকা অসম্ভব হইত! এখন হইতে

ঠাকুরের এই কালের অবস্থা।

আরম্ভ হইয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তিলমাত্র নিদ্রা হয় নাই! চক্ষু পলকশূন্য হইয়া গিয়াছিল, চেষ্টা করিয়াও পলক ফেলিতে পারিতাম না! কত কাল যে গত হইল, তাহার জ্ঞান থাকিত না এবং শরীরকে শরীর বলিয়া জ্ঞান ছিল না! মার দিক হইতে ফিরিয়া শরীরের দিকে যখন একটু আধটু দৃষ্টি পড়িত তখন বিষম ভয় হইত; ভাবিতাম, তাই ত পাগল হইতে বসিয়াছি নাকি? দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া দেখিতাম, তাহাতে চক্ষুর পলক পড়ে কি না!—দেখিতাম তাহাতেও চক্ষু সমভাবে পলকশূন্য হইয়া থাকিত! ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতাম এবং মাকে বলিতাম—'মা, তোকে ডাকার ও তোর উপর একান্ত বিশ্বাস নির্ভর করার কি এই ফল হ'ল? শরীরে বিষম ব্যাধি দিলি?' আবার পরক্ষণেই বলিতাম, 'তা যা হবার হ'ক্‌গে, শরীর যায় যাক্, তুই কিন্তু আমায় ছাড়িস্ নি, আমায় দেখা দে, কৃপা কর্, আমি যে, মা তোর পাদপদ্মে একান্ত শরণ লইয়াছি, তুই ভিন্ন আমার যে, আর অন্য গতি একেবারেই নাই!' ঐরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে মন আবার অদ্ভুত উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় বলিয়া মনে হইত এবং মার দর্শন ও অভয়বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হইতাম!"

মথুর বাবুর ঠাকুরকে শিব-কালীরূপে দর্শন।

সে যাহা হউক, শ্রীশ্রীজগন্মাতার অচিন্ত্য নিয়োগে মথুর বাবু এই সময়ে এক দিন ঠাকুরের মধ্যে অদ্ভুত দেবপ্রকাশ অযাচিতভাবে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কিরূপে তিনি সেদিন ঠাকুরের ভিতর শিব ও কালীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া জীবন্ত দেবতাজ্ঞানে তাঁহাকে হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিয়াছিলেন,

তাহা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি।* ঐ দর্শনের দিন হইতে তিনি ঠাকুরকে আর এক নয়নে দেখিতে এবং তাঁহাতে সর্ব্বদা ভক্তি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন! এরূপ অঘটন ঘটনা দেখিয়া স্পষ্ট মনে হয়, ঠাকুরের সাধকজীবনে এখন হইতে মথুরের সহায়তা ও আনুকূল্যের বিশেষ প্রয়োজন হইবে বলিয়াই যেন ইচ্ছাময়ী জগন্মাতা তাঁহাদিগের উভয়কে ঐরূপে অবিচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। সন্দেহ, জড়বাদ ও নাস্তিক্য-প্রবণ বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মগ্লানি দূর করিয়া অধ্যাত্মশক্তি সংক্রমণের জন্য ঠাকুরের শরীরমনরূপ যন্ত্রটীকে শ্রীশ্রীজগদম্বা কত যত্নে ও কি অদ্ভুত উপায়সকল অবলম্বনে যে, নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ঐরূপ ঘটনাসকলে তাহার প্রমাণ পাইয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

দশম অধ্যায়।

ভৈরবীব্রাহ্মণী-সমাগম।

রাণী রাসমণির সাংঘাতিক পীড়া।

বিবাহ করিয়া কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পরে সন ১২৬৭ সালের শেষভাগে, ইংরাজী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ঠাকুরের জীবনে দুইটী ঘটনা সমুপস্থিত হয়। ঘটনা দুইটী তাঁহার জীবনে বিশেষ পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছিল; সেজন্য উহাদের কথা আমাদিগের আলোচনা করা আবশ্যক। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রাণী রাসমণি গ্রহণীরোগে আক্রান্তা হইলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৭৮ হইতে ১৮০ পৃষ্ঠা।

আমাদের কেহ কেহ শুনিয়াছেন, রাণী ঐ সময়ে একদিন সহসা পড়িয়া যান। উহাতেই জ্বর, গাত্রবেদনা ও অজীর্ণাদির সূত্রপাত হইয়া, ক্রমে গ্রহণীরোগের সঞ্চার হইয়াছিল। রোগ ক্রমে সাংঘাতিক ভাব ধারণ করিল।

পাঠককে আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, অশেষ গুণবতী রাণী সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ইংরাজী ১৮৫৫ খৃস্টাব্দের মে মাসের ৩১শে তারিখে বৃহস্পতিবারে দক্ষিণেশ্বরকালীবাটী সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং ঐ দেবসেবা আবহমান কাল নির্ব্বিঘ্নে চালাইবার উদ্দেশ্যে ঐ বৎসর ১৪ই ভাদ্র, ইংরাজী ২৯শে আগস্ট তারিখে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত তিন লাট জমিদারী দুই লক্ষ ছাব্বিশ সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়াছিলেন।* মনে মনে সঙ্কল্প থাকিলেও, রাণী এতদিন ঐ সম্পত্তি আইনানুসারে যথাযথভাবে দানপত্র লিপিবদ্ধ করিয়া উহাকে দেবোত্তররূপে পরিণত করেন নাই। আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া উহা করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাণীর চারি কন্যার মধ্যে মধ্যমা ও তৃতীয়া শ্রীমতী কুমারী ও শ্রীমতী করুণাময়ী দাসীর দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুশয্যার

রাণীর দিনাজপুরের সম্পত্তি দেবোত্তর করা ও মৃত্যু।

* Plaint in High Court Suit No. 308 of 1872 Puddomoni Dasee vs. Jagadamba Dasee, recites the following from the Deed of Endowment executed by Rani Rasmoni :—"According to my late husband's desire * * * I on 18th. Jaistha 1262 B. S. (June 1855) established and consecrated the *Thakurs* * * * and for purpose of carrying on the *Sheba* purchased three lots of Zemindaries in District Dinajpur on 14th Bhadra 1262 B. S. (29th, August 1855) for Rs 2,26,000."

পার্শ্বে সুতরাং তাঁহার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যাদ্বয়, শ্রীমতী পদ্মমণি ও শ্রীমতী জগদম্বা দাসীই উপস্থিত ছিলেন। শুনিয়াছি, কালীবাটীর দেবোত্তর দানপত্র রাণীর অভিপ্রায়ানুসারে প্রস্তুত হইয়া আসিলে, উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে ঐ সম্পত্তির নিয়োগ-সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বিবাদ বিসম্বাদের পথ এককালে রুদ্ধ করিবার জন্য রাণী নিজ কন্যাদ্বয়কে সম্মতিসূচক অঙ্গীকারপত্রে সহি করিতে বলিয়াছিলেন। কনিষ্ঠা শ্রীমতী জগদম্বা ঐ পত্রে সহি করিয়াছিলেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠা শ্রীমতী পদ্মমণি রাণীর মৃত্যুকালীন অনুরোধেও উহাতে সহি করেন নাই। সেজন্য মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও রাণী শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। অগত্যা, ৺জগদম্বার ইচ্ছায় যাহা হইবার হইবে, ভাবিয়া, রাণী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দেবোত্তর দানপত্রে সহি করিলেন* এবং ঐ কার্য্য সমাধা করিবার পর দিনে, ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রাত্রিকালে শরীরত্যাগ করিয়া ৺দেবীলোকে গমন করিলেন।

শরীর রক্ষা করিবার কালে রাণীর দর্শন।

ঠাকুর বলিতেন, শরীরত্যাগের কিছু দিন পূর্ব্বে রাণী রাসমণি ৺কালীঘাটে আদিগঙ্গাতীরস্থ বাটীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন; এবং দেহরক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বকালে, সম্মুখে অনেকগুলি আলোক জ্বালা

* The Deed of Endowment dated 18th. February 1861 was executed by Rani Rasmani ; she acknowledged her execution of the same before J. F. Watkins, Solicitor, Calcutta. This dedication was accepted as valid by all parties in Alipore Suit No. 72 of 1867, Jadu Nath Chowdhury vs. Puddomoni, and in the High Court Suit No. 308 of 1872 Puddomoni vs. Jagadamba and also when that Suit (No. 308) was revived after contest on 19th. July 1888.

হইয়াছে দেখিয়া, সহসা বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "সরিয়ে দে, সরিয়ে দে, ও সব রোস্‌নাই আর ভাল লাগ্‌ছে না, এখন আমার মা (শ্রীশ্রীজগন্মাতা) আস্‌ছেন, তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় চারিদিক আলোকময় হ'য়ে উঠেছে!" (কিছুক্ষণ পরে) "মা এলে! পদ্ম যে সহি দিলে না—কি হবে মা!"—তাঁহাকে তখন গঙ্গা-গর্ভে আনয়ন করা হইয়াছিল, এবং নিকটেই চতুর্দ্দিকে শিবা-কুলের উচ্চ নিনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছিল! ঐ কথাগুলি বলিয়াই পুণ্যবতী রাণী স্থির শান্তভাবে মাতৃক্রোড়ে মহাসমাধিতে শয়ন করিলেন!

রাণী মৃত্যুকালে যাহা আশঙ্কা করেন তাহাই হইতে বসিয়াছে।

কালীবাটীর দেবোত্তর সম্পত্তি লইয়া রাণী রাসমণির দৌহিত্র-গণের মধ্যে উত্তরকালে যে বহুল বিবাদ-বিসম্বাদ ও মকদ্দমা চলিতেছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়—তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্না রাণী, তাঁহার প্রাণস্বরূপ দেবীসেবার বন্দোবস্ত যথাযথ থাকিবে না বলিয়া, মৃত্যুকালে কেন অত আশঙ্কা করিয়াছিলেন এবং কেনই বা সাংঘাতিক ব্যাধির যন্ত্রণাপেক্ষা ঐ চিন্তার যন্ত্রণা তাঁহার নিকট তীব্রতর বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। আদালতের কাগজপত্রে দেখা যায়, ঐ সকল মোকদ্দমার বহুল ব্যয়ের জন্য ঐ দেবোত্তর সম্পত্তি ঋণগ্রস্ত হইয়া এখনই কিঞ্চিন্ন্যূন লক্ষ মুদ্রায় বাঁধা পড়িয়াছে।* কে বলিবে, রাণী রাসমণির অদ্বিতীয় দৈবকীর্ত্তি ঐ বিবাদের ফলে নাম মাত্রে পর্য্যবসিত এবং ক্রমে লুপ্ত হইবে কি না!

* Debt due on mortgage by the Estate is Rs. 90,000; interest payable quarterly is Rs. 876—0—0; Costs of the Referee already stated amount to Rs. 20,000, as yet untaxed.

মথুর বাবুর সাংসারিক উন্নতি ও দেবসেবার বন্দোবস্ত।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী প্রতিষ্ঠার কালে রাণীর কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুত মথুরানাথ বা মথুরামোহন বিশ্বাস বিষয়-সংক্রান্ত সকল কার্য্য পরিচালনায় তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কালী-বাটীপ্রতিষ্ঠার দিন হইতে তিনি উহার দেবোত্তর সম্পত্তির আয়-ব্যয় বুঝিয়া রাণীর ইচ্ছামত দেবসেবাসংক্রান্ত সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। সুতরাং রাণীর মৃত্যুর পরে তিনিই উহা পূর্ব্বের ন্যায় পরিচালনা করিতে থাকিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পবিত্র জীবন-প্রভাব মথুরামোহনের মনের উপর ইতিপূর্ব্বে অধিকার বিস্তৃত করায়, দক্ষিণেশ্বরের মাতৃসেবা যে, রাণীর মৃত্যুতে কোন অংশে হীনাঙ্গসম্পন্ন হইল না, একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

মথুর বাবুর উন্নতি ও আধিপত্য ঠাকুরকে সহায়তা করিবার জন্য।

ঠাকুরের সহিত মথুরামোহন বা মথুরানাথের বিচিত্র সম্বন্ধের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে অনেকবার বলিয়াছি। অতএব এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে কেবলমাত্র এই কথা বলিলেই চলিবে যে, দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহ ঠাকুরের জীবনে অনুষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে রাণী রাসমণির স্বর্গারোহণ ও কালীবাটীসংক্রান্ত সকল বিষয়ে মথুরামোহনের একাধিপত্য-লাভরূপ ঘটনা উপস্থিত হওয়ায়, বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে সম্যক্ সহায়তা করিবার বিশেষ অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগ-দম্বার অঙ্গুলী-সঙ্কেতে মথুরের এই সময়ে বিষয়াধিকার লাভ ঠাকুরকে সহায়তা করিবার জন্যই কি না, তাহা কে বলিতে পারে? কারণ, দেখা যায়, এখন হইতে আমরণ, মথুরামোহন ঠাকুরের বিশেষভাবে সেবা করিতে আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।

বিষয়াধিকার লাভের পর একাদশ বৎসরেরও অধিক কাল ঐরূপে এক ব্যক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া উচ্চ ভাবাশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করা একমাত্র ঈশ্বরকৃপাতেই সম্ভব হইতে পারে। রাণীর বিপুল বিষয়ে প্রায় একাধিপত্য লাভ করিয়া, মথুরামোহন যে উচ্ছৃঙ্খল ও বিপথগামী না হইয়া ঠাকুরের প্রতি দিন দিন অধিকতর বিশ্বাসসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার বিপুল ভাগ্যের কথা বুঝিতে পারা যায়।

ঠাকুরের সম্বন্ধে ইতর সাধারণের ও মথুরের ধারণা।

ঈশ্বর-সাধক ভিন্ন অন্য কেহ এখনও পর্য্যন্ত ঠাকুরের উচ্চাবস্থা সম্বন্ধে কিছুমাত্র ধারণা করিতে পারে নাই। মানব-সাধারণ তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক উন্মাদ বলিয়া ধারণা করিয়াছিল। কারণ, দেখিয়াছিল, এই ব্যক্তি আপনার হিতাহিত কিছুমাত্র বুঝে না, রূপরসাদি কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হয় না, কখন কাহারও অনিষ্টচেষ্টা করে না এবং আপনাতে আপনি থাকিয়া ইচ্ছামত কখন 'হরি', কখন 'রাম', এবং কখন বা 'কালী' 'কালী, বলিয়া দিন কাটাইয়া দেয়! দেখিয়াছিল, যে, যে রাণী রাসমণির ও মথুব বাবুর কৃপা প্রাপ্ত হইলে লোকে আপন গণ্ডা বেশ গুছাইয়া লয়, ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সুনয়নে পড়িয়াও এ ব্যক্তি আপনার সাংসারিক উন্নতির কিছুই করিয়া লইতে পারে নাই—কখন পারিবে যে, সে সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু সকলে একথা বুঝিয়াছিল যে, সর্ব্বদা অকর্ম্মণ্য হইলেও এই উন্মাদের উজ্জ্বল নয়নে, অদৃষ্টপূর্ব্ব চালচলনে, মধুর কণ্ঠস্বরে, সুললিত বাক্যবিন্যাসে এবং অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এমন একটা কি আকর্ষণ আছে, যাহাতে, তাহারা যে সকল ধনী মানী ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে অগ্রসর হইতেও সঙ্কোচ বোধ করে, সে সকল লোকের সম্মুখে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত

না হইয়া উপস্থিত হইলেও অচিরে এ ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠে! ইতর সাধারণ মানব এবং কালীবাটীর কর্ম্মচারীরা ঐরূপ ভাবিলেও, মথুর বাবু কিন্তু এখন অন্যরূপ ভাবিতেন। হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি—মথুরামোহন বলিতেন, "শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপা হইয়াছে বলিয়াই উঁহার ঐ প্রকার উন্মত্তবৎ ভাব উপস্থিত হইয়াছে।"

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আগমন।

সে যাহা হউক, রাণী রাসমণির মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে ঠাকুরের জীবনে ঐ বৎসর আর একটী বিশেষ ঘটনা সমুপস্থিত হয়। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর পশ্চিম ভাগে গঙ্গাতীরে সুবৃহৎ পোস্তার উপর এইকালে বিচিত্র পুষ্পকানন ছিল। সযত্ন-রক্ষিত ঐ কাননে নানাজাতীয় পুষ্প-সম্ভার মস্তকে বহন করিয়া বৃক্ষলতাদি, তখন চিচিত্র শোভা বিস্তার করিত এবং মধুগন্ধে দিক আমোদিত হইত। শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা না করিলেও, ঠাকুর এই সময়ে নিত্য ঐ কাননে পুষ্পচয়ন করিতেন এবং মাল্য রচনা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে স্বহস্তে সাজাইতেন। ঐ কাননের মধ্যভাগে গঙ্গাগর্ভ হইতে মন্দিরে যাইবার চাঁদনী-শোভিত বিস্তৃত সোপানাবলী এবং উত্তরে, পোস্তার শেষে স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারের জন্য একটী বাঁধা-ঘাট ও কালীবাটীর উত্তরের নহবৎখানা অদ্যাপি বর্ত্তমান। বাঁধা ঘাটটীর উপরে একটী বৃহৎ বকুল বৃক্ষ বিদ্যমান থাকায়, লোকে উহাকে বকুলতলার ঘাট বলিয়া নির্দ্দেশ করিত।

পূর্ব্বোক্ত কাননে ঠাকুর একদিন প্রাতে পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে একখানি নৌকা বকুলতলার ঘাটে আসিয়া লাগিল এবং উহা হইতে গৈরিকবস্ত্র-পরিহিতা, আলুলায়িত-দীর্ঘ-কেশা; ভৈরবীবেশধারিণী এক সুন্দরী রমণী পুস্তকাদির একটী পুঁটুলি হস্তে অবতরণ করিয়া, দক্ষিণের সুবৃহৎ ঘাটের চাঁদনীর

দিকে অগ্রসর হইলেন। যৌবনের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যাভাস তাঁহার শরীরকে তখনও ত্যাগ না করায়, প্রৌঢ়বয়স্কা হইলেও ভৈরবীকে দেখিয়া তাহা কেহই মনে করিতে পারিত না। কিন্তু ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ভৈরবীর বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি হইবে। ভৈরবীর সহিত নিজ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা ঠাকুর প্রথম দর্শনে কতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আপনার লোক দেখিলে লোকে যে বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকে, ভৈরবীকে দেখিয়া তিনি যে উহা অনুভব করিয়াছিলেন, এ কথা সত্য। কারণ ভৈরবীকে দূর হইতে দেখিয়াই ঠাকুর স্বগৃহে ফিরিলেন এবং ভাগিনেয় হৃদয়কে ডাকিয়া চাঁদনী হইতে উক্ত সন্ন্যাসিনীকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। হৃদয় তাঁহার ঐরূপ আদেশ পালনে ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "রমণী অপরিচিতা, ডাকিলেই আসিবে কেন?"—ঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন, "আমার নাম ক'রে বল্‌গে যা, তা হ'লেই আস্‌বে এখন।" হৃদয় বলিত, অপরিচিতা সন্ন্যাসিনীর সহিত আলাপ করিবার জন্য মাতুলের ঐরূপ আগ্রহাতিশয় দেখিয়া সে অবাক্ হইয়াছিল। কারণ, ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে ঐরূপ করিতে সে আর কখনও দেখে নাই।

সে যাহা হউক, উন্মাদ মাতুলের বাক্য অন্যথা করিবার উপায় নাই বুঝিয়া, হৃদয় চাঁদনীতে যাইয়া দেখিল, ভৈরবী ঐ স্থানেই উপবিষ্টা রহিয়াছেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে, তাহার ঈশ্বরভক্ত মাতুল তাঁহার দর্শনলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ঐকথা শুনিয়া ভৈরবী, মনে কোনরূপ দ্বিধা বোধ বা প্রশ্নান্তর না করিয়া, তাহার সহিত আগমনের জন্য উঠিলেন দেখিয়া হৃদয় অধিকতর বিস্মিত হইল।

ঠাকুরের ঘরে আসিয়া ও তাঁহাকে দেখিয়াই ভৈরবী সহসা আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূতা হইলেন এবং বাষ্পবারি মোচন করিতে করিতে বলিয়া উঠিলেন, 'বাবা, তুমি এখানে রয়েছ! তুমি গঙ্গাতীরে আছ জেনে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, এতদিনে দেখা পেলাম্!' ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার কথা কেমন ক'রে জান্‌তে পার্‌লে মা?" ভৈরবী বলিলেন,—'তোমাদের তিন জনের সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে হবে, এ কথা ৺জগদম্বার কৃপায় পূর্ব্বে জান্‌তে পেরেছিলাম। দুই জনের দেখা পূর্ব্ব (বঙ্গ) দেশে পেয়েছি, আজ এখানে তোমার দেখাও পেলাম্!"

প্রথম দর্শনে ভৈরবী ঠাকুরকে যাহা বলেন।

ঠাকুর তখন ভৈরবীর নিকটে উপবিষ্ট হইয়া বালক যেমন জননীর নিকটে সকল কথা সানন্দে বলিতে থাকে সেই ভাবে আপন অদৃষ্টপূর্ব্ব দর্শনের কথা, ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঙ্গে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়া, গাত্রদাহ, নিদ্রাশূন্যতা প্রভৃতি যোগজ শারীরিক বিকারের কথা, লোকে তাঁহাকে যেজন্য উন্মাদ বলিয়া ধারণা করিয়াছে প্রভৃতি সকল কথা—তাঁহাকে মন খুলিয়া বলিতে ও পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"হ্যাঁগা আমার এ সকল কি হয়?—আমি কি সত্যই পাগল হ'লুম?—মাকে (জগদম্বাকে) মনে প্রাণে ডেকে সত্যই কি আমার কঠিন ব্যাধি হ'ল?"—ভৈরবী ঠাকুরের ঐ কথা শুনিতে শুনিতে জননীর ন্যায় কখন উত্তেজিতা, কখন উল্লসিতা; এবং কখন বা করুণার্দ্র-হৃদয়া হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দানের জন্য বারম্বার বলিতে লাগিলেন,—'তোমায় কে পাগল বলে, বাবা? তোমার এ ত পাগলামি নয়; তোমার এ যে মহাভাব হ'য়েছে, তাই ঐরূপ হচ্চে! তোমার যে

ঠাকুর ও ভৈরবীর প্রথমালাপ।

অবস্থা হ'য়েছে, তা কি কাহারও চিনিবার সাধ্য আছে? তাই ঐ প্রকার বলে। ঐ রকম হ'য়েছিল শ্রীমতী রাধারাণীর; ঐ রকম হ'য়েছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর! সে সব কথা ভক্তিশাস্ত্রে আছে। আমার নিকটে এই সব পুঁথি রয়েছে। আমি তোমাকে প'ড়ে শুনাব এবং দেখাব যে, ঈশ্বরকে ঠিক ঠিক যারা ডেকেছে, তাদেরই ঐরূপ অবস্থা সব হয়েছে ও হয়।—ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও নিজ মাতুলকে ঐরূপে পূর্ব্বপরিচিত পরমাত্মীয়ের ন্যায় বাক্যালাপ ও ব্যবহারাদি করিতে দেখিয়া, হৃদয়ের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না!

অনন্তর কথায় কথায় বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া, ঠাকুর দেবীর প্রসাদী ফল, মূল, মাখন, মিছরি প্রভৃতি ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে জলযোগ করিতে দিলেন এবং মাতৃভাবে ভাবিতা ব্রাহ্মণী পুত্রস্বরূপ তাঁহাকে পূর্ব্বে না খাওয়াইয়া জলগ্রহণ করিবেন না বুঝিয়া, স্বয়ং ঐ সকল খাদ্যের কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন। দেবদর্শন ও জলযোগ শেষ হইলে, ব্রাহ্মণী নিজ কণ্ঠগত রঘুবীর শিলার ভোগের জন্য ঠাকুরবাটীর ভাণ্ডার হইতে আটা চাল প্রভৃতি ভিক্ষাস্বরূপে গ্রহণ করিয়া, পঞ্চবটীতলে রন্ধনাদিতে ব্যাপৃতা হইলেন।

অনন্তর রন্ধন শেষ হইলে, ৺রঘুবীরের সম্মুখে খাদ্যাদি রাখিয়া ব্রাহ্মণী নিবেদন করিয়া দিলেন এবং ইষ্টদেবকে চিন্তা করিতে করিতে গভীর ধ্যানে নিমগ্না হইয়া, অভূতপূর্ব্ব দর্শনলাভে সমাধিস্থা হইলেন! তাঁহার দুনয়নে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তিনি বাহ্যজ্ঞান এককালে হারাইয়া ফেলিলেন!

পঞ্চবটীতে ভৈরবীর অপূর্ব্ব দর্শন।

ঠাকুরও ঐ সময়ে পঞ্চবটীতে আসিবার জন্য প্রাণে প্রাণে আকর্ষণানুভব করিয়া, ভাবাবেশে সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায়, কি করিতেছেন সম্যক্ না বুঝিয়া, অপরের

শক্তিবলে প্রযুক্ত নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় ব্রাহ্মণী-নিবেদিত সম্মুখস্থ খাদ্যসকল গ্রহণ করিতে থাকিলেন! কতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐ প্রকার কার্য্যকলাপ দেখিয়া এবং নিজ দর্শনের সহিত উহা মিলাইয়া পাইয়া, বিস্ময়ে আনন্দে কণ্টকিত-কলেবরা হইলেন! আবার কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর যখন সাধারণ জ্ঞানভূমিতে অবরোহণ করিয়া, নিজকৃত কার্য্যের জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিতে লাগিলেন, "কে জানে বাবু, কেন এমন বেসামাল হইয়া এইরূপ কার্য্য সকল করিয়া বসি"—তখন ব্রাহ্মণী জননীর ন্যায় তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, "বেশ করিয়াছ বাবা; ঐ কাজ ত তুমি কর নাই, তোমার ভিতরে যিনি আছেন, তিনিই করিয়াছেন ও করিয়া থাকেন; ধ্যান করিতে করিতে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয় বুঝিয়াছি কে ঐরূপ করিয়াছে এবং কেনই বা করিয়াছে; বুঝিয়াছি যে, আর আমার পূর্ব্বের ন্যায় পূজার আবশ্যকতা নাই, আমার পূজা করা এত-দিনের পরে সার্থক হইয়াছে!"—এই বলিয়া ব্রাহ্মণী মনে কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া, ঠাকুরের ভোজনাবশিষ্ট দেবপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুরের শরীরমনাশ্রয়ে ৺রঘু বীরের জীবন্ত দর্শন স্থায়িভাবে লাভ করিয়া প্রেমগদ্গদ অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় বাষ্পবারি মোচন করিতে করিতে বহুকালের পূজিত রঘুবীর শিলাটীকে সযত্নে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত করিলেন!

প্রথম দর্শনের প্রীতি ও আকর্ষণ ঠাকুর ও ব্রাহ্মণীর মধ্যে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অপত্যপ্রেমে মুগ্ধহৃদয়া

সন্ন্যাসিনী দক্ষিণেশ্বরেই রহিয়া গেলেন। পরস্পরের দর্শন ও আধ্যাত্মিক বাক্যালাপে পঞ্চবটীতে দিনের পর দিন যে কোথা দিয়া যাইতে লাগিল, তদ্বিষয় উভয়ের মধ্যে কাহারও অনুভবে আসিল না! ঠাকুর নিজ আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থা সম্বন্ধীয় রহস্য কথাসকল অকপটে ব্রাহ্মণী মাতাকে বলিয়া সর্ব্বদা নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং ভৈরবী ব্রাহ্মণী, নানা তন্ত্র-গ্রন্থসমূহ হইতে ঐ সকলের সমাধান করিয়া এবং কখন বা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি ভক্তিগ্রন্থসমূহ হইতে অবতার পুরুষদের দেহমনে ঈশ্বরপ্রেমের প্রবল বেগ কিরূপ লক্ষণসকলের আবির্ভাব করে, তদ্বিষয় পাঠ করিয়া শুনাইয়া, ঠাকুরের সংশয়-সকল ছিন্ন করিতে লাগিলেন। পঞ্চবটীতে ঐরূপে দিব্যানন্দের প্রবাহ ছুটিল।

পঞ্চবটীতে শাস্ত্রপ্রসঙ্গ।

ছয় সাত দিন ঐরূপে কাটিবার পর, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ঠাকুরের মনে হইল, দোষসম্পর্ক না থাকিলেও, ব্রাহ্মণীকে এখানে রাখা ভাল হইতেছে না। কাম-কাঞ্চনাসক্ত সংসারী মানব বুঝিতে না পারিয়া পবিত্রা রমণীর চরিত্র-সম্বন্ধে নানা কথা রটনার অবসর পাইবে। মনে ঐ কথার উদয় হইবামাত্র তিনি ব্রাহ্মণীকে উহা ইঙ্গিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণীও মনে মনে উহার যাথার্থ্য অনুধাবন করিলেন এবং নিকটেই গ্রামমধ্যে কোন স্থানে থাকিয়া, প্রতিদিন দিবসে কিছুকালের জন্য আসিয়া ঠাকুরের সহিত দেখা করিয়া যাইবার সংকল্প স্থির করিয়া, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী পরিত্যাগ করিলেন।

ভৈরবীর দেব মণ্ডলের ঘাটে অবস্থানের কারণ।

কালীবাটীর অনতিদূরে উত্তরে ভাগীরথীতীরে দক্ষিণেশ্বর

গ্রামের মধ্যে দেব মণ্ডলের ঘাট—ব্রাহ্মণী এইস্থানে আসিয়া আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করিলেন * এবং গ্রামমধ্যে যথাতথা পরিভ্রমণ করিয়া, নিজগুণে গ্রামস্থ রমণীগণের শীঘ্রই প্রিয় হইয়া উঠিলেন। সুতরাং বাসস্থান ও ভিক্ষা কোন বিষয়ের জন্য এখানে তাঁহার অসুবিধা রহিল না এবং লোকনিন্দার ভয়ে ঠাকুরের পবিত্র দর্শনলাভে তাঁহাকে একদিনের জন্যও বঞ্চিত হইতে হইল না। তিনি প্রতিদিন কিয়ৎকালের জন্য কালী-বাটীতে আসিয়া ঠাকুরের সহিত পূর্ব্বের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিয়া যাইতে লাগিলেন এবং গ্রামস্থ পরিচিত রমণীকুলের নিকট হইতে নানাপ্রকার খাদ্যাদি ভিক্ষা করিয়া আনয়ন করিয়া, ঠাকুরকে ভোজন করাইতে লাগিলেন।†

ঠাকুরকে ভৈরবীর অবতার বলিয়া ধারণা কিরূপে হয়।

ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অনুভব, দর্শন ও অবস্থাদির কথা শুনিয়া, সাধিকা ব্রাহ্মণীর নিশ্চিত ধারণা হইল,—ঐ সকল, অসাধারণ ঈশ্বরপ্রেম হইতে উপস্থিত হইয়াছে। আবার, ঈশ্বরালাপে ঠাকুরের মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধিতে বাহ্যচৈতন্যের লোপ ও কীর্ত্তনে পরমানন্দ দেখিয়া, তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল—ইনিসামান্য সাধক নহেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবতাদি

---

* হৃদয় বলিতেন, দেব মণ্ডলের ঘাটে থাকিবার পরামর্শ ঠাকুরই ব্রাহ্মণীকে প্রদান করিয়া, তাঁহাকে মণ্ডলদের বাটী পাঠাইয়া দেন এবং তথায় যাইবামাত্র ৺নবীনচন্দ্র নিয়োগীর ধর্ম্মপরায়ণা পত্নী তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, কেবলমাত্র ঐ ঘাটের ঘরে যতকাল ইচ্ছা থাকিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন নাই, কিন্তু একখানি তক্তা-পোষ, এক মণ চাল, ডাল, ঘী ও অন্যান্য ভোজনসামগ্রীও তৎসহ প্রদান করিয়াছিলেন।

† গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৮ম অধ্যায়, ২৩১ পৃষ্ঠা হইতে ২৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

গ্রন্থের স্থলে স্থলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবোদ্ধারের নিমিত্ত পুনরায় শরীর ধারণ করিয়া আগমনের কথার যে সকল ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়, ঠাকুরকে দেখিয়া ব্রাহ্মণীর স্মৃতিপথে সেই সকল কথা পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে লাগিল। সুপণ্ডিতা ব্রাহ্মণী, ঐ সকল গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের চালচলন আচার-ব্যবহারাদি সম্বন্ধে যে সকল বিশেষ কথালিপিবদ্ধ দেখিয়াছিলেন, সে সকলের সহিত ঠাকুরের চালচলনাদি তন্ন তন্ন করিয়া মিলাইয়া উহাদের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় ভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া অপরের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিবার শক্তি ঠাকুরে প্রকাশিত দেখিলেন। আবার, ঈশ্বরবিরহবিধুর শ্রীচৈতন্যদেবের নিরন্তর গাত্রদাহ, স্রক্‌চন্দনাদি যে সকল পদার্থের ব্যবহারে প্রশমিত হইবার কথা গ্রন্থনিবদ্ধ আছে, ঠাকুরের গাত্রদাহ প্রশমনের জন্য তিনি ঐ সকলের প্রয়োগ করিয়া তদ্রূপ ফল পাইলেন।* সুতরাং পঞ্চবটীতে ব্রাহ্মণীর শ্রীরামকৃষ্ণদেবসম্বন্ধীয় প্রথম দিনের দিব্যদর্শন, পূর্ব্বোক্ত কথা সকলের সহিত একযোগে সমুদিত হইয়া, তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা করাইয়া দিল, ঠাকুরের শরীরমনাশ্রয়ে এ যুগে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ দেব উভয়ে ঈশ্বপ্রেম প্রচার করিয়া জীবোদ্ধারের নিমিত্ত পুনরাগমন করিয়াছেন! সিহড় গ্রামে যাইবার কালে, ঠাকুর নিজ দেহাভ্যন্তর হইতে কিশোরবয়স্ক দুই জনকে বাহিরে আবির্ভূত হইতে দেখিয়াছিলেন—একথা আমরা পাঠককে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি—ব্রাহ্মণী এখন ঐ দর্শনের কথা ঠাকুরের মুখে শ্রবণ করিয়া, শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধীয় নিজ মীমাংসায়

---

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায়, ৪—৬ পৃষ্ঠা।

দৃঢ়তর বিশ্বাসবতী হইলেন এবং বলিলেন, "এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব!"

সন্ন্যাসিনী ব্রাহ্মণী সংসারে কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করিতেন না; শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধীয় নিজ মীমাংসা অপরের নিকট প্রকাশে নিন্দা বা উপহাসভাগিনী হইবার শঙ্কাও রাখিতেন না। সুতরাং আপন মীমাংসা প্রথমে ঠাকুর ও হৃদয়ের নিকটে এবং পরে জিজ্ঞাসিতা হইলে অপর সকলের নিকটে বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা হইতেন না। শুনিয়াছি এই সময়ে একদিন ঠাকুর পঞ্চবটীতলে মথুর বাবুর সহিত বসিয়া ছিলেন। হৃদয়ও তাঁহাদের নিকটে ছিল। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর, তাঁহার সম্বন্ধে ব্রাহ্মণী যে মীমাংসায় উপনীতা হইয়াছেন, তাহা মথুরামোহনকে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "সে বলে যে, অবতারদিগের যে সকল লক্ষণ থাকে, তাহা এই শরীর-মনে আছে!* তার অনেক শাস্ত্র দেখা আছে, কাছে অনেক পুঁথিও আছে।" মথুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে যাই বলুক্ না বাবা, অবতার ত আর দশটীর অধিক নাই? সুতরাং তার কথা সত্য হবে কেমন ক'রে? তবে, আপনার উপর মা কালীর কৃপা হয়েছে, একথা সত্য।"

মথুরের সম্মুখে ভৈরবীর ঠাকুরকে অবতার বলা।

তাঁহারা ঐরূপে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক সন্ন্যাসিনী তাঁহাদের অভিমুখে আগমন করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন এবং মথুর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনিই কি তিনি?" ঠাকুর স্বীকার করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন—ব্রাহ্মণী

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায়, ৪—৬ পৃষ্ঠা।

কোথা হইতে এক থাল মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নন্দরাণী যশোদা যে ভাবে গোপালকে খাওয়াইতে সপ্রেমে অগ্রসর হইতেন, সেই ভাবে ভাবাবিষ্টা হইয়া, তাঁহাদিগের দিকে অন্যমনে চলিয়া আসিতেছেন। নিকটে আসিয়া মথুর বাবুকে দেখিতে পাইয়া তিনি সযত্নে আপনাকে সংযতা করিলেন এবং ঠাকুরকে খাওয়াইবার নিমিত্ত হৃদয়ের হস্তে মিষ্টান্নথালটী প্রদান করিলেন। তখন মথুর বাবুকে দেখাইয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন "ওগো! তুমি আমাকে যা বল, সে সব কথা আজ ইঁহাকে বল্‌ছিলাম, তা ইনি বল্‌ছেন্ 'অবতার ত দশটী ছাড়া আর নাই'।" মথুরানাথও ইত্যবসরে সন্ন্যাসিনীকে অভিবাদন করিলেন এবং তিনি সত্যই যে ঐরূপ আপত্তি করিতেছিলেন, তদ্বিষয় অঙ্গীকার করিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া উত্তর করিলেন, "কেন? শ্রীমদ্ভাগবত চব্বিশটী প্রধান প্রধান অবতারের কথা বলিয়া, পরে অসংখ্য অবতারের কথা বলিয়াছেন ত? তা ছাড়া বৈষ্ণব-দিগের গ্রন্থে মহাপ্রভুর পুনরাগমনের কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং শ্রীচৈতন্যের সহিত (শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখাইয়া) ইঁহার প্রধান প্রধান সকল বিষয়ের বিশেষ সৌসাদৃশ্য মিলাইয়া পাওয়া যায়।" ব্রাহ্মণী ঐরূপে নিজপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন, শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের গ্রন্থে সুপণ্ডিত কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাকে ঐ বিষয় সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে! ঐরূপ ব্যক্তির নিকটে তিনি নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে সম্মতা আছেন। ব্রাহ্মণীর ঐ কথার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া, মথুরামোহন নীরব রহিলেন।

ঠাকুরের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণীর অপূর্ব্ব ধারণা ক্রমে কালীবাটীর ছোট বড় সকল মানবই জানিতে পারিল এবং উহা তাহাদের

পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেশ্বরে আগমন কারণ।

মধ্যে একটা বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করিল। ঐ আন্দোলনের ফলাফল আমরা অন্যত্র সবিস্তার লিপিবদ্ধ করিয়াছি।* সুতরাং এখানে কেবলমাত্র এই কথা বলিলেই চলিবে যে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঐরূপে ঠাকুরকে সহসা দেব-পদবীতে আরূঢ় করাইয়া, সকলের সমক্ষে তাঁহাকে দেবতার সম্মান প্রদান করিলেও, অহঙ্কার-প্রবৃদ্ধ হইয়া ঠাকুরের মনে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষসকলে ব্রাহ্মণীর সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া কিরূপ মতামত প্রদান করেন তাহা জানিতে তিনি উৎসুক হইয়াছিলেন এবং বালকের ন্যায় মথুরামোহনকে ঐরূপ পুরুষসকলকে আনাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঐ অনুরোধের ফলেই পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন হইয়াছিল। বৈষ্ণবচরণের সহিত সম্মিলনে ব্রাহ্মণী কিরূপে নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহাকে নিজ মতে আনয়ন করিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।†

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৫ম অধ্যায়, ১৫৩—১৫৫ পৃষ্ঠা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৭১—১৭৩ পৃষ্ঠা ও উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায় দেখ।

† গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায়, ১৯—২০ পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়।

ঠাকুরের তন্ত্রসাধন।

সাধন প্রসূত দিব্যদৃষ্টি ব্রাহ্মণীকে ঠাকুরের অবস্থা যথাযথরূপে বুঝাইয়াছিল।

কেবলমাত্র তর্কযুক্তি-সহায়েই যে, ব্রাহ্মণী, ঠাকুরের অলৌকিকত্ববিষয়ক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীতা হইয়াছিলেন, তাহা নহে। পাঠকের স্মরণ থাকিবে, ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রমুখ তিন ব্যক্তির সহিত দেখা করিয়া, তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক-জীবন-বিকাশে তাঁহাকে সহায়তা করিতে হইবে। ঠাকুরকে দর্শন করিবার বহুপূর্ব্বে ব্রাহ্মণী, শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট হইতে ঐরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝিতে পায়া যায়, সাধনপ্রসূত দিব্যদৃষ্টিই তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়ন ও ঠাকুরকে বুঝিতে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল। ঠাকুরের দর্শনলাভের পর এখন যত দিন যাইতে লাগিল এবং ঠাকুরের সহিত তিনি যত ঘনিষ্ট সম্বন্ধে সম্বদ্ধা হইতে লাগিলেন, সাধনপথে ঠাকুরকে কতদূর কি ভাবে সহায়তা করিতে হইবে, তদ্বিষয় ততই তাঁহার মনে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অতএব ঠাকুরের সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রমধারণা দূর করিবার চেষ্টাতেই তিনি যে এখন কেবলমাত্র কালক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা নহে; কিন্তু ঠাকুর যাহাতে শাস্ত্রপথাবলম্বনে সাধনক্রিয়া সকলের যথাযথ অনুষ্ঠান করিয়া

শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণ দর্শন লাভ করিতে পারেন এবং তাঁহার পূর্ণ কৃপা ও প্রসন্নতার অধিকারী হইয়া স্বস্বরূপে, নিজ দিব্যশক্তিতে অবিচলিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হইলেন।

ঠাকুরকে ব্রাহ্মণীর তন্ত্র সাধন করিতে বলিবার কারণ।

ঠাকুরকে দেখিয়া এবং তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, বিশিষ্টা সাধিকা ব্রাহ্মণীর একথা বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, গুরু-পরম্পরাগত সাধনপথ সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন না করিয়া, কেবল-মাত্র নিজ অসাধারণ অনুরাগ-সহায়ে শ্রীশ্রীজগ-দম্বার দর্শনলাভে এ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়াই, ঠাকুর নিজ অবস্থা সম্বন্ধে সংশয়ের হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারিতেছেন না। সেজন্যই মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে উদয় হইতেছে যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতার যে সকল দর্শন এ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন, তাহা নিজ মস্তিস্ক-বিকৃতিরফল কি না, এবং তাঁহার অপূর্ব্ব শারীরিক ও মানসিক বিকারসকল কোনরূপ উৎকট ব্যাধির লক্ষণ কি না। পূর্ব্বোক্ত বিষয় অনু-ধাবন করিয়া ব্রাহ্মণী এখন ঠাকুরকে তন্ত্রোক্ত সাধনমার্গাবলম্বনে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী বুঝিয়াছিলেন, ঠাকুর, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধকগণানুষ্ঠিত মার্গে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহাদিগের অনুরূপ আধ্যাত্মিক অবস্থাসকল প্রত্যক্ষ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, ঐ সকল অবস্থা ব্যাধিপ্রসূত নহে। সাধক যেরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন, তন্ত্রে তদ্বিষয় পূর্ব্ব হইতে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইয়া এবং ঐরূপ অনুষ্ঠান-সহায়ে স্বয়ং ঐরূপ ফল-সমূহ লাভ করিয়া তাঁহার মনে এ কথার দৃঢ় প্রতীতি হইবে যে, সাধনা সহায়ে মানব অন্তঃরাজ্যের উচ্চ—উচ্চতর ভূমিসমূহে আরোহণ করিয়া অসাধারণ প্রত্যক্ষসকল করিয়া থাকে এবং তাঁহার অনন্যসাধারণ শারীরিক ও মানসিক অবস্থাসমূহ ঐরূপেই

উপস্থিত হইয়াছে। ফলে দাঁড়াইবে এই যে, ঠাকুরের জীবনে ভবিষ্যতে যেরূপ অসাধারণ প্রত্যক্ষসকল উপস্থিত হউক না কেন, তিনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, ঐ সকলকে সত্য জানিয়া, নিশ্চিন্তমনে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। ব্রাহ্মণী জানিতেন, শাস্ত্র ঐজন্য সাধককে গুরুবাক্য ও শাস্ত্র-বাক্যের সহিত নিজ জীবনের অনুভবসকলকে সর্ব্বদা মিলাইয়া অনুরূপ হইল কি না, দেখিতে বলিয়াছেন।

অবতার বলিয়া বুঝিয়াও ব্রাহ্মণী কিরূপে ঠাকুরকে সাধনায় সহায়তা করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ঠাকুরকে অবতার মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিয়া, ব্রাহ্মণী কোন্ যুক্তিবলে আবার তাঁহাকে সাধন করাইতে উদ্যতা হইলেন? অবতার-মহিমা যিনি বুঝেন, তিনি ত ঐরূপ পুরুষকে পূর্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সাধনাদি চেষ্টার অনাবশ্যকতা সর্ব্বথা স্বীকার করেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে, ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐ প্রকার মহিমা বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ব্রাহ্মণীর মনে সর্ব্বদা সমুদিত থাকিলে, তাঁহার মানসিক ভাব নিশ্চয় ঐরূপ হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম দর্শন হইতে ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে অপত্যনির্ব্বিশেষে ভালবাসিয়াছিলেন। এবং ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ভুলাইয়া অপরের কল্যাণ-চেষ্টায় নিযুক্ত করিতে ভালবাসার ন্যায় দ্বিতীয় পদার্থ সংসারে আর নাই! অতএব অকৃত্রিম ভালবাসার প্রেরণাতেই তিনি ঠাকুরকে সাধনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, একথা স্পষ্ট দেব-মানব, অবতার-পুরুষসকলের সম্বন্ধে আমরা সর্ব্বত্র ঐরূপ হইতে দেখিতে পাই। দেখিতে পাই যে, তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ব্যক্তিসকল তাঁহাদিগের অলৌকিক আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সময়ে সময়ে স্তম্ভিত হইলেও,

পরক্ষণেই উহা ভুলিয়া তাঁহাদিগের প্রেমাকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাদিগকে হৃদয়ের ভালবাসা অর্পণমাত্র করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছেন! অতএব ঠাকুরের অলৌকিক ভাবাবেশ ও শক্তি-প্রকাশ দেখিয়া ব্রাহ্মণী সময়ে সময়ে স্তম্ভিতা হইলেও, তাঁহার প্রতি ঠাকুরের অকৃত্রিম মাতৃজ্ঞান, নির্ভরতা এবং বিশ্বাস যে তাঁহার হৃদয়নিহিত কোমল-কঠোর মাতৃস্নেহকে সর্ব্বদা উদ্বেলিত করিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিত এবং ঠাকুরকে বিন্দুমাত্র সুখী করিবার জন্য অশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে, অপরের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে, ও সাধনায় সহায়তা করিতে তাঁহাকে সর্ব্বথা নিযুক্ত করিত, একথা বলা বাহুল্য।

বিশিষ্ট অধিকারীকে শিক্ষাদানের সুযোগ উপস্থিত হইলে, গুরুর হৃদয়ে পরম পরিতৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদের স্বতঃ উদয় হয়। আধ্যাত্মিক জগতে, বর্ত্তমানকালে ঠাকুরের ন্যায় উত্তমাধি-কারী যে জন্মিতে পারে, ব্রাহ্মণী একথা পূর্ব্বে কখন স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। সুতরাং ঠাকুরকে শিক্ষাদানের অবসরপ্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণীর হৃদয় কিরূপ আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল, তাহা আমরা বিলক্ষণ অনুমান করিতে পারি। তাহার উপর ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম পুত্র-বাৎসল্য। অতএব এ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণী যে, নিজ স্বাধ্যায় ও তপস্যার সমগ্র ফল স্বল্পকালের মধ্যে ঠাকুরকে অনুভব করাইয়া দিবার জন্য ব্যগ্রা হইয়া উঠিবেন, ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই।

ঠাকুরকে ব্রাহ্মণীর সর্ব্ব তপস্যার ফলপ্রদানের জন্য ব্যস্ততা।

তন্ত্রোক্ত সাধন সকল অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে ঠাকুর ঐ বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে যে, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুমতি লাভ করিয়াই যে, উহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন —একথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখে কখন কখন শ্রবণ করিয়াছি।

৺জগদম্বার অনুজ্ঞা লাভে ঠাকুরের তন্ত্র সাধনের অনুষ্ঠান তাঁহার সাধনাগ্রহের পরিমাণ।

অতএব কেবলমাত্র ব্রাহ্মণীর আগ্রহ ও উত্তেজনা তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নিযুক্ত করে নাই; সাধনপ্রসূত তাঁহার নিজ দিব্যদৃষ্টি তাঁহাকে প্রাণে প্রাণে বলিয়া দিয়াছিল—শাস্ত্রীয় প্রণালীসকলের অবলম্বনে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ঠাকুরের একনিষ্ঠ মন এখন ব্রাহ্মণী-নির্দ্দিষ্ট সাধন-পথে পূর্ণাগ্রহে ধাবিত হইল। সে আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতা অনুভব করা আমাদিগের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির সম্ভবপর নহে। কারণ, নানাদিকে নানা বিষয়ে প্রসারিত আমাদিগের মনের সে উপরতি ও একলক্ষ্যতা কোথায়?—অন্তঃসমুদ্রের উপরিগত ঊর্ম্মিমালার রঙ্গভঙ্গে মোহিত হইয়া না থাকিয়া, উহার তলস্পর্শ করিবার জন্য এককালে হাত পা ছাড়িয়া ঝম্প প্রদানের অসীম সাহস আমাদিগের কোথায়?—'একেবারে ডুবে যা, আপনাতে আপনি ডুবে যা' বলিয়া, ঠাকুর আমাদিগকে বারম্বার যে ভাবে উত্তেজিত করিতেন, সেইভাবে জগতের সকল পদার্থ এবং নিজ শরীরের মায়া মমতা পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন করিয়া আধ্যাত্মিক অন্তররাজ্যে ডুবিয়া যাইবার আমাদিগের সামর্থ্য কোথায়? আমরা যখন শুনি, ঠাকুর হৃদয়ের অসহ্য যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া 'মা দেখা দে' বলিয়া পঞ্চবটীমূলে গঙ্গাসৈকতে মুখঘর্ষণ করিতেন এবং দিনের পর দিন চলিয়া যাইলেও তাঁহার ঐভাবের বিরাম হইত না—তখন কথাগুলি কর্ণে প্রবিষ্ট হয় মাত্র, হৃদয়ে অনুরূপ ঝঙ্কারের কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না! হইবেই বা কেন? শ্রীশ্রীজগন্মাতা যে যথার্থই আছেন এবং সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া ব্যাকুল-হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিলে, তাঁহার দর্শনলাভ যে যথার্থই সম্ভবপর—একথায় কি আমরা ঠাকুরের ন্যায় সরলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি?

সাধনকালে নিজ মানসিক আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতার কিঞ্চিৎ আভাস ঠাকুর আমাদিগকে একদিন কাশীপুরে অবস্থানকালে প্রদান করিয়া স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। তৎকালে আমরা যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহার ছায়ামাত্র পাঠককে প্রদানে সমর্থ হইব কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু কথাটীর এখানে উল্লেখ করিব ঃ—

ঈশ্বরলাভের জন্য স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের আকুল আগ্রহ তখন আমরা কাশীপুরে স্বচক্ষে দর্শন করিতেছিলাম। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নির্দ্ধারিত টাকা (ফি) জমা দিতে যাইয়া, কেমন করিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, উহার প্রেরণায় অস্থির হইয়া কেমন করিয়া তিনি একবস্ত্রে নগ্নপদে জ্ঞানশূন্যের ন্যায় সহরের রাস্তা দিয়া ছুটিয়া কাশীপুরে শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় নিজ মনোবেদনা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার কৃপালাভ করিলেন, ঐ সময় হইতে কেমন করিয়া প্রায় আহার-নিদ্রা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া তিনি দিবা-রাত্র ধ্যান জপ ভজন ও ঈশ্বরচর্চ্চায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অসীম সাধনোৎসাহে কেমন করিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় তখন বজ্র-কঠোরভাবাপন্ন হইয়া নিজ মাতা ও ভ্রাতৃবর্গের অশেষ কষ্টে এককালে উদাসীন হইয়া রহিল, এবং কেমন করিয়া শ্রীগুরুপ্রদর্শিত সাধনপথে দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইয়া তিনি দর্শনের পর দর্শন লাভ করিতে করিতে তিন চারি মাসের অন্তেই নির্ব্বিকল্প সমাধিসুখ প্রথম অনুভব করিলেন—ঐ সকল বিষয় তখন আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত হইয়া আমাদিগকে এককালে স্তম্ভিত করিতেছিল। ঠাকুর তখন স্বামিজীর ঐরূপ অপূর্ব্ব অনুরাগ, ব্যাকুলতা ও পরমানন্দে

কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর নিজ সাধনকালের আগ্রহসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন।

সাধনোৎসাহের নিত্য ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিলেন। ঐ সময়ে একদিন, ঠাকুর নিজ অনুরাগ ও সাধনোৎসাহের সহিত স্বামিজীর ঐ বিষয়ের তুলনা করিয়া ঐ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—"নরেন্দ্রের অনুরাগোৎসাহ অতি অদ্ভুত, কিন্তু (আপনাকে দেখাইয়া) এখানে তখন (সাধনকালে) উহাদের যে তোড় আসিয়াছিল, তাহার তুলনায় ইহা যৎসামান্য—ইহা তাহার সিকিও হইবে না!"—ঠাকুরের ঐ কথায় আমাদিগের মনে কীদৃশ ভাবের উদয় হইয়াছিল, হে পাঠক, পার ত কল্পনাসহায়ে তাহা অনুভব কর।

সে যাহা হউক, শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে ঠাকুর এখন সকল ভুলিয়া সাধনায় মগ্ন হইলেন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্না কর্ম্মকুশলা ব্রাহ্মণী নানা দেশ হইতে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়োপযোগী পদার্থ-সকলের সংগ্রহে এবং সাধনকালে উহাদিগের প্রয়োগসম্বন্ধে উপদেশাদি প্রদান করিয়া ঠাকুরকে সহায়তা করিতে অশেষ আয়াস স্বীকার করিতে লাগিলেন। মনুষ্যপ্রমুখ পঞ্চজীবের মস্তক-কঙ্কাল * গঙ্গাহীন প্রদেশ হইতে সযত্নে সমাহৃত হইয়া,

---

* ইদানীং শৃনু দেবেশি মুণ্ডসাধনমুত্তমং।
যৎ কৃত্বা সাধকো যাতি মহাদেব্যাঃ পরং পদং॥ ৫১
নর-মহিষ-মার্জ্জার-মুণ্ডত্রয়ং বরাননে।
অথবা পরমেশানি নৃমুণ্ডত্রয়মাদরাৎ॥ ৫২
শিবাসর্পসারমেয়বৃষভানাং মহেশ্বরি।
নরমুণ্ডং তথা মধ্যে পঞ্চমুণ্ডানি হীরিতঃ॥ ৫৩
অথবা পরমেশানি নরানাং পঞ্চমুণ্ডকান্।
তথা শতং সহস্রং বাযুতং লক্ষং তথৈবচ॥ ৫৪
নিযুতঞ্চাথবা কোটিং নৃমুণ্ডান্ পরমেশ্বরি।
নরমুণ্ডং স্থাপয়িত্বা প্রোথয়িত্বা ধরাতলে॥ ৫৫
বিতস্তিপ্রমিতাং বেদীং তস্যোপরি প্রকল্পয়েৎ।
আয়ামপ্রস্থতো দেবি চতুর্হস্তৌ সমাচরেৎ॥ ৫৬

যোগিনী তন্ত্রম্-পঞ্চমঃ পটলঃ।

ঠাকুরবাটীর উদ্যানের উত্তরসীমাপ্রান্তে অবস্থিত বিল্বতরুমূলে এবং ঠাকুরের স্বহস্ত-প্রোথিত পঞ্চবটীতলে সাধনানুকূল দুইটী বেদিকা* নির্ম্মিত হইল এবং প্রয়োজনমত ঐ মুণ্ডাসনদ্বয়ের অন্যতমের উপরে উপবিষ্ট হইয়া জপ পুরশ্চরণ ও ধ্যানাদিতে ঠাকুরের কাল কাটিতে লাগিল। দিবারাত্র, কয়েক মাস কোথা দিয়া কিরূপে আসিতে ও যাইতে লাগিল, তাহা এই অদ্ভুত সাধকেরও উত্তরসাধিকার জ্ঞান রহিল না। ঠাকুর বলিতেন†—"ব্রাহ্মণী দিবাভাগে কালীবাটীর উদ্যান হইতে বহু-দূরে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট নানা দুষ্প্রাপ্য পদার্থসকল সংগ্রহ করিত এবং রাত্রিকালে ঐ সকল বিল্বমূলে বা পঞ্চবটীতলে আনয়ন করতঃ আমাকে আহ্বান করিত, এবং ঐ সকলের সহায়ে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়া,

পঞ্চমুণ্ডী আসন নির্ম্মাণ ও চৌষট্টি খানা তন্ত্রের সকল সাধনের অনুষ্ঠান।

---

* সচরাচর পঞ্চমুণ্ডসংযুক্ত একটী বেদিকা নির্ম্মাণ করিয়া সাধকেরা তদাশ্রয়ে জপ ধ্যানাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ঠাকুর কিন্তু দুইটী মুণ্ডাসনের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বিল্বমূলের বেদিকার নিম্নে তিনটী নরমুণ্ড প্রোথিত ছিল এবং পঞ্চবটীতলস্থ বেদিকায় পঞ্চপ্রকার জীবের পাঁচটী মুণ্ড প্রোথিত ছিল। সাধনায় সিদ্ধ হইবার কিছুকাল পরে তিনি ঐ মুণ্ড সকলকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আসনদ্বয় ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন। সাধনায় ত্রিমুণ্ডাসনের প্রশস্ততার জন্য হউক অথবা বিল্বমূল তৎকালে এককালে নির্জ্জন ছিল বলিয়া, সাধনসকল অনুষ্ঠানের তথায় অধিকতর সুবিধা হইবে বলিয়াই হউক ঐরূপে দুইটী আসন নির্ম্মিত হইয়াছিল। অথবা, বিল্বমূলের সন্নিকটে কোম্পানির বারুদখানা বিদ্যমান থাকায়, হোমাদির জন্য তথায় সর্ব্বদা অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার অসুবিধার জন্য দুইটী মুণ্ডাসন নির্ম্মিত হইয়াছিল।

† ঠাকুরের শ্রীমুখে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যাহা শুনা গিয়াছে, তাহাই এখানে সম্বদ্ধভাবে দেওয়া গেল।

জপ ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিত। আমিও তদ্রূপ অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতাম, কিন্তু জপ আর বড় একটা করিতে হইত না, একবার মালা ফিরাইতে না ফিরাইতে একেবারে সমাধিমগ্ন হইয়া ঐ ক্রিয়াসকলের ফল যথাযথ প্রত্যক্ষ করিতাম! ঐরূপে এই কালে দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর অনুভব, অদ্ভুত অদ্ভুত সব, কতই যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই! প্রধান চৌষট্টিখানা তন্ত্রে যত কিছু সাধনের কথা আছে, সকলগুলিই ব্রাহ্মণী একে একে অনুষ্ঠান করাইয়াছিল! কঠিন কঠিন সব সাধন!—যাহা করিতে যাইয়া অধিকাংশ সাধক পথভ্রষ্ট হয়—মার (শ্রীশ্রীজগদম্বার) কৃপায় সে সকলে উত্তীর্ণ হইয়াছি!

স্ত্রীমূর্ত্তিতে দেবীজ্ঞান-সিদ্ধি।

"একদিন দেখি কি,—কোথা হইতে ব্রাহ্মণী নিশাভাগে এক পূর্ণযৌবনা সুন্দরী রমণীকে ডাকিয়া আনিয়াছে এবং আমাকে আহ্বান করিয়া বলিতেছে, 'বাবা, ইহাকে দেবীবুদ্ধিতে পূজা কর!' পরে পূজা সাঙ্গ হইলে, রমণীকে বিবস্ত্রা করিয়া বলিল, 'বাবা, ইহার ক্রোড়ে বসিয়া জপ কর!'—তখন আতঙ্কে অস্থির হইয়া ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে মাকে বলিতে লাগিলাম, 'মা, জগদম্বে তোর একান্ত শরণাগতকে এ কি আদেশ করিতেছিস্? তোর দুর্ব্বল সন্তানের ঐরূপ দুঃসাহসের সামর্থ্য কোথায়?'—ঐরূপ বলিবামাত্র কিন্তু কাহার দ্বারা যেন আবিষ্ট হইলাম এবং কোথা হইতে অপূর্ব্ব বলে হৃদয় এককালে পূর্ণ হইল! তখন নিদ্রিতের ন্যায়, কি করিতেছি সম্যক্ না জানিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে রমণীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইবামাত্র সমাধিস্থ হইয়া পড়িলাম! যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখি,

ব্রাহ্মণী চৈতন্য সম্পাদনের জন্য সযত্নে শুশ্রূষা করিতেছে এবং বলিতেছে, 'ক্রিয়া পূর্ণ হইয়াছে বাবা; অপরে কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ঐ অবস্থায় কিছুকাল জপমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তুমি এককালে শরীরবোধশূন্য হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছ!'—শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়া ঐ কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করার জন্য মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে বারম্বার প্রণাম করিতে লাগিলাম!

"আর একদিন দেখি, ব্রাহ্মণী শবের খর্পরে মৎস্য রাঁধিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার তর্পণ করিল এবং আমাকেও ঐরূপ করাইয়া উহা গ্রহণ করিতে বলিল! তাহার আদেশে তাহাই করিলাম, মনে কোনরূপ ঘৃণার উদয় হইল না।

"কিন্তু যে দিন সে (ব্রাহ্মণী) গলিত আম-মহামাংস-খণ্ড আনিয়া তর্পণান্তে উহা জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করিতে বলিল, সে দিন ঘৃণায় বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'তা কি কখন করা যায়?'—শুনিয়া সে বলিল, 'সে কি বাবা, এই দেখ আমি করিতেছি!'—বলিয়াই সে উহা নিজ মুখে গ্রহণ করিয়া 'ঘৃণা করিতে নাই' বলিয়া, পুনরায় উহার কিয়দংশ আমার সম্মুখে ধারণ করিল। তাহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রচণ্ড চণ্ডিকা-মূর্ত্তির উদ্দীপনা হইয়া গেল এবং 'মা' 'মা' বলিতে বলিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। তখন ব্রাহ্মণী উহা মুখে প্রদান করিলেও, ঘৃণার উদয় হইল না।

ঘৃণাত্যাগ।

"ঐরূপে পূর্ণাভিষেক গ্রহণ করাইয়া অবধি ব্রাহ্মণী নিত্য কতই যে তান্ত্রিকী ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠান করাইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। সকল কথা সকল সময়ে এখন স্মরণে আসে না।

তবে মনে আছে, মার কৃপায় প্রণয়ি-যুগলের চরমানন্দ যে দিন দিব্য দৃষ্টিতে দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম এবং তাহাদিগের ঐরূপ ক্রিয়াদর্শনে সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধির বিন্দুমাত্র উদয় না হইয়া কেবল মাত্র ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপনায় যে দিন সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই দিন বাহ্যচৈতন্য লাভের পর ব্রাহ্মণীকে বলিতে শুনিয়াছিলাম, 'বাবা' তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধকাম হইয়া দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহাই এই মতের (বীরভাবের) শেষ সাধন!' উহার কিছুকাল পরে অন্য একজন ভৈরবীকে পাঁচ সিকা দক্ষিণা দিয়া প্রসন্না করিয়া, তাঁহার সহায়ে কালীঘরের নাটমন্দিরে দিবাভাগে সর্ব্বজনসমক্ষে তন্ত্রোক্ত কুলাগার-পূজার যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া বীরভাবের সাধন সম্পূর্ণ করিয়াছিলাম। দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধনের সময় আমার রমণীমাত্রে মাতৃভাব যেমন অক্ষুণ্ণ ছিল, বিন্দুমাত্র কারণ-গ্রহণও তদ্রূপ কখন করিতে পারি নাই!—কারণের নাম বা গন্ধমাত্রেই জগৎকারণের উপলব্ধিতে আত্মহারা হইয়া পড়িতাম; সেইরূপ 'যোনি' শব্দ শ্রবণমাত্রেই জগদ্‌যোনির উদ্দীপনায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িতাম।"

আনন্দাসনে সিদ্ধিলাভ, কুলাগার পূজা, এবং তন্ত্রোক্ত সাধনকালে ঠাকুরের আচরণ।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর একদিন তাঁহার রমণীমাত্রে চিরকাল মাতৃভাবের উল্লেখ করিয়া একটী পৌরাণিক গল্প বলিয়াছিলেন। গল্পটীতে সিদ্ধ-জ্ঞানিগণের অধিনায়ক শ্রীশ্রীগণপতিদেবের হৃদয়ে রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞান কিরূপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাই বর্ণিত ছিল। মদস্রাবি-গজতুণ্ডাস্ফালিত-বদন লম্বোদর দেবতাটীর উপর ইতিপূর্ব্বে আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার বড় একটা

শ্রীশ্রীগণপতির রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞানসম্বন্ধে ঠাকুরের গল্প।

আতিশয্য ছিল না। কিন্তু ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে ঐ গল্পটী শুনিয়া পর্য্যন্ত ধারণা হইয়াছে, শ্রীগণপতি বাস্তবিকই সকল দেবতার অগ্রে পূজা পাইবার যোগ্য ! গল্পটী এই ঃ—

কিশোর বয়সে গণেশ একদিন ক্রীড়া করিতে করিতে একটী বিড়াল দেখিতে পান এবং বালসুলভ চপলতায় উহাকে নানাভাবে পীড়াপ্রদান ও প্রহার করিয়া ক্ষতবিক্ষত করেন। বিড়াল কোন-রূপে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিলে, গণেশ শান্ত হইয়া নিজ জননী শ্রীশ্রীপার্ব্বতীদেবীর নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন, দেবীর শ্রীঅঙ্গের নানাস্থানে প্রহারচিহ্ন দেখা যাইতেছে। বালক মাতার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া, নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবী বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন,—'তুমিই আমার ঐরূপ দুরবস্থার কারণ।' মাতৃভক্ত গণেশ ঐকথায় বিস্মিত ও অধিকতর দুঃখিত হইয়া সজলনয়নে বলিলেন,—'সে কি কথা মা, আমি তোমাকে কখন প্রহার করিলাম ? অথবা এমন কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়াও ত স্মরণ হইতেছে না, যাহাতে তোমার অবোধ বালকের জন্য অপরের হস্তে তোমাকে ঐরূপ অপমান সহ্য করিতে হইবে ?' জগন্ময়ী শ্রীশ্রীপার্ব্বতীদেবী তখন বালককে বলিলেন,—'ভাবিয়া দেখ দেখি, কোন জীবকে আজ তুমি প্রহার করিয়াছ কি না ?' গণেশ বলিলেন,—'তাহা করিয়াছি ; অল্পক্ষণ হইল, একটা বিড়ালকে মারিয়াছি।' যাহার বিড়াল সে-ই মাতাকে ঐরূপে প্রহার করিয়াছে ভাবিয়া, গণেশ তখন রোদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীগণেশজননী অনুতপ্ত বালককে সান্ত্বনার জন্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া বলিলেন,—'তাহা নহে বাবা, আমার এই শরীরকে কেহ মারে নাই, কিন্তু আমিই বিড়ালরূপ পরিগ্রহ করিয়াছি, এজন্য তোমার প্রহারের চিহ্ন আমার অঙ্গে

দেখিতে পাইতেছ। তুমি না জানিয়া ঐরূপ করিয়াছ, সেজন্য দুঃখ করিও না ; কিন্তু অদ্যাবধি একথা স্মরণ রাখিও, জগতে স্ত্রীমূর্ত্তি বিশিষ্ট জীব সকল আমার অংশে উদ্ভূত হইয়াছে এবং পুংমূর্ত্তি ধারী জীবসমুহ তোমার পিতার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—শিব ও শক্তি ভিন্ন জগতে কেহ বা কিছুই নাই!' গণেশ মাতার ঐকথা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন এবং বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, মাতাকে বিবাহ করিতে হইবে ভাবিয়া, উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অসম্মত হইলেন। ঐরূপে গণেশ চিরকাল ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং শিবশক্ত্যাত্মক জগৎ—এই কথা হৃদয়ে সর্ব্বদা দৃঢ় ধারণা করিয়া থাকায়, জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইলেন।

পূর্ব্বোক্ত গল্পটী বলিয়া ঠাকুর, শ্রীশ্রীগণপতির জ্ঞানগরিমা-সূচক নিম্নলিখিত কথাটীও বলিয়াছিলেন,—

গণেশ ও কার্ত্তিকের জগৎ পরিভ্রমণবিষয়ক গল্প।

কোন সময়ে শ্রীশ্রীপার্ব্বতীদেবী নিজ গলদেশে লম্বিতা বহুমূল্য রত্নমালা দেখাইয়া, গণেশ ও কার্ত্তিককে বলেন যে, চতুর্দ্দশভুবনান্বিত জগৎ পরিক্রমণ করিয়া তোমাদের মধ্যে যে অগ্রে আমার নিকট উপস্থিত হইবে, তাহাকেই আমি এই রত্নমালা প্রদান করিব। দেবসেনানী শিখিবাহন কার্ত্তিক অগ্রজের লম্বোদর স্থূল তনুর গুরুত্ব এবং তদীয় বাহন মূষিকের স্বল্পশক্তি ও মন্দগতি স্মরণ করিয়া, বিদ্রূপ-হাস্য হাসিলেন এবং 'রত্নমালা আমারই হইয়াছে' স্থির করিয়া, ময়ূরারোহণে জগৎ পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কার্ত্তিক ঐরূপে চলিয়া যাইবার বহুক্ষণ পরে স্থিরবুদ্ধি গণেশ আসন পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রজ্ঞাচক্ষুসহায়ে শিবশক্ত্যাত্মক জগৎকে শ্রীশ্রীহরপার্ব্বতীর শরীরে অবস্থিত দেখিয়া, ধীরপদে তাঁহাদিগকে পরিক্রমণ ও

বন্দনা করতঃ পুনরায় আসন পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর কার্ত্তিক ফিরিয়া আসিলে, জগন্ময়ী শ্রীশ্রীপার্ব্বতীদেবী গণপতির জ্ঞান ও ভক্তিতে পরম পরিতুষ্টা হইয়া প্রসাদী রত্নমালা তাঁহারই গলদেশে সস্নেহে লম্বিতা করিলেন।

শ্রীশ্রীগণপতির জ্ঞানমহিমা এবং রমণীমাত্রে মাতৃভাবের উল্লেখ ঐরূপে করিয়া ঠাকুর বলিলেন,—"আমারও রমণীমাত্রে ঐরূপ ভাব; সে জন্যই বিবাহিতা স্ত্রীর ভিতরেও শ্রীশ্রীজগদম্বার সাক্ষাৎ মাতৃমূর্ত্তির দর্শন পাইয়া পূজা ও পাদবন্দনা করিয়াছিলাম।"

তন্ত্র-সাধনে ঠাকুরের বিশেষত্ব।

রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তন্ত্রোক্ত বীরভাবের সাধনসকলের অবলম্বন ও যথাযথ অনুষ্ঠান করিবার কথা কোনও যুগে কোনও সাধকের সম্বন্ধেই আমরা শ্রবণ করি নাই। বীরমতাশ্রয়ী হইয়া সাধকমাত্রেই সাধনকালে একাল পর্য্যন্ত শক্তিগ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। বীরধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিসকলকে ঐ বিষয়ের ব্যতিক্রম করিতে না দেখিয়া লোকের মনে একটা দৃঢ়বদ্ধ ধারণা হইয়াছে যে ঐরূপ না করিলে, সাধনায় সিদ্ধি বা শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসন্নতা লাভ একান্ত অসম্ভব। প্রধানতঃ ঐ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই যে, লোকে তন্ত্রশাস্ত্রের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ঐ বিশেষত্ব ৺জগদম্বার অভিপ্রেত।

যুগাবতার অলৌকিক ঠাকুরই কেবল নিজ সম্বন্ধে একথা আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছেন যে, আজীবন স্বপ্নেও তিনি কখন স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই। অতএব পূর্ব্ব হইতে পূর্ণরূপে মাতৃভাবাবলম্বন করাইয়া, ঠাকুরকে বীরমতের সাধনসমূহ অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত

করাতে, শ্রীশ্রীজগদম্বার গূঢ় অভিপ্রায়-বিশেষ সম্পন্ন করাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়।

শক্তিগ্রহণ না করিয়া ঠাকুরের সিদ্ধিলাভে যাহা প্রমাণিত হয়।

ঠাকুর বলিতেন, সাধন সকলের কোনটীতে সাফল্য লাভ করিতে তাঁহার তিন দিনের অধিক সময় কখনও লাগে নাই! 'সাধনবিশেষ গ্রহণ করিয়া ফল প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যাকুলহৃদয়ে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ধরিয়া বসিলে, তিন দিবসেই উহাতে সিদ্ধকাম হইতাম।' শক্তিগ্রহণ না কয়িয়া সাধনসকলে তাঁহার ঐরূপে স্বল্পকালে সাফল্য লাভ করাতে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীগ্রহণ ঐ সকল অনুষ্ঠানের অবশ্যকর্ত্তব্য অঙ্গ-বিশেষ নহে। সংযমরহিত সাধক আপন দুর্ব্বল প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া ঐরূপ করিয়া থাকে। সাধক ঐরূপ করিয়া বসিলেও যে, তন্ত্র তাহাকে অভয় দান করিয়াছেন, এবং পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে কালে সে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে—এ কথার উপদেশ করিয়াছেন, ইহাতে ঐ শাস্ত্রের পরম কারুণিকত্বই উপলব্ধ হয়।

তন্ত্রোক্ত-অনুষ্ঠান-সকলের উদ্দেশ্য।

অতএব রূপরসাদি যে সকল পদার্থ মানবসাধারণকে প্রলোভিত করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি অনুভব করাইতেছে এবং ঈশ্বরলাভ করিয়া আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে দিতেছে না, সংযত হইয়া বারম্বার উদ্যম ও চেষ্টার দ্বারা সেই সকলকে ঈশ্বরের মূর্ত্তি বলিয়া অবধারণ করিতে সাধককে অভ্যস্ত করানই তান্ত্রিকী ক্রিয়া সকলের সাধারণ উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হয়। সাধকের সংযম এবং পূর্ব্বোক্ত ধারণার তারতম্য বিচার করিয়াই তন্ত্র, পশু, বীর ও দিব্যভাবের অবতারণা করিয়াছেন এবং তাহাকে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাবে ঈশ্বরোপাসনায় অগ্রসর হইতে উপদেশ

করিয়াছেন। কিন্তু কঠোর সংযমকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বন করিয়া তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহে প্রবৃত্ত হইলে, তবেই উহাদের ফল করগত হইবে—একথা, কালধর্ম্মে লোকে প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কুক্রিয়া সকলের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রকেই দায়ী স্থির করিয়া, সাধারণে তাহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অতএব রমণীমাত্রে মাতৃভাবে পূর্ণহৃদয় ঠাকুরের এই সকল অনুষ্ঠানের সাফল্য দেখিয়া,—যথার্থ সাধককুল কোন্ লক্ষ্যে চলিতে হইবে, তাহার নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইয়া—যেমন উপকৃত হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্যও তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ শাস্ত্র মহিমান্বিত হইয়াছে।

ঠাকুরের তন্ত্রসাধনের অন্য কারণ।

ঠাকুর, তন্ত্রোক্ত রহস্য সাধনসমূহের তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত যথাযথ অনুষ্ঠান করিলেও, উহাদিগের পারম্পর্য্য ও সবিস্তার বিবরণ আমাদিগের কাহাকেও কখন বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে সাধনপথে উৎসাহিত করিবার জন্য ঐ সকল কথার অল্প বিস্তর আমাদিগের অনেককে সময়ে সময়ে বলিয়াছেন; অথবা ব্যক্তিগত প্রয়োজন বুঝিয়া, বিরল কাহাকেও কোন কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইয়াছেন। তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠানে নানা প্রকারের অসাধারণ অনুভবসমূহ স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিলে, উত্তরকালে সমীপাগত নানা বিভিন্নপ্রকৃতিবিশিষ্ট ভক্তগণের মানসিক অবস্থা ধরিয়া সাধনপথে সহজে অগ্রসর করাইয়া দিতে পারিবেন না বলিয়াই যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতা ঠাকুরকে এসময় এই পথের সহিত সম্যক্ পরিচিত করিয়াছিলেন —একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সমীপাগত শরণাগত ভক্তদিগকে, কি ভাবে কত রূপে ঠাকুর সাধনপথে অগ্রসর

করাইয়া দিতেন, তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস আমরা অন্যত্র* প্রদান করিয়াছি; তৎপাঠে আমাদের পূর্ব্বোক্ত বাক্যের যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে পাঠকের বিলম্ব হইবে না। অতএব এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তন্ত্র সাধনকালে ঠাকুরের দর্শন ও অনুভবসমূহ।

সাধনক্রিয়াসকল পূর্ব্বোক্তভাবে বলা ভিন্ন ঠাকুর তাঁহার তন্ত্রোক্ত সাধনকালের অনেকগুলি দর্শন এবং অনুভবের কথা আমাদিগের নিকট মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করিতেন। আমরা এখন উহাদিগের কয়েকটী পাঠককে বলিব ঃ—

শিবানীর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ।

ঠাকুর বলিতেন, তন্ত্রোক্ত সাধনের সময় তাঁহার পূর্ব্বস্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বা সময়ে সময়ে শিবারূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন শুনিয়া এবং কুক্কুরকে ভৈরবের বাহন জানিয়া, ঠাকুর ঐকালে তাহাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্যকে পবিত্রবোধে গ্রহণ করিতেন! মনে কোনরূপ দ্বিধা বোধ হইত না!

আপনাকে জ্ঞানাগ্নিব্যাপ্ত দর্শন।

শ্রীশ্রীজগদম্বার পাদপদ্মে দেহ, মন, প্রাণ—নিজ সর্ব্বস্ব, অন্তরের সহিত আহুতি প্রদান করিয়া, ঠাকুর ঐকালে আপনাকে অন্তরের বাহিরে নিরন্তর জ্ঞানাগ্নিপরিব্যাপ্ত দেখিতেন।

কুণ্ডলিনী-জাগরণ দর্শন।

কুণ্ডলিনী জাগরিত হইয়া মস্তকে উঠিতেছে এবং মূলাধারাদি সহস্রার পর্য্যন্ত পদ্মসকল উর্দ্ধমুখ ও পূর্ণপ্রস্ফুটিত হইতেছে, এবং উহাদিগের একের পর অন্য যেমনি প্রস্ফুটিত হইতেছে, অমনি অপূর্ব্ব অনুভবসমূহ অন্তরে উদিত হইতেছে†—এবিষয় ঠাকুর

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—১ম অধ্যায়, ১৯—৩৮ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় অধ্যায় ৮১—৯২ পৃষ্ঠা। † গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—২য় অধ্যায়, ৬৩—৬৭ পৃষ্ঠা।

এই সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন—এক জ্যোতির্ম্ময় দিব্য পুরুষমূর্ত্তি সুষুম্নার মধ্য দিয়া ঐ সকল পদ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিয়া উহাদিগকে প্রস্ফুটিত করাইয়া দিতেছেন!

স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের এককালে ধ্যান করিতে বসিলেই সম্মুখে সুবৃহৎ বিচিত্র জ্যোতির্ম্ময় একটী ত্রিকোণ স্বতঃ সমুদিত হইত এবং ঐ ত্রিকোণকে জীবন্ত বলিয়া তাঁহার বোধ হইত! একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে ঐ বিষয় বলায়, তিনি বলিয়াছিলেন,—"বেশ, বেশ, তোর ব্রহ্মযোনি দর্শন হইয়াছে; বিল্বমূলে সাধনকালে আমিও ঐরূপ দেখিতাম এবং উহা প্রতিমুহূর্ত্তে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতেছে, দেখিতে পাইতাম।"

ব্রহ্মযোনি দর্শন।

ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পৃথক্ পৃথক্ যাবতীয় ধ্বনি একত্রীভূত হইয়া এক বিরাট্ প্রণবধ্বনি প্রতিমুহূর্ত্তে জগতের সর্ব্বত্র স্বতঃ উদিত হইতেছে—এবিষয় ঠাকুর এই কালে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আমাদিগের কেহ কেহ বলেন, এই কালে তিনি পশু পক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর জন্তুদিগের ধ্বনিসকলের যথাযথ অর্থবোধ যে করিতে পারিতেন—একথা তাঁহারা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছেন।

অনাহতধ্বনি শ্রবণ।

স্ত্রীযোনির মধ্যে ঠাকুর এই কালে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠিতা দেখিয়াছিলেন।

কুলাগারে ৺দেবীদর্শন।

এই কালের শেষে ঠাকুর আপনাতে অণিমাদি সিদ্ধি বা বিভূতির আবির্ভাব অনুভব করিয়াছিলেন এবং নিজ ভাগিনেয় হৃদয়ের পরামর্শে ঐ সকল প্রয়োগ করিবার ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট একদিন জানিতে যাইয়া দেখিয়াছিলেন,

উহারা বেশ্যা-বিষ্ঠার তুল্য হেয় ও সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। ঠাকুর বলিতেন,—ঐরূপ দর্শন করিয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধাইয়ের নামে তাঁহার ঘৃণার উদয় হয় !

ঠাকুরের অণিমাদি সিদ্ধিসকলের অনুভব-প্রসঙ্গে একটী কথা আমাদের মনে উদিত হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি পঞ্চবটীতলে নির্জ্জনে একদিন আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন,—'ছাখ, আমাতে প্রসিদ্ধ অষ্ট-সিদ্ধি উপস্থিত রহিয়াছে; কিন্তু আমি ঐ সকলের কখন প্রয়োগ করিব না, একথা বহুপূর্ব্ব হইতে নিশ্চয় করিয়াছি—উহাদিগের প্রয়োগ করিবার কোনরূপ আবশ্যকতাও দেখি না; তোকে ধর্ম্মপ্রচারাদি অনেক কার্য্য করিতে হইবে, তোকেই ঐ সকল দান করিব, স্থির করিয়াছি —গ্রহণ কর্।' স্বামিজী তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করেন,—'মহাশয়, ঐ সকল আমাকে ঈশ্বরলাভে কোনরূপ সহায়তা করিবে কি?' পরে ঠাকুরের উত্তরে যখন বুঝিলেন, উহারা ধর্ম্মপ্রচারাদি কার্য্যে কিছুদূর পর্য্যন্ত সহায়তা করিতে পারিলেও, ঈশ্বরলাভে কোনরূপ সহায়তা করিবে না, তখন তিনি ঐ সকল গ্রহণে অসম্মত হইলেন। স্বামিজী বলিতেন,—তাঁহার ঐরূপ আচরণে ঠাকুর তাঁহার উপর অধিকতর প্রসন্ন হইয়াছিলেন।

অষ্টসিদ্ধিসম্বন্ধে ঠাকুরের স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথা।

শ্রীশ্রীজগন্মাতার মোহিনী-মায়ার দর্শন করিবার ইচ্ছা মনে সমুদিত হইয়া ঠাকুর এইকালে দর্শন করিয়াছিলেন—এক অপূর্ব্বসুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি—গঙ্গা-গর্ভ হইতে উত্থিতা হইয়া, ধীরপদবিক্ষেপে পঞ্চবটীতে আগমন করিলেন। ক্রমে দেখিলেন, ঐ রমণী পূর্ণগর্ভা; পরে দেখিলেন, ঐ রমণী তাঁহার সম্মুখেই সুন্দর কুমার প্রসব করিয়া, তাহাকে

মোহিনীমায়া দর্শন।

কত স্নেহে স্তন্যদান করিতেছেন; পরক্ষণে দেখিলেন, রমণী কঠোর করালবদনা হইয়া উঠিয়া, ঐ শিশুকে মুখমধ্যে গ্রহণ করিয়া, চর্ব্বণ ও গ্রাস করিলেন এবং পরে পুনরায় গঙ্গাগর্ভে প্রবিষ্টা হইলেন।

ষোড়শীমূর্ত্তির সৌন্দর্য্য।

পূর্ব্বোক্ত দর্শনসকল ভিন্ন ঠাকুর এই কালে দশভুজা হইতে দ্বিভুজা পর্য্যন্ত কত যে দেবীমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। উহাদিগের মধ্যে কোন কোনটী আবার তাঁহার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্তা হইয়া, তাঁহাকে নানাভাবে উপদেশাদি প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মূর্ত্তিসমূহের সকলগুলিই অপূর্ব্বস্বরূপা হইলেও, শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরী বা ষোড়শী মূর্ত্তির সৌন্দর্য্যের সহিত তাহাদিগের যে তুলনাই হয় না—একথাও আমরা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন,—'ষোড়শী বা ত্রিপুরামূর্ত্তির অঙ্গ হইতে রূপসৌন্দর্য্য যেন গলিত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে পতিত ও ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হইতে দেখিয়াছিলাম!' এতদ্ভিন্ন ভৈরবাদি দেবযোনিসম্ভব নানা পুরুষসকলের দর্শনও ঠাকুর এই সময়ে পাইয়াছিলেন।

অলৌকিক দর্শন ও অনুভবসকল ঠাকুরের জীবনে তন্ত্রসাধনকাল হইতে নিত্য এতই উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহাদের সম্যক্ উল্লেখ করা মনুষ্যশক্তির সাধ্যাতীত বলিয়া আমাদিগের প্রতীতি হইয়াছে। অতএব ঐ উদ্যমে অধিক কালক্ষেপ নিষ্প্রয়োজন।

তন্ত্রসাধনে সিদ্ধিলাভে ঠাকুরের দেহবোধরাহিত্য ও বালকভাব প্রাপ্তি।

তন্ত্রোক্ত-সাধনকাল হইতে ঠাকুরের সুষুম্নাদ্বার পূর্ণভাবে উন্মোচিত হইয়া, তাঁহার বালকবৎ অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার কথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। এই কালের শেষভাগ হইতে তিনি পরিহিত বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্রাদি, চেষ্টা

করিলেও, সর্ব্বদা অঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না। তাঁহার অজ্ঞাতসারে ঐ সকল কখন কোথায় যে পড়িয়া যাইত, তাহার অনুভব হইত না! শ্রীশ্রীজগদম্বার শ্রীপাদপদ্মে মন সতত নিবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার শরীর-বোধ না থাকাই যে উহার হেতু, তাহা আর বলিতে হইবে না। নতুবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তিনি যে কখন ঐরূপ করেন নাই, বা অন্যত্রদৃষ্ট পরমহংসদিগের ন্যায় উলঙ্গ থাকিতে অভ্যাস করেন নাই—একথা, আমরা তাঁহার শ্রীমুখে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন,—ঐসকল সাধনশেষে তাঁহার সকল পদার্থে অদ্বৈতবুদ্ধি এত অধিক বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, বাল্যাবধি তিনি যাহাকে হেয় নগণ্য বস্তু বলিয়া পরিগণনা করিতেন, তাহাকেও মহা পবিত্র বস্তুসকলের সহিত তুল্য দেখিতেন! বলিতেন,—"তুলসীগাছ ও সজ্‌নে খাড়া এক বোধ হইত!"

তন্ত্রসাধনকালে ঠাকুরের অঙ্গকান্তি।

আবার, এই কাল হইতে ঠাকুরের অঙ্গকান্তি কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত এত অধিক প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল যে, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র লোকনয়নের আকর্ষণের বিষয় হইয়াছিলেন। নিরভিমান ঠাকুরের উহাতে নিরন্তর এতই বিরক্তির উদয় হইত যে, তিনি দিব্যকান্তি পরি-হারের জন্য শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট অনেক সময় প্রার্থনা করিয়া বলিতেন,—'মা, আমার এ বাহ্য রূপে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, উহা লইয়া তুই আমাকে আন্তরিক আধ্যাত্মিক রূপ প্রদান কর্!' তাঁহার ঐরূপ প্রার্থনা যে কালে পূর্ণ হইয়াছিল, একথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।*

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—সপ্তম অধ্যায়, ১৯৪—১৯৭ পৃষ্ঠা দেখ।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীশ্রীযোগমায়ার অংশ ছিলেন।

তন্ত্রোক্ত সাধনে ব্রাহ্মণী যেমন ঠাকুরকে সহায়তা করিয়াছিলেন, ঠাকুরও তদ্রূপ ব্রাহ্মণীর আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণ করিতে উত্তরকালে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি ঐরূপ না করিলে, ব্রাহ্মণী যে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিতা হইতে পারিতেন না, একথার আভাস আমরা পাঠককে অন্যত্র দিয়াছি।* ব্রাহ্মণীর নাম যোগেশ্বরী ছিল, এবং ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীশ্রীযোগমায়ার অংশসম্ভূতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।

তন্ত্রসাধনপ্রভাবে দিব্যশক্তি লাভ করিয়া ঠাকুরের অন্য এক বিষয়ের উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, পরে, বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকটে ধর্ম্মশক্তি লাভের জন্য উপস্থিত হইয়া কৃতার্থ হইবে। পরম অনুগত শ্রীযুত মথুর এবং হৃদয় প্রভৃতিকে তিনি ঐ উপলব্ধির কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীযুত মথুর তাহাতে বলিয়াছিলেন, 'বেশ ত বাবা, সকলে মিলিয়া তোমাকে লইয়া আনন্দ করিব।'

দ্বাদশ অধ্যায়।

জটাধারী ও বাৎসল্যভাব সাধন।

সন ১২৬৭ সালের শেষ ভাগে পুণ্যবতী রাণী রাসমণির দেহত্যাগের পরে ভৈরবী শ্রীমতী যোগেশ্বরী দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন করিয়াছিলেন—ঐকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন ১২৬৯

* গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ, অষ্টম অধ্যায়, ২৪৩—২৪৭ পৃষ্ঠা দেখ।

সাল পর্য্যন্ত ঠাকুর তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহে বিশেষভাবে প্রবর্ত্তিত হয়েন। তন্ত্রসাধনসকলের অনুষ্ঠানকালে মথুর বাবুই ঠাকুরের সেবাধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা শ্রীযুত মথুর ঐকালের পূর্ব্বে ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব ঈশ্বরানুরাগ, অদ্ভুত সংযম এবং জ্বলন্ত ত্যাগবৈরাগ্য সম্বন্ধে যেমন দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন, তন্ত্রসাধনকালে সেইরূপ, তাঁহাতে অলৌকিক বিভূতি-সকলের বারম্বার প্রকাশ দেখিতে পাইয়া তাঁহার দৃঢ়ধারণা হইয়াছিল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহাবলম্বনে তাঁহার ইষ্টদেবীই তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইয়া তাঁহার সেবা লইতেছেন,* সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে রক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহার প্রভুত্ব ও বিষয়াধিকার সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাকে দিন দিন অশেষ মর্য্যাদা ও গৌরবসম্পন্ন করিয়া তুলিতেছেন। কারণ, মথুরামোহন তখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহাতেই সিদ্ধকাম হইতেছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপালাভে আপনাকে বিশেষভাবে দৈবসহায়বান্ বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন। সুতরাং ঠাকুরের সাধনানুকূল দ্রব্যসমূহের সংগ্রহে এবং তাঁহার অভিপ্রায়-মত দেবসেবার্থে বা অন্য কোন সৎকার্য্যানুষ্ঠানে মথুরের বহুল অর্থ ব্যয় করাতে কিছুই বিচিত্রতা ছিল না।

ঠাকুরের কৃপালাভে মথুরের অনুভব ও আচরণ।

তন্ত্রোক্ত সাধনসহায়ে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রকাশ দিন দিন যত বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাঁহার শ্রীপদাশ্রয়ী মথুরের সর্ব্ববিষয়ে উৎসাহ, সাহস এবং বল ততই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার আশ্রয় ও কৃপালাভে ভক্ত নিজ হৃদয়ে যে

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৭৮—১৮০পৃষ্ঠা।

অপূর্ব্ব উৎসাহ এবং বলসঞ্চার অনুভব করেন, মথুরের অনুভূতিও এখন তাদৃশী হইয়াছিল। তবে রজোগুণা সংসারী মথুরের ভক্তি ঠাকুরের সেবা ও পুণ্যকার্য্যসকলের অনুষ্ঠানমাত্র করিয়াই পরিতুষ্ট থাকিত, আধ্যাত্মিক রাজ্যে অধিকদূর অগ্রসর হইতে চাহিত না। ঐরূপ না হইলেও কিন্তু মথুরের মন তাঁহাকে একথা স্থির বুঝাইয়াছিল যে, ঠাকুরই তাঁহার বল, বুদ্ধি, ভরসা, তাঁহার ইহকাল পরকালের সম্বল, এবং তাঁহার বৈষয়িক উন্নতি ও পদমর্য্যাদা লাভ প্রভৃতির মূলীভূত কারণ।

ঠাকুরের কৃপালাভে মথুর যে এখন আপনাকে বিশেষ সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের পরিচয় আমরা তাঁহার এই কালানুষ্ঠিত কার্য্যে পাইয়া থাকি। "রাণী রাসমণির জীবন বৃত্তান্ত" শীর্ষক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীযুত মথুরামোহন এই কালে (সন ১২৭০ সালে) দক্ষিণেশ্বরে বহুব্যয়সাধ্য অন্নমেরু ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হৃদয় বলিতেন, এই ব্রতকালে তিনি প্রভূত স্বর্ণ রৌপ্যাদি ব্যতীত সহস্র মন চাউল ও সহস্র মন তিল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দান করিয়াছিলেন এবং প্রসিদ্ধা গায়িকা সহচরীর কীর্ত্তন ও রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান প্রভৃতি কিছুকালের জন্য নিযুক্ত করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে উৎসবক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। হৃদয় একথাও বলিতেন যে, ঐ সকল গায়ক-গায়িকাদিগের ভক্তিরসাশ্রিত সঙ্গীত শ্রবণে ঠাকুরকে মুহুর্মুহুঃ ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইতে দেখিয়া শ্রীযুত মথুর, ঠাকুরের পরিতৃপ্তির তারতম্যকেই তাহাদিগের গুণপনার পরিমাপকস্বরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া বহুমূল্য শাল, রেশমী বস্ত্র এবং শত শত মুদ্রা তাহাদিগকে পারিতোষিকস্বরূপে প্রদান করিয়াছিলেন।

মথুরের অন্নমেরু ব্রতানুষ্ঠান।

শ্রীযুত মথুরের ঐরূপে অন্নমেরু ব্রতানুষ্ঠানের কিছু পূর্ব্বে ঠাকুর বর্দ্ধমান রাজসভার তাৎকালিক প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মলোচনের অশেষ গুণগ্রাম ও নিরভিমানিতায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, অন্নমেরু ব্রতকালে আহূত পণ্ডিতসভাতে ঐ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে আনয়ন ও দান গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত শ্রীযুত মথুরের বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। ঠাকুরের প্রতি তাঁহাকে বিশেষ ভক্তিসম্পন্ন জানিতে পারিয়া মথুরামোহন হৃদয়ের দ্বারা উক্ত পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। শ্রীযুত পদ্মলোচন কিন্তু মথুরের সাদর নিমন্ত্রণ ঐকালে রক্ষা করিতে পারেন নাই। পদ্মলোচন পণ্ডিতের কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র সবিস্তারে বলিয়াছি।*

বৈদান্তিক পণ্ডিত পদ্মলোচনের সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎ।

তান্ত্রিক সাধনসমূহ অনুষ্ঠানের পর ঠাকুর বৈষ্ণব মতের সাধনসকলে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঐরূপ হইবার কতকগুলি স্বাভাবিক কারণ আমরা অনুসন্ধানে পাইয়া থাকি। প্রথম, ভক্তিমতী ভৈরবী ব্রাহ্মণী—বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনসমূহে স্বয়ং পারদর্শিনী ছিলেন এবং ঐ ভাবসকলের অন্যতমকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ং অনেককাল অবস্থান করিতেন। নন্দরাণী শ্রীমতী যশোদার ভাবে তন্ময় হইয়া ঠাকুরকে বালগোপাল জ্ঞানে তাঁহার ভোজন করাইবার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব বৈষ্ণব মত সাধন বিষয়ে ঠাকুরকে তাঁহার উৎসাহ প্রদান করা বিচিত্র নহে। দ্বিতীয়, বৈষ্ণব-কুল-সম্ভূত ঠাকুরের বৈষ্ণব ভাবসাধনে অনুরাগ থাকা স্বাভাবিক। কামারপুকুর অঞ্চলে

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—২য় অধ্যায়, ৯২—৯৮ পৃষ্ঠা।

ঐসকল সাধন বিশেষ ভাবে প্রচলিত থাকায় উহাদিগের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবার বাল্যকাল হইতে বিশেষ সুযোগ ছিল। তৃতীয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কারণ, ঠাকুরের ভিতর আজীবন পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়বিধ প্রকৃতির অদৃষ্টপূর্ব্ব সম্মিলন। উহাদিগের একের প্রভাবে তিনি সিংহপ্রতিম নির্ভীক বিক্রমশালী, সর্ববিষয়ের মূলকারণান্বেষী, কঠোর পুরুষপ্রবররূপে আমাদের নয়নে প্রতিভাত হইতেন, এবং অন্যের প্রকাশে, ললনাজনসুলভ অসামান্য কোমল-কঠোর স্বভাববিশিষ্ট হইয়া তিনি নিজ হৃদয়ের মধ্য দিয়া জগতের যাবতীয় বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতে ও পরিমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, কতকগুলি বিষয়ে স্বভাবতঃ তীব্র অনুরাগসম্পন্ন ও অন্য কতকগুলিতে ঐরূপে বিরাগসম্পন্ন হইতেন এবং ভাবসংযুক্ত হইলে অশেষ ক্লেশ হাস্যমুখে বহন করিতে পারিলেও ইতরসাধারণের ন্যায় ভাববিহীন হইয়া কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন না।

ঠাকুরের বৈষ্ণব মতের সাধনসমূহে প্রবৃত্ত হইবার কারণ।

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত শান্ত, দাস্য, এবং কখন কখন শ্রীকৃষ্ণসখা শ্রীদাম সুদামাদি ব্রজবালকগণের ন্যায় সখ্যভাবাবলম্বনে সাধন ও উপাসনায় স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হইয়া ঐ সকলে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রগতপ্রাণ মহাবীরকে আদর্শজ্ঞানে দাস্যভক্তি অবলম্বনে তাঁহার কিছুকাল অবস্থিতি এবং জনকনন্দিনী, জনমদুঃখিনী সীতার দর্শনলাভ প্রভৃতি কথা পাঠকের স্মরণ থাকিবে। অতএব বৈষ্ণবাচার্য্যগণনিষেবিত বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিত মুখ্য ভাবদ্বয়

বাৎসল্য ও মধুরভাব সাধনের পূর্ব্বে ঠাকুরের ভিতর স্ত্রীভাবের উদয়।

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৭ম অধ্যায়, ১৯৩—২০১পৃষ্ঠা।

সাধনেই তিনি এখন মনোনিবেশ করিয়াছিলেন. দেখিতে পাওয়া যায়, এই কালে তিনি আপনাকে শ্রীশ্রীজগন্মাতার সখীরূপে ভাবনা করিয়া চামরহস্তে তাঁহাকে বীজনে নিযুক্ত আছেন, শরৎ-কালীন দেবীপূজাকালে মথুরের কলিকাতাস্থ বাটীতে উপস্থিত হইয়া রমণীজনোচিত সাজে সজ্জিত ও কুলস্ত্রীগণপরিবৃত হইয়া ৺দেবীর দর্শনাদি করিতেছেন এবং স্ত্রীভাবের প্রাবল্যে অনেক সময়ে স্বয়ং যে পুংদেহবিশিষ্ট, একথা বিস্মৃত হইতেছেন।* আমরা যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মসকাশে যাইতে আরম্ভ করিয়াছি, তখনও তাঁহাতে সময়ে সময়ে প্রকৃতি-ভাবের উদয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু তখন উহার এই কালের মত এত সুদীর্ঘকালব্যাপী অবস্থান হইত না। ঐরূপ হইবার আবশ্যকতাও ছিল না। কারণ, স্ত্রী-পুং-প্রকৃতিগত যাবতীয় ভাব এবং ভাবাতীত অদ্বৈতভাবমুখে ইচ্ছামত অবস্থান করা শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপায় তাঁহার তখন সহজ হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল এবং সমীপাগত প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণসাধনের জন্য ঐ সকল ভাবের যেটীতে যতক্ষণ ইচ্ছা তিনি অবস্থান করিতেছিলেন।

ঠাকুরের মনের গঠন কিরূপ ছিল তদ্বিষয়ের আলোচনা।

সে যাহা হউক, ঠাকুরের সাধনকালের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পাঠককে কল্পনাসহায়ে সর্ব্বাগ্রে অনুধ্যান করিয়া দেখিতে হইবে, তাঁহার মন, জন্মাবধি কীদৃশ অসাধারণ ধাতুতে গঠিত থাকিয়া কিভাবে সংসারে নিত্য বিচরণ করিত এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রবল বাত্যাভিমুখে পতিত হইয়া বিগত আট বৎসরে উহাতে কিরূপ পরিবর্ত্তনরাজি উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি, ২৬২ সালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ– ৭ম অধ্যায়, ১৯৩—২০১ পৃষ্ঠা।

যখন তিনি প্রথম পদার্পণ করেন এবং উহার পরেও কিছুকাল তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতৃপিতামহগণ যেরূপে সৎপথে থাকিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিয়া আসিয়াছেন, তিনিও ঐরূপ করিবেন। আজন্ম অভিমানরহিত তাঁহার মনে একথা একবারও উদয় হয় নাই যে, তিনি সংসারের অন্য কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে বড় বা বিশেষগুণসম্পন্ন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অসাধারণ বিশেষত্ব প্রতি পদে প্রকাশিত হইয়া পড়িতে লাগিল। এক অপূর্ব্ব দৈবী শক্তি যেন প্রতিক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সংসারের রূপরসাদি প্রত্যেক বিষয়ের অনিত্যত্ব ও অকিঞ্চিৎকরত্ব উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া তাঁহার নয়নসম্মুখে ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্বদা বিপরীত পথে চালিত করিতে লাগিলেন। স্বার্থশূন্য সত্যমাত্রানুসন্ধিৎসু ঠাকুর উহার ইঙ্গিতে চলিতে ফিরিতে শীঘ্রই আপনাকে অভ্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। পার্থিব ভোগ্য-বস্তুসকলের কোনটী লাভ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে প্রবল থাকিলে ঐরূপ করা তাঁহার যে, সুকঠিন হইত একথা বুঝিতে পারা যায়।

ঠাকুরের মনে সংস্কার-বন্ধন কত অল্প ছিল।

সর্ব্ব বিষয়ে ঠাকুরের আজীবন আচরণ স্মরণ করিলেই আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। সংসারে প্রচলিত বিদ্যাভ্যাসের উদ্দেশ্য, 'চাল কলা বাঁধা' বা অর্থোপার্জ্জন বুঝিয়া তিনি লেখাপড়া শিখিলেন না—সংসারযাত্রানির্ব্বাহে সাহায্য হইবে বলিয়া পূজকের পদ গ্রহণ করিয়া দেবোপাসনার অন্যোদ্দেশ্য বুঝিলেন এবং ঈশ্বরলাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন—সম্পূর্ণ সংযমেই ঈশ্বরলাভ একথা বুঝিয়া বিবাহিত হইলেও কায়মনোবাক্যে কখন স্ত্রীগ্রহণ করিলেন না—সঞ্চয়শীল ব্যক্তি ঈশ্বরে পূর্ণনির্ভর-

বান্ হয় না বুঝিয়া কাঞ্চনাদি দূরের কথা, সামান্য পদার্থসকল সঞ্চয়ের ভাবও মন হইতে এককালে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন —ঐরূপ অনেক কথাই ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়। ঐ সকল কথার অনুধাবনে বুঝিতে পারা যায়, ইতরসাধারণ জীবের মোহকর সংস্কারবন্ধনসকল তাঁহার মনে বাল্যাবধি কতদূর অসামান্য অল্প প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, ঠাকুরের ধারণাশক্তি এত প্রবল ছিল যে, তাহার সম্মুখে তাঁহার পূর্ব্বসংস্কারসকল মস্তকোত্তলন করিয়া তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করাইতে কখন সমর্থ হইত না।

সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ঠাকুরের মন কিরূপ গুণসম্পন্ন ছিল।

তদ্ভিন্ন আমরা দেখিয়াছি, বাল্যকাল হইতে ঠাকুর শ্রুতিধর ছিলেন। যাহা একবার শুনিতেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং তাঁহার স্মৃতি উহা চিরকালের জন্য ধারণ করিয়া থাকিত। বাল্যকালে রামায়ণাদি কথা, গান এবং যাত্রা প্রভৃতি একবার শ্রবণ করিবার পরে ঠাকুর বয়স্যগণকে লইয়া কামারপুকুরের গোঠে ব্রজে ঐ সকলের কিরূপে পুনরাবৃত্তি করিতেন, তদ্বিষয় পাঠকের জানা আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, অদৃষ্টপূর্ব্ব সত্যানুরাগ, শ্রুতিধরত্ব এবং সম্পূর্ণ ধারণারূপ সম্পত্তিনিচয় পূর্ব্ব হইতে নিজস্ব করিয়া ঠাকুর সাধকজীবনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। যে অনুরাগ, ধারণা প্রভৃতি গুণসমূহ আয়ত্ত করা সাধারণ সাধকের জীবনপাতী চেষ্টাতেও সুসাধ্য হয় না, ঠাকুর সেই গুণসকলকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়া সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুতরাং সাধনরাজ্যে স্বল্পকালমধ্যে তাঁহার সমধিক ফললাভ করা বিচিত্র নহে।

সাধনকালে কঠিন সাধনসমূহে তিনি তিন দিনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, একথা তাঁহার নিকটে শ্রবণ করিয়া অনেক সময়ে আমরা যে, বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়াছি, তাহার কারণ তাঁহার অসামান্য মানসিক গঠনের কথা আমরা তখন বিন্দুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই।

ঠাকুরের অসাধারণ মানসিক গঠনের দৃষ্টান্ত ও আলোচনা।

ঠাকুরের জীবনের কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিলে পাঠক আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত কথা বুঝিতে পারিবেন। সাধনকালের প্রথমে ঠাকুর নিত্যানিত্যবস্তু-বিচারপূর্ব্বক 'টাকা মাটি—মাটি টাকা' বলিতে বলিতে মৃত্তিকাসহ কয়েকখণ্ড মুদ্রা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন—অমনি তৎসহ যে কাঞ্চনাসক্তি মানবমনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে, তাহা চিরকালের নিমিত্ত তাঁহার মন হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জিত হইল! সাধারণে যে স্থানে গমনপূর্ব্বক স্নানাদি না করিয়া আপনাদিগকে শুচি জ্ঞান করে না, সেই স্থান তিনি স্বহস্তে মার্জ্জনা করিলেন—অমনি তাঁহার মন, জন্মগত জাত্যভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক চিরকালের নিমিত্ত ধারণা করিয়া রাখিল, সমাজে অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত ব্যক্তিসমূহাপেক্ষা সে কোন অংশে বড় নহে! জগদম্বার সন্তান বলিয়া আপনাকে ধারণা করিয়া ঠাকুর যেমন শুনিলেন তিনিই "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"—অমনি আর কখন স্ত্রীজাতির কাহাকেও অন্য চক্ষে দেখিয়া তাঁহার সহিত দাম্পত্যসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতে পারিলেন না!—ঐ সকল বিষয়ের অনুধাবনে স্পষ্ট বুঝা যায়, অসামান্য ধারণাশক্তি না থাকিলে ঠাকুর ঐরূপ ফলসকল কখন লাভ করিতে পারিতেন না। ঠাকুরের জীবনের ঐ সকল কথা শুনিয়া আমরা যে,

বিস্মিত হই, অথবা সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না, তাহার কারণ —আমরা ঐ সময়ে আমাদিগের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই যে, ঐরূপে মৃত্তিকাসহ মুদ্রাখণ্ড সহস্রবার জলে বিসর্জ্জন করিলেও আমাদিগের কাঞ্চনাসক্তি যাইবে না—সহস্রবার কদর্য্য স্থান ধৌত করিলেও আমাদের মনের অভিমান ধৌত হইবে না এবং জগজ্জননীর রমণীরূপে প্রকাশ হইয়া থাকিবার কথা আজীবন শুনিলেও কার্য্যকালে আমাদিগের রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞানের উদয় হইবে না! আমাদিগের ধারণা-শক্তি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসংস্কারে নিতান্ত নিগড়বদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া চেষ্টা করিয়াও আমরা ঐ সকল বিষয়ে ঠাকুরের ন্যায় ফললাভ করিতে পারি না। সংযমরহিত, ধারণাশূন্য, পূর্ব্বসংস্কার-প্রবল মন লইয়া আমরা ঈশ্বরলাভ করিতে সাধনরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকি—ফলও সুতরাং তদ্রূপ হয়।

ঠাকুরের ন্যায় অপূর্ব্ব শক্তিবিশিষ্ট মন সংসারে চারি পাঁচ শত বৎসরেও এক আধটা আসে কিনা, সন্দেহ। সংযমপ্রবীণ, ধারণা-কুশল, পূর্ব্বসংস্কার-নির্জীব সেই মন ঈশ্বরলাভের জন্য অদৃষ্টপূর্ব্ব অনুরাগ-ব্যাকুলতা-তাড়িত হইয়া আট বৎসর কাল আহারনিদ্রা-ত্যাগপূর্ব্বক শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূর্ণদর্শন লাভের জন্য সচেষ্ট থাকিয়া কতদূর শক্তিসম্পন্ন হইয়া ছিল ও কিরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করিয়া-ছিল, তাহা আমাদের মত মনের কল্পনায় আনয়ন করাও অসম্ভব।

ঠাকুরের অনুজ্ঞায় মথুরের সাধুসেবা।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, রাণী রাসমণির মৃত্যুর পর দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবার কিছুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হইত না। শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ মথুরামোহন ঐ সেবার জন্য নিয়মিত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময়ে

ঠাকুরের নির্দ্দেশে ঐবিষয়ে অনেক অধিক ব্যয় করিতেন। দেবদেবীসেবা ভিন্ন সাধুভক্তের সেবাতে তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। কারণ, ঠাকুরের শ্রীপদাশ্রয়ী মথুর তাঁহার শিক্ষায় সাধুভক্তগণকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সেজন্য দেখা যায়, ঠাকুর যখন এইকালে তাঁহাকে সাধুভক্তদিগকে অন্নদান ভিন্ন দেহরক্ষার উপযোগী বস্ত্র কম্বলাদি ও নিত্যব্যবহার্য্য কমণ্ডলু প্রভৃতি জলপাত্র দানের ব্যবস্থা করিতে বলেন, তখন ঐ বিষয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি ঐ সকল পদার্থ ক্রয় করিয়া কালীবাটীর একটী গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখেন এবং ঐ নূতন ভাণ্ডারের দ্রব্যসকল ঠাকুরের আদেশানুসারে বিতরিত হইবে, কর্ম্মচারীদিগকে এইরূপ বলিয়া দেন। আবার, উহার কিছুকাল পরে সকল সম্প্রদায়ের সাধুভক্তদিগকে সাধনার অনুকূল পদার্থসকল দান করিয়া তাঁহাদিগের সেবা করিবার অভিপ্রায় ঠাকুরের মনে উদিত হইলে, মথুর তদ্বিষয় জানিতে পারিয়া উহারও বন্দোবস্ত করিয়া দেন।* সম্ভবতঃ সন ১২৬৯—৭০সালেই মথুরমোহন ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে ঐরূপে সাধুসেবার বহুল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ঐরূপ কার্য্যে রাণী রাসমণির কালীবাটীর অদ্ভুত আতিথেয়তার কথা সাধুভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বত্র সমধিক প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। রাণী রাসমণির জীবৎকাল হইতেই কালীবাটী তীর্থপর্য্যটনশীল সাধু-পরিব্রাজকগণের নিকটে পথিমধ্যে কয়েক দিন বিশ্রামলাভের স্থান-বিশেষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিলেও, এখন উহার সুনাম চারিদিকে সমধিক প্রসারিত হইয়া পড়ে এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ভুক্ত সাধকাগ্রণী সাধুভক্তসকলে ঐ স্থানে উপস্থিত ও আতিথ্যগ্রহণে

---

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—২য় অধ্যায় ৬৫ পৃষ্ঠা।

পরিতৃপ্ত হইয়া উহার সেবা-পরিচালককে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ঐরূপে সমাগত বিশিষ্ট সাধুদিগের কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে যতদূর শুনিয়াছি, তাহা অন্যত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি। * এখানে তাহার পুনরুল্লেখ—'জটাধারী' নামক যে রামাইত সাধুর নিকট ঠাকুর রাম-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও 'শ্রীশ্রীরামলীলা'-নামক শ্রীরামচন্দ্রের বালবিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমনকাল পাঠককে জানাইবার জন্য। সম্ভবতঃ ১২৭০ সালেই তিনি ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জটাধারীর আগমন।

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি জটাধারীর অদ্ভুত অনুরাগ ও ভালবাসার কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। বালক রামচন্দ্রের মূর্ত্তিই তাঁহার সমধিক প্রিয় ছিল; এবং শ্রীরামচন্দ্রের ঐরূপ মূর্ত্তির বহুকাল পর্য্যন্ত সানুরাগ সেবায় তাঁহার মন ভাবরাজ্যে আরূঢ় হইয়া এমন একটা অন্তর্ম্মুখী তন্ময়াবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই তিনি দেখিতে পাইতেন, শ্রীরামচন্দ্রের জ্যোতিঘন বালবিগ্রহ সত্যসত্যই তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার ভক্তিপূত সেবা গ্রহণ করিতেছেন! প্রথম প্রথম ঐরূপ দর্শন ক্ষণকালের জন্য মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দে বিহ্বল করিত। কালে সাধনায় তিনি যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ঐ দর্শনও তত ঘনীভূত হইয়া বহুকালব্যাপী এবং ক্রমে নিত্য-পরিদৃষ্ট বিষয়সকলের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঐরূপে ভাবারূঢ় হইয়া বাল-শ্রীরামচন্দ্রকে একপ্রকার নিত্যসহচর-রূপে লাভ করিয়া এবং যদবলম্বনে

---

* গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ২য় অধ্যায়।

ঐ দিব্য দর্শন তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল সেই রামলালা বিগ্রহের সেবাতে আপনাকে নিত্য নিযুক্ত রাখিয়া, জটাধারী যদৃচ্ছাক্রমে ভারতের নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এই সময়ে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রামলালার সেবায় নিযুক্ত জটাধারী যে, বাল-রামচন্দ্রের ভাব-ঘন মূর্ত্তির যখন তখন দর্শন লাভ করেন, একথা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। লোকে দেখিত, তিনি নিত্য সদা-সর্ব্বক্ষণ একটী ধাতুময় বালবিগ্রহের সেবা অপূর্ব্ব নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিয়া থাকেন, এই পর্য্যন্ত। ভাবরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর ঠাকুরের দৃষ্টি কিন্তু জটাধারীর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই স্থূল যবনিকার অন্তরাল ভেদ করিয়া অন্তরের গূঢ় রহস্য অবধারণ করিল, এবং উহাতে তিনি জটাধারীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তাঁহার সেবার অনুকূল যাবতীয় দ্রব্য-সম্ভার তাঁহাকে সাহ্লাদে যোগাইতে লাগিলেন। তদ্ভিন্ন ঠাকুর তাঁহার নিকটে প্রতিদিন বহুক্ষণ অবস্থান করিয়া, তাঁহার সেবা ভক্তিভরে নিরীক্ষণও করিতে লাগিলেন। জটাধারী শ্রীরামচন্দ্রের যে ভাবঘন দিব্য মূর্ত্তির দর্শন পাইতেন, সেই মূর্ত্তির দিব্যদর্শন পাইয়াছিলেন বলিয়াই যে, ঠাকুর এখন ঐরূপ করিয়াছিলেন, একথা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি।* জটাধারীর সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ ক্রমে বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ণ ঘনিষ্ঠ ভাব ধারণ করিয়াছিল।

জটাধারীর সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, ঠাকুর এই সময়ে প্রকৃতিভাবে

* গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ২য় অধ্যায়, ৫৩ পৃষ্ঠা।

ভাবিত হইয়া অনেক কাল অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার নিত্যসঙ্গিনীরূপে আপনাকে ধারণা করিয়া স্বহস্তে পুষ্পহারাদি গ্রন্থনপূর্ব্বক তাঁহার বেশভূষা করিয়া দেওয়া, গ্রীষ্মাপনোদনের জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে চামর ব্যজন করা, মথুরকে বলিয়া নূতন নূতন অলঙ্কার নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহাকে পরাইয়া দেওয়া এবং স্ত্রীবেশ ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাকে নৃত্যগীতাদি শ্রবণ করান প্রভৃতি কার্য্যে তিনি এই সময়েই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অবশ্য ঐরূপ করিবার প্রবল প্রেরণা তাঁহার মনে স্বভাবতঃ উদয় হওয়াতেই ঠাকুর এখন ঐরূপ কার্য্যসকলের অনুষ্ঠান করিতেন। জটাধারীর এই কালে আগমনে ও তৎসহ আলাপে ঠাকুরের মনে বৈদেহীবল্লভ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি-প্রীতি পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিল। উহার প্রেরণায় তিনি এখন তাঁহার যে ভাবঘন মূর্ত্তির দর্শন লাভ করিলেন, তাহা শ্রীরামচন্দ্রের শৈশবাবস্থার প্রতিরূপ। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতিভাবের প্রাবল্যে তাঁহার মন যে এখন ঐ দিব্য শিশুর প্রতি বাৎসল্যরসে পূর্ণ হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? মাতা নিজ হৃদয়ে শিশুপুত্রের প্রতি যে অপূর্ব্ব প্রীতি ও প্রেমাকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন, ঠাকুর ঐ দিব্য শিশুর প্রতি অন্তরে সেইরূপ আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। ঐরূপ প্রীতি এবং প্রেমাকর্ষণই যে তাঁহাকে এখন জটাধারীর বালবিগ্রহের পার্শ্বে বসাইয়া কিরূপে কোথা দিয়া সময় অতীত হইতেছে তাহা জানিতে দিত না, একথা নিঃসন্দেহ। কারণ, তাঁহার নিজমুখে আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, ঐ অদ্ভুত উজ্জ্বল শিশু মধুময় নানা বালচেষ্টাদির দ্বারা ভুলাইয়া তাঁহাকে নিজ সকাশে ধরিয়া রাখিতে নিত্য প্রয়াস পাইত, তাঁহার অদর্শনে

স্ত্রীভাবের উদয়ে ঠাকুরের বাৎসল্যভাব সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া।

ব্যথিত হইয়া আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথ নিরীক্ষণ করিত এবং নিষেধ না শুনিয়া তাঁহার সহিত যথাতথা গমনে উদ্যত হইত!

ঠাকুরের উদ্যমশীল মন কখন কোন কার্য্যের অর্দ্ধেক নিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিত না। স্থূল কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকাশিত তাঁহার ঐরূপ স্বভাব, সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যের বিষয়সকলের অধিকারেও পরিদৃষ্ট হইত। দেখা যাইত, স্বাভাবিক প্রেরণায় কোন ভাব উপস্থিত হইয়া তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিলে, তিনি উহার চরম সীমা পর্য্যন্ত উপলব্ধি না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। তাঁহার ঐরূপ স্বভাবের অনুশীলন করিয়া কোন কোন পাঠক হয়ত ভাবিয়া বসিবেন, কিন্তু উহা কি ভাল?—যখন যে ভাব অন্তরে উদয় হইবে, তখনই তাহার হস্তের ক্রীড়াপুত্তল-স্বরূপ হইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলে মানবের কখন কি কল্যাণ হইতে পারে?—দুর্ব্বল মানবের অন্তরে সু এবং কু—সকলপ্রকার ভাবই যখন অনুক্ষণ উদয় হইতেছে, তখন ঠাকুরের ঐ প্রকার স্বভাব তাঁহাকে কখন বিপথগামী না করিলেও, সাধারণের অনুকরণীয় হইতে পারে না। কেবলমাত্র সুভাবসকলই অন্তরে উদিত হইবে, আপনার প্রতি এতদূর বিশ্বাস স্থাপন করা মানবের কখনই কর্ত্তব্য নহে। অতএব সংযমরূপ রশ্মি দ্বারা ভাবরূপ অশ্বসকলকে সর্ব্বদা নিয়ত রাখাই মানবের লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

কোন ভাবের উদয় হইলে উহার চরম উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা; ঐরূপ করা কর্ত্তব্য কি না।

তাঁহাদিগের পূর্ব্বোক্ত কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও, উত্তরে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। কামকাঞ্চনৈক-নিবদ্ধ-দৃষ্টি ভোগ-লোলুপ মানব-মনের আপনার প্রতি অতদূর বিশ্বাস স্থাপন কখনও যে কর্ত্তব্য নহে, একথা

ঠাকুরের ন্যায় নির্ভরশীল সাধকের ভাব-সংযমের আবশ্যকতা নাই—উহার কারণ।

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব ইতরসাধারণ মানবের পক্ষে ভাবসংযমনের আবশ্যকতাসম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের উত্থাপন করা নিতান্ত অদূরদৃষ্টি মূঢ় ব্যক্তিরই সম্ভবপর। কিন্তু বেদাদি শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বরকৃপায় বিরল কোন কোন সাধকের নিকট সংযম নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সহজাবস্থা হইয়া দাঁড়ায় এবং তাঁহাদিগের মন তখন কামকাঞ্চনের আকর্ষণ হইতে এক-কালে মুক্তিলাভ করিয়া কেবলমাত্র সুভাবসমূহের নিবাসস্থলরূপে পরিণত হয়। ঠাকুরও বলিতেন—শ্রীশ্রীজগদম্বার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ঐরূপ মানবের মনে তাঁহার কৃপায় তখন কোন কুভাবই আর মস্তকোত্তলন করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হয় না—"মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) তাহার পা কখনও বেতালে পড়িতে দেন না।" ঐরূপ অবস্থাবিশিষ্ট মানব তৎকালে তাঁহার অন্তর্গত প্রত্যেক মনোভাবকে বিশ্বাস করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র ক্ষতি না হইয়া বরং তদ্দারা অপরের বিশেষ কল্যাণ সংসাধিত হয়। কারণ, দেহাভিমানবিশিষ্ট যে ক্ষুদ্র আমিত্বের প্রেরণায় আমরা স্বার্থপর হইয়া জগতের সমগ্র ভোগসুখাধিকারলাভকেও পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করি না, অন্তরের সেই ক্ষুদ্র আমিত্ব ঈশ্বরের বিরাট্ আমিত্বে চিরকালের জন্য বিসর্জ্জিত হওয়ায়, ঐরূপ মানবের পক্ষে স্বার্থসুখান্বেষণ তখন এককালে অসম্ভব হইয়া উঠে। বিরাট্ ঈশ্বরের সর্ব্বকল্যাণকরী ইচ্ছাই সুতরাং ঐ মানবের অন্তরে তখন অপরের কল্যাণসাধনের জন্য বিবিধ মনোভাবরূপে সমুদিত হইয়া থাকে। অথবা ঐরূপ অবস্থাপন্ন সাধক তখন 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' একথা প্রাণে প্রাণে অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া নিজ মনোগত ভাবসকলকে বিরাট্ পুরুষ ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়া উহাদিগের প্রেরণায় কার্য্য

করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না। এবং ফলেও দেখা যায়, তাঁহাদিগের ঐরূপ অনুষ্ঠানে অপরের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। ঠাকুরের ন্যায় অলোকসামান্য মহাপুরুষদিগের উক্তবিধ অবস্থা জীবনের অতি প্রত্যূষেই আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইজন্য ঐরূপ পুরুষদিগের জীবনেতিহাসে আমরা তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র যুক্তি তর্ক না করিয়া নিজ নিজ মনোগত ভাবসকলকে পূর্ণভাবে বিশ্বাসপূর্ব্বক অনেক সময়ে কার্য্যে অগ্রসর হইতে দেখিতে পাই। বিরাট্ ইচ্ছাশক্তির সহিত নিজ ক্ষুদ্রেচ্ছাকে সর্ব্বদা ঐরূপে অভিন্ন রাখিয়া, তাঁহারা মানবসাধারণের মনবুদ্ধির অবিষয়ীভূত বিষয়সকল তখন সর্ব্বদা ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হয়েন। কারণ, বিরাট্ মনে সূক্ষ্ম ভাবাকারে ঐসকল বিষয় পূর্ব্ব হইতেই প্রকাশিত থাকে।

ঐরূপ সাধক নিজ শরীরত্যাগের কথা জানিতে পারিয়াও উদ্বিগ্ন হন না—ঐবিষয়ে দৃষ্টান্ত।

আবার বিরাটেচ্ছার সর্ব্বদা সম্পূর্ণ অনুগত থাকায়, তাঁহারা এতদূর স্বার্থ ও ভয়শূন্য হয়েন যে, কি ভাবে কাহার দ্বারা তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র শরীর মন ধ্বংস হইবে তদ্বিষয় পর্য্যন্ত ঐ প্রকারে পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়া, ঐ বস্তু, ব্যক্তি ও বিষয়সকলের প্রতি কিছুমাত্র বিরাগসম্পন্ন না হইয়া পরম প্রীতির সহিত ঐ কার্য্য সম্পাদনে তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। কয়েকটী দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলেই আমাদের কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। দেখ—শ্রীরামচন্দ্র জনকতনয়া সীতাকে নিষ্পাপা জানিয়াও ভবিতব্য বুঝিয়া, তাঁহাকে বনে বিসর্জ্জন করিলেন। আবার, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়ানুজ লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিলে নিজ লীলাসম্বরণ অবশ্যম্ভাবী, একথা বুঝিয়াও ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 'যদুবংশ ধ্বংস হইবে', পূর্ব্ব হইতে একথা জানিতে পারিয়াও তৎপ্রতি-

রোধে বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া যাহাতে ঐ ঘটনা যথাকালে উপস্থিত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করিলেন। অথবা ব্যাধহস্তে আপনার নিধন জানিয়াও ঐ কাল উপস্থিত হইলে বৃক্ষপত্রান্তরালে সর্ব্বশরীর লুক্কায়িত রাখিয়া নিজ আরক্তিম চরণ-যুগল এমনভাবে ধারণ করিয়া রহিলেন, যাহাতে ব্যাধ উহা দেখিবামাত্র পক্ষিভ্রমে শাণিত শর নিক্ষেপ করিল। তখন নিজ ভ্রমের জন্য অনুতপ্ত ব্যাধকে আশীর্ব্বাদ ও সান্ত্বনাপূর্ব্বক তিনি যোগাবলম্বনে শরীর রক্ষা করিলেন।

মহামহিম বুদ্ধ, চণ্ডালের আতিথ্যগ্রহণে পরিনির্ব্বাণ-প্রাপ্তির কথা পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারিয়াও উহা স্বীকার-পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ ও সান্ত্বনার দ্বারা তাহাকে অপরের ঘৃণা ও নিন্দাবাদের হস্ত হইতে সম্যক্ রক্ষা করিয়া উক্ত পদবীতে আরূঢ় হইলেন। আবার স্ত্রীজাতিকে সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি প্রদান করিলে তৎ-প্রচারিত ধর্ম্ম শীঘ্র কলুষিত হইবে জানিতে পারিয়াও, মাতৃস্বসা আর্য্যা গৌতমীকে প্রব্রজ্যাগ্রহণে আদেশ করিলেন।

ঈশ্বরাবতার ঈশা, 'তাঁহার শিষ্য যুদা তাঁহাকে অর্থলোভে শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিবে এবং তাহাতেই তাঁহার শরীর ধ্বংস হইবে' একথা জানিতে পারিয়াও, তাহার প্রতি সমভাবে স্নেহপ্রদর্শন করিয়া আজীবন তাহার কল্যাণ-চেষ্টায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিলেন।

এইরূপে অবতারপুরুষদিগের ত কথাই নাই, সিদ্ধ জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের জীবনালোচনা করিয়াও আমরা ঐরূপ অনেক ঘটনা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। পূর্ব্বোক্ত পুরুষসকলের জীবনে একপক্ষে অসাধারণ উদ্যমশীলতার এবং অন্যপক্ষে বিরাটেচ্ছায়

সম্পূর্ণ নির্ভরতার সামঞ্জস্য করিতে হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, বিরাটেচ্ছার অনুমোদনেই তাঁহাদিগের মধ্য দিয়া উদ্যমের প্রকাশ হইয়া থাকে, নতুবা নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরেচ্ছার সম্পূর্ণ অনুগামী পুরুষসকলের অন্তর্গত স্বার্থ-সংস্কার-সমূহ এককালে বিনষ্ট হইয়া মন, এমন এক পবিত্রভূমিতে উপনীত হয়, যেখানে উহাতে শুদ্ধ ভিন্ন স্বার্থদুষ্ট ভাবসমূহের কখনও উদয় হয় না এবং ঐরূপ অবস্থাসম্পন্ন সাধকেরা নিশ্চিন্ত-মনে আপন মনোভাবসমূহে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক উহাদিগের প্রেরণায় কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া দোষভাগী হয়েন না। ঠাকুরের ঐরূপ অনুষ্ঠানসমূহ ইতরসাধারণ মানবের পক্ষে অনুকরণীয় না হইলেও, পূর্ব্বোক্ত প্রকার অসাধারণ অবস্থাসম্পন্ন সাধককে নিজ জীবন পরিচালনে বিশেষালোক প্রদান করিবে, সন্দেহ নাই। ঐরূপ অবস্থাসম্পন্ন পুরুষদিগের আহারবিহারাদি সামান্য স্বার্থবাসনাকে শাস্ত্র ভৃষ্ট বীজের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অর্থাৎ বৃক্ষলতাদির বীজসমূহ উত্তাপদগ্ধ হইলে তাহাদের জীবনী-শক্তি অন্তর্হিত হইয়া সমজাতীয় বৃক্ষলতাদি যেমন আর উৎপন্ন করিতে পারে না, ঐরূপ পুরুষদিগের সংসারবাসনা তদ্রূপ সংযম ও দিব্য-জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধীভূত হওয়ায়, উহারা তাঁহাদিগকে আর কখন ভোগতৃষ্ণায় আকৃষ্ট করিয়া বিপথগামী করিতে পারে না। ঠাকুরও ঐবিষয়ে বলিতেন, স্পর্শমণির সহিত সঙ্গত হইয়া লৌহের তরবারি স্বর্ণময় হইয়া যাইলে, উহার হিংসাক্ষম আকার মাত্রই বর্ত্তমান থাকে, উহা দ্বারা হিংসাকার্য্য আর করা চলে না।

ঐরূপ সাধকের মনে স্বার্থ-দুষ্ট বাসনা উদয় হয় না।

উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ বলিয়াছেন, এইপ্রকার অবস্থাসম্পন্ন সাধকেরা সত্যসঙ্কল্প হয়েন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের অন্তরে উদিত

সঙ্কল্পমাত্রই তখন সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনও হয় না। ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুরের মনে উদিত ভাবসকলকে বারংবার পরীক্ষার দ্বারা সত্য বলিয়া না দেখিতে পাইলে, আমরা ঋষিদিগের পূর্ব্বোক্ত কথায় কখনও বিশ্বাসবান্ হইতে পারিতাম না। আমরা দেখিয়াছি, কোনরূপ আহার্য্য গ্রহণ করিতে যাইয়া ঠাকুরের মন সঙ্কুচিত হইলে অনুসন্ধানে জানা যাইত, তাহা ইতিপূর্ব্বে বাস্তবিকই দোষদুষ্ট হইয়াছে—কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বরীয় কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার মুখ বন্ধ হইয়া যাইলে প্রমাণিত হইয়াছে, বাস্তবিকই ঐ ব্যক্তি ঐ বিষয়ের সম্পূর্ণ অনধিকারী—কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে ইহজীবনে ধর্ম্মলাভ হইবে না বলিয়া অথবা অত্যল্পমাত্র ধর্ম্মলাভ হইবে বলিয়া তাঁহার উপলব্ধি হইলে, বাস্তবিকই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে—কাহাকেও দেখিয়া তাঁহার মনে বিশেষ কোন ভাব বা দেবদেবীর কথা উদিত হইলে, উক্ত ব্যক্তি ঐ ভাবের বা ঐ দেবদেবীর অনুগত সাধক বলিয়া জানা গিয়াছে—অন্তরের ভাব-প্রেরণায় সহসা কাহাকেও কোন কথা তিনি বলিলে, ঐ কথায় ঐ ব্যক্তি বিশেষালোক প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার জীবন এককালে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ কত কথাই না তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়।

ঐরূপ সাধক সত্য-সঙ্কল্প হন—ঠাকুরের জীবনে ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্তসকল।

সে যাহা হউক, আমরা বলিয়াছি, জটাধারীর আগমনকালে ঠাকুর অন্তরের ভাব-প্রেরণায় অনেক সময় ললনাজনোচিত দেহ-মন-সম্পন্ন বলিয়া নিজ সম্বন্ধে ধারণাপূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্যসকলের অনুষ্ঠান করিতেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের মধুময় বাল্যরূপের দর্শনলাভে তৎপ্রতি বাৎসল্যভাবাপন্ন হইয়াছিলেন।

জটাধারীর নিকটে ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক বাৎসল্যভাব সাধন ও সিদ্ধি।

কুলদেবতা ৺রঘুবীরের পূজা ও সেবাদি যথারীতি সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি বহুপূর্ব্বে রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও তাঁহার প্রতি নিজ সেব্য প্রভু ভিন্ন অন্য কোনভাবে আকৃষ্ট হয়েন নাই। বর্ত্তমানে ঐ দেবতার প্রতি পূর্ব্বোক্ত নবীন ভাব উপলব্ধি করায়, তিনি এখন গুরুমুখে যথাশাস্ত্র ঐ ভাবসাধনোচিত মন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক উহার চরমোপলব্ধি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গোপালমন্ত্রে সিদ্ধকাম জটাধারী তাঁহার ঐরূপ আগ্রহ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সাহ্লাদে নিজ ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং ঠাকুরও ঐ মন্ত্রসহায়ে তৎপ্রদর্শিত পথে সাধনায় নিমগ্ন হইয়া কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের বালগোপালমূর্ত্তির দিব্য-দর্শন অনুক্ষণ লাভে সমর্থ হইলেন। বাৎসল্যভাবসহায়ে ঐ দিব্যমূর্ত্তির অনুধ্যানে তন্ময় হইয়া তিনি অচিরে প্রত্যক্ষ করিলেন—

"যো রাম দশরথকি বেটা,
ওহি রাম ঘট্‌-ঘট্‌মে লেটা।
ওহি রাম জগৎ পশেরা,
ওহি রাম সব্‌সে নেয়ারা।"

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র কেবলাত্র দশরথের পুত্র নহেন, কিন্তু প্রতি শরীর আশ্রয় করিয়া জীবভাবে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন! আবার ঐরূপে অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক জগদ্রূপে নিত্য-প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও, জগতের যাবতীয় পদার্থ হইতে পৃথক্, মায়া-রহিত নিগু‍র্ণ স্বরূপেও নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন! পূর্ব্বোদ্ধৃত হিন্দী দোঁহাটী আমরা ঠাকুরকে অনেক সময়ে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি।

শ্রীগোপালমন্ত্রে দীক্ষাপ্রদান ভিন্ন, জটাধারী 'রামলালা' নামক

যে বালগোপালবিগ্রহের এতকাল পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সেবা করিতেছিলেন, তাহাও ঠাকুরকে দিয়া গিয়াছিলেন। কারণ, ঐ জীবন্ত বিগ্রহ, এখন হইতে ঠাকুরের নিকটে অবস্থান করিবেন বলিয়া স্বীয় অভিপ্রায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। জটাধারী ও ঠাকুরকে লইয়া ঐ বিগ্রহের অপূর্ব্ব লীলাবিলাসের কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছি, * এজন্য তৎ-প্রসঙ্গের এখানে পুনরায় উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন।

ঠাকুরকে জটাধারীর 'রামলালা' বিগ্রহ দান।

বাৎসল্যভাবের পরিপুষ্টি ও চরমোৎকর্ষলাভের জন্য ঠাকুর যখন পূর্ব্বোক্তরূপে সাধনায় মনোনিবেশ করেন, তখন যোগেশ্বরী নাম্নী ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন, একথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাঠককে বলিয়াছি। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনে তিনিও বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন। বাৎসল্য ও মধুরভাব-সাধনকালে ঠাকুর তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি ? ঐ বিষয়ে কোন কথা আমরা তাঁহার নিকটে স্পষ্ট শ্রবণ করি নাই। তবে, বাৎসল্যভাবে আরূঢ়া হইয়া ব্রাহ্মণী অনেক সময় ঠাকুরকে বালগোপালরূপে দর্শনপূর্ব্বক সেবা করিতেন, একথা ঠাকুরের শ্রীমুখে ও হৃদয়ের নিকটে শুনিয়া অনুমিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের বালগোপালমূর্ত্তিতে বাৎসল্য-ভাব আরোপিত করিয়া উহার চরমোপলব্ধি করিবার কালে এবং মধুরভাব সাধনকালে ঠাকুর তাঁহার নিকট হইতে কিছু না কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশেষ কোন প্রকার সাহায্য

বৈষ্ণবমত সাধনকালে ঠাকুর ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহায়তা লাভ কতদূর করিয়াছিলেন।

---

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—২য় অধ্যায়, ৫৩-৫৫ পৃষ্ঠা এবং ৬১-৬২ পৃষ্ঠা দেখ।

না পাইলেও, ব্রাহ্মণীকে ঐরূপ সাধনসমূহে নিরতা দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে ঐ সকলের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া, ঠাকুরের মনে ঐ সকল ভাবসাধনের ইচ্ছা যে বলবতী হইয়া উঠে, একথা অন্ততঃ নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে পারা যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মধুরভাবের সারতত্ত্ব।

সাধক না হইলে সাধকজীবনের ইতিহাস বুঝা সুকঠিন। কারণ, সাধনা সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যের কথা। সেখানে রূপরসাদি বিষয়সমূহের মোহনীয় স্থূল মূর্ত্তিসকল নয়নগোচর হয় না, বাহ্যবস্তু ও ব্যক্তিসকলের অবলম্বনে ঘটনাবলীর বিচিত্র সমাবেশপারম্পর্য্য দেখা যায় না, অথবা রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বসমাকুল মানবমন প্রবৃত্তির প্রেরণায় অস্থির হইয়া ভোগসুখ করায়ত্ত করিবার নিমিত্ত অপরকে পশ্চাৎপদ করিতে যেরূপ উত্তম প্রয়োগ করে এবং বিষয়বিমুগ্ধ সংসার যাহাকে বীরত্ব ও মহত্ত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে—সেরূপ উন্মাদ উত্তমাদির কিছুমাত্র প্রকাশ নাই। সেখানে আছে কেবল সাধকের নিজ অন্তর ও তন্মধ্যস্থ জন্মজন্মান্তরাগত অনন্ত সংস্কারপ্রবাহ। আছে কেবল, বাহ্যবস্তু বা ব্যক্তিবিশেষের সংঘর্ষে আসিয়া সাধকের উচ্চভাব ও লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, এবং তদ্ভাবে মনের একতানতা আনয়ন করিবার ও তল্লক্ষ্যাভিমুখে

অগ্রসর হইবার জন্য নিজ প্রতিকূল সংস্কারসমূহের সহিত দৃঢ় সংকল্পপূর্ব্বক অনন্ত সংগ্রাম। আছে কেবল, বাহ্যবিষয়সমূহ হইতে সাধকমনের ক্রমে এককালে বিমুখ হইয়া নিজাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাওয়া, অন্তররাজ্যের গভীর গভীরতর প্রদেশসমূহে অবতীর্ণ হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ভাবস্তরসমূহের উপলব্ধি করা, এবং পরিশেষে নিজাস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া যদবলম্বনে সর্ব্বভাবের এবং অহংজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে এবং যদাশ্রয়ে উহারা নিত্য অবস্থান করিতেছে, সেই 'অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় একমেবাদ্বিতীয়ং' বস্তুর উপলব্ধি ও তাহার সহিত একীভূত হইয়া অবস্থিতি। পরে, সংস্কার-সমূহ এককালে পরিক্ষীণ হইয়া মনের সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক ধর্ম্ম চিরকালের মত যতদিন নাশ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত, যে পথাবলম্বনে সাধক-মন পূর্ব্বোক্ত অদ্বয় বস্তুর উপলব্ধিতে উপস্থিত হইয়াছিল, বিলোমভাবে সেই পথ দিয়া সমাধি অবস্থা হইতে পুনরায় বহির্জ্জগতের উপলব্ধিতে উহার উপস্থিত হওয়া। ঐরূপে সমাধি হইতে বাহ্য এবং বাহ্য হইতে সমাধি অবস্থায় সাধক-মনের গতাগতি পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাস আবার, সৃষ্টির প্রাচীনতম যুগ হইতে অদ্যাবধি এমন কয়েকটী সাধকমনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে, যাহাদের পূর্ব্বোক্ত সমাধি অবস্থাই যেন স্বাভাবিক অবস্থানভূমি—যেন, ইতরসাধারণ মানবের কল্যাণের জন্য কোনরূপে জোর করিয়া তাহারা কিছু কালের জন্য আপনাদিগকে সংসারের বাহ্য-ভূমিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

সাধকের কঠোর অন্তঃসংগ্রাম এবং লক্ষ্য।

অসাধারণ সাধকদিগের নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থানের স্বতঃপ্রবৃত্তি-শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ শ্রেণীভুক্ত সাধক।

সাধনেতিহাস আমরা যত অবগত হইব, ততই বুঝিব—তাঁহার মন পূর্ব্বোক্তশ্রেণীভুক্ত ছিল। তাঁহার লীলাপ্রসঙ্গ আলোচনায় যদি আমাদের ঐরূপ ধারণা উপস্থিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে, উহার জন্য লেখকের ত্রুটিই দায়ী। কারণ, তিনি আমাদিগকে বারম্বার বলিয়া গিয়াছেন, 'ছোট ছোট এক আধটা বাসনা জোর করিয়া রাখিয়া তদবলম্বনে মনটাকে তোদের জন্য নীচে নামাইয়া রাখি!—নতুবা উহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অখণ্ডে মিলিত ও একীভূত হইয়া, অবস্থানের দিকে।'

'শূন্য' এবং 'পূর্ণ' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট বস্তু এক পদার্থ।

সমাধিকালে উপলব্ধ অখণ্ড অদ্বয় বস্তুকে প্রাচীন ঋষিগণের কেহ কেহ—সর্ব্বভাবের অভাব বা শূন্য বলিয়া, আবার কেহ কেহ—সর্ব্বভাবের সম্মিলনভূমি পূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ফলে কিন্তু সকলে এক কথাই বলিয়াছেন। কারণ, সকলেই উহাকে সর্ব্বভাবের উৎপত্তি এবং লয়ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ বুদ্ধ যাহাকে সর্ব্বভাবের নির্ব্বাণভূমি শূন্য বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ভগবান্ শঙ্কর তাহাকেই সর্ব্বভাবের মিলনভূমি পূর্ণ বস্তু বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্যগণের মতামত ছাড়িয়া দিয়া উভয়ের কথা আলোচনা করিলে ঐরূপ প্রতিপন্ন হয়:

অদ্বৈতভাবের স্বরূপ।

শূন্য বা পূর্ণ বলিয়া উপলক্ষিত অদ্বৈতভাবভূমিই উপনিষৎ ও বেদান্তে ভাবাতীত অবস্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ, উহাতে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের মন সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সৃজন, পালন ও নিধনাদি লীলাপ্রসূত সমগ্র ভাবভূমির সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক সমরসমগ্ন হইয়া যায়। অতএব দেখা

যাইতেছে, সসীম মানবমন আধ্যাত্মিকরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শান্তদাস্যাদি যে পঞ্চভাবাবলম্বনে ঈশ্বরের সহিত নিত্য সম্বদ্ধ হয় সে সকল হইতে অদ্বৈতভাব একটী পৃথক্ অপার্থিব বস্তু। পৃথিবীর মানুষ, ইহপরকালে প্রাপ্ত সকল প্রকার ভোগসুখে এককালে উদাসীন হইয়া পবিত্রতাবলে দেবতাগণাপেক্ষা উচ্চ পদবী লাভ করিলে তবেই ঐভাব উপলব্ধি করে এবং সমগ্র সংসার ও উহার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা ঈশ্বর যাঁহাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, উক্ত ভাবসহায়ে সেই নির্গুণ ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষলাভে কৃতকৃতার্থ হয়।

শান্তাদি ভাবপঞ্চ এবং উহাদিগের সাধ্য বস্তু ঈশ্বর।

অদ্বৈতভাব এবং উহা দ্বারা উপলব্ধ নির্গুণব্রহ্মের কথা ছাড়িয়া দিলে আধ্যাত্মিকরাজ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররূপ পঞ্চভাব-প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের প্রত্যেকটীরই সাধ্য বস্তু ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্ম। অর্থাৎ সাধক মানব, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাববান্, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের প্রতি ঐসকল ভাবের অন্যতমের আরোপ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হয়, এবং সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বভাবাধার ঈশ্বরও তাহার মনের ঐকান্তিকতা ও একনিষ্ঠা দেখিয়া তাহার ভাবপরিপুষ্টির জন্য ঐ ভাবানুরূপ তনু ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। ঐরূপেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঈশ্বরের নানা ভাবময় চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি ধারণ এবং এমন কি, স্থূল মনুষ্যবিগ্রহে পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইয়া সাধকের অভীষ্টপূর্ণ করণের কথা শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়।

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব, অন্য সকল মানবের সহিত

যে সকল ভাব লইয়া নিত্য সম্বদ্ধ থাকে, শান্ত দাস্যাদি পঞ্চভাব সেই পার্থিব ভাবসমূহেরই সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ প্রতিকৃতিস্বরূপ। দেখা যায়, সংসারে আমরা পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, সখা, সখী, প্রভু, ভৃত্য, পুত্র, কন্যা, রাজা, প্রজা, গুরু, শিষ্য প্রভৃতির সহিত এক একটা বিশেষ সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া থাকি এবং শত্রু না হইলে ইতরসকলের সহিত শ্রদ্ধাসংযুক্ত শান্ত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করি। ভক্ত্যাচার্য্যগণ ঐ সম্বন্ধসকলকেই শান্তাদি পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন এবং অধিকারিভেদে উহাদিগের অন্যতমকে মুখ্যরূপে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে আরোপ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কারণ, শান্তাদি পঞ্চভাবের সহিত জীব সংসারসম্বন্ধে নিত্য পরিচিত থাকায় তদবলম্বনে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সুগম হইবে। শুধু তাহাই নহে, প্রবৃত্তিমূলক ঐসকল সম্বন্ধাশ্রিত ভাবের প্রেরণায় রাগদ্বেষাদি যে সকল বৃত্তি তাহার মনে উদিত হইয়া তাহাকে সংসারে ইতিপূর্ব্বে নানা কুকর্ম্মে রত করাইতেছিল, ঈশ্বরার্পিত সম্বন্ধাশ্রয়ে সেই সকল বৃত্তি তাহার মনে উত্থিত হইলেও উহাদিগের প্রবল বেগ তাহাকে ঈশ্বরদর্শনরূপ লক্ষ্যাভিমুখেই অগ্রসর করাইয়া দিবে। যথা—সকল দুঃখের কারণস্বরূপ হৃদ্‌রোগ কাম তাহাকে ঈশ্বরদর্শন কামনায় নিযুক্ত রাখিবে, ঐ দর্শনপথের প্রতিকূল বস্তু ও ব্যক্তিসকলের উপরেই তাহার ক্রোধ প্রযুক্ত হইবে, সাধ্য বস্তু ঈশ্বরের অপূর্ব্ব প্রেম সৌন্দর্য্য সম্ভোগলোভেই সে উন্মত্ত ও মোহিত হইবে এবং ঈশ্বরের পুণ্যদর্শনলাভে কৃতকৃতার্থ ব্যক্তিসকলের অপূর্ব্ব ধর্ম্মশ্রী দেখিয়া তল্লাভের জন্য সেও কাতর হইয়া উঠিবে।

শান্তাদি ভাবপঞ্চের স্বরূপ। উহারা জীবকে কিরূপে উন্নত করে।

ধন্য হইয়া থাকে। ঐরূপে মহাভাবস্বরূপিণী* শ্রীরাধিকার ভাবানুধ্যানে নিজ সুখবাঞ্ছা এককালে পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখে সুখী হওয়াই এই পথে সাধকের চরম লক্ষ্য।

স্বাধীনা নায়িকার সর্ব্বগ্রাসী প্রেম ঈশ্বরে আরোপ করিতে হইবে।

সামাজিক বিধানে বিবাহিত নায়ক নায়িকার পরস্পরের প্রতি প্রেম—জাতি, কুল, শীল, লোকভয়, সমাজভয় প্রভৃতি নানা বাহ্য বিষয়ের দ্বারা নিয়মিত হইয়া প্রবাহিত হয়। ঐরূপ নায়ক নায়িকা ঐ প্রকার নিয়মসকলের সীমার ভিতরে অবস্থানপূর্ব্বক নানা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, পরস্পরের সুখসম্পাদনে যথাসম্ভব ত্যাগস্বীকার করিয়া থাকে। বিবাহিতা নায়িকা সামাজিক কঠোর নিয়মবন্ধনসকল যথাযথ পালন করিতে যাইয়া অনেক সময় নায়কের প্রতি নিজ প্রেমসম্বন্ধ ভুলিতে বা হ্রস্ব করিতে সঙ্কুচিতা হয় না। স্বাধীনা নায়িকার প্রেমের আচরণ কিন্তু অন্যরূপ। প্রেমের প্রাবল্যে ঐরূপ নায়িকা অনেক সময় ঐ সকল নিয়মবন্ধনকে পদদলিত করিতে এবং সমাজপ্রদত্ত নিজ সামাজিক অধিকারের সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নায়কের সহিত সংযুক্তা হইতে কুণ্ঠিতা হয় না। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঐরূপ সর্ব্বগ্রাসী প্রেমসম্বন্ধ

---

* কৃষ্ণস্য সুখে পীড়শঙ্কয়া নিমিষস্যাপি অসহিষ্ণুতাদিকং যত্র স রূঢ়ো মহাভাবঃ। কোটিব্রহ্মাণ্ডগতং সমস্তসুখং যস্য সুখস্য লেশোঽপি ন ভবতি, সমস্তবৃশ্চিকসর্পাদিদংশকৃতদুঃখমপি যস্য দুঃখস্য লেশো ন ভবতি, এবম্ভূতে কৃষ্ণসংযোগবিয়োগয়োঃ সুখদুঃখে যতো ভবতঃ সঃ অধিরূঢ়ঃ' মহাভাবঃ। অধিরূঢ়স্যৈব মোদন মাদন ইতি দ্বৌ রূপৌ ভবতঃ। ইত্যাদি—

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ভক্তিগ্রন্থাবলী।

ঈশ্বরে আরোপ করিতে সাধককে উপদেশ করিয়াছেন, এবং বৃন্দাবনাধীশ্বরী শ্রীরাধা সেজন্যই আয়ান ঘোষের বিবাহিতা পত্নী হইয়াও, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্ব্বস্বত্যাগিনী বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন।

মধুরভাব অন্য সকল ভাবের সমষ্টি ও অধিক।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মধুরভাবকে শান্তাদি অন্য চারি প্রকার ভাবের সারসমষ্টি এবং ততোধিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ, প্রেমিকা নায়িকা ক্রীত-দাসীর ন্যায় প্রিয়ের সেবা করেন, সখীর ন্যায় সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাকে সুপরামর্শ দানপূর্ব্বক তাঁহার আনন্দে উল্লসিতা ও দুঃখে সমবেদনাযুক্তা হয়েন, মাতার ন্যায় সতত তাঁহার শরীর-মনের পোষণে এবং কল্যাণকামনায় নিযুক্তা থাকেন এবং ঐরূপে সর্ব্বপ্রকারে আপনাকে ভুলিয়া প্রিয়ের কল্যাণসাধন ও চিত্ত-বিনোদনপূর্ব্বক তাঁহার মন অপূর্ব্ব শান্তিতে আপ্লুত করিয়া থাকেন। যে নায়িকা ঐরূপে প্রেমপ্রভাবে আত্মবিস্মৃতা হইয়া প্রিয়ের কল্যাণ ও সুখের দিকে সর্ব্বতোভাবে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকেন, তাঁহার প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই সমর্থা প্রেমিকা বলিয়া ভক্তিগ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। স্বার্থগন্ধদুষ্ট অন্য সকল প্রকার প্রেম সমঞ্জসা ও সাধারণী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সমঞ্জসা শ্রেণীভুক্তা নায়িকা প্রিয়ের সুখের ন্যায় আত্মসুখের দিকেও সমভাবে লক্ষ্য রাখে এবং সাধারণী শ্রেণীভুক্তা নায়িকা কেবলমাত্র আত্মসুখের জন্য নায়ককে প্রিয় জ্ঞান করে।

শ্রীচৈতন্য মধুরভাব-সহায়ে কিরূপে লোক-কল্যাণ করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, কঠোর ত্যাগের আদেশে সাধকগণকে জীবন নিয়মিত করিতে এবং প্রেমে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার স্থলে দণ্ডায়মান হইতে শিক্ষাপ্রদান করিয়া ও নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-দেব তৎকালে দেশের ব্যভিচারনিবারণে ও কল্যাণসাধনে প্রয়াসী

প্রেমই ভাবসাধনার উপায় এবং ঈশ্বরের সাকার ব্যক্তিত্বই উহার অবলম্বন।

শান্তদাস্যাদি ভাবপঞ্চক ঐরূপে ঈশ্বরে প্রয়োগ করিতে জীব এক সময়ে বা একজনের নিকটে শিক্ষা করে নাই। যুগে যুগে নানা মহাপুরুষ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ সকল ভাবের এক দুই বা ততোধিক অবলম্বনে ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনায় নিযুক্ত হইয়া এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমে তাঁহাকে আপনার করিয়া লইয়া তাহাকে ঐরূপ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। ঐ সকল আচার্য্যগণের অলৌকিক জীবনালোচনায় একথার স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, একমাত্র প্রেমই ভাবসাধনার মূলে অবস্থিত এবং ঈশ্বরের উচ্চাবচ কোন প্রকার সাকার ব্যক্তিত্বের উপরেই ঐ প্রেম সর্ব্বদা প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ, দেখা যায়, অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি মানব যতদিন না করিতে পারে, ততদিন পর্য্যন্ত সে, ঈশ্বরের কোন না কোন প্রকার সসীম সাকার ব্যক্তিত্বেরই কল্পনা ও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়।

প্রেমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের লোপসিদ্ধি—উহাই ভাব সকলের পরিমাপক।

প্রেমের স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উহা প্রেমিকদ্বয়ের ভিতরে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমূলক ভেদোপলব্ধি ক্রমশঃ তিরোহিত করিয়া দেয়। ভাবসাধনায় নিযুক্ত সাধকের মন হইতেও উহা ক্রমে ঈশ্বরের অসীম ঐশ্বর্য্যজ্ঞান তিরোহিত করিয়া তাঁহাকে তাহার ভাবানুরূপ প্রেমাস্পদমাত্র বলিয়া গণনা করিতে সর্ব্বথা নিযুক্ত করে। দেখা যায়, ঐজন্য ঐপথের সাধক প্রেমে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে আপনার জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি নানা আবদার, অনুরোধ, অভিমান, তিরস্কারাদি করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। সাধককে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান ভুলাইয়া কেবলমাত্র তাঁহার প্রেম ও মাধুর্য্যের উপ-

লব্ধি করাইতে পূর্ব্বোক্ত ভাবপঞ্চকের মধ্যে যেটী যতদূর সক্ষম, সেটী ততদূর উচ্চভাব বলিয়া ঐপথে পরিগণিত হয়। শান্তাদি ভাবপঞ্চকের উচ্চাবচ তারতম্য নির্ণয় করিয়া মধুরভাবকে সর্ব্বোচ্চ পদবী প্রদান ভক্তাচার্য্যগণ ঐরূপেই করিয়াছেন। নতুবা উহাদিগের প্রত্যেকটীই যে, সাধককে ঈশ্বরলাভ করাইতে সক্ষম, একথা তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটীর চরম পরিপুষ্টিতে সাধক যে, আপনাকে বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র তাহার প্রেমাস্পদের সুখে সুখী হইয়া থাকে এবং বিরহকালে তাঁহার চিন্তায় তন্ময় হইয়া সময়ে সময়ে আপনার অস্তিত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত হারাইয়া বসে, একথা আধ্যাত্মিক ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ পাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রজগোপিকাগণ ঐরূপে আপনাদিগের অস্তিত্বজ্ঞান কেবলমাত্র বিস্মৃত হইতেন না কিন্তু সময়ে সময়ে আপনাদিগকে নিজ প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াও উপলব্ধি করিয়া বসিতেন। জীবের কল্যাণার্থ ঈশার শরীরত্যাগকালীন উৎকট দুঃখভোগের কথা চিন্তা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া কোন কোন সাধক সাধিকার অনুরূপ অঙ্গসংস্থান হইতে রক্তনির্গমের কথা খৃষ্টান-সম্প্রদায়ের ভক্তিগ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে। * অতএব বুঝা যাইতেছে—শান্তাদি ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটীর চরম পরিপুষ্টিতে সাধক প্রেমাস্পদের চিন্তায় তন্ময় হইয়া প্রেমের প্রাবল্যে তাঁহার সহিত পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হয় এবং অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য সাধক-জীবন ঐ বিষয়ে আমাদিগকে অদ্ভুত আলোক প্রদান করিয়াছে। ভাবসাধনে অগ্রসর হইয়া তিনি প্রত্যেক ভাবের চরম পরিপুষ্টি-তেই প্রেমাস্পদের সহিত প্রেমে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন এবং

শান্তদি ভাবের প্রত্যেকের সহায়ে চরমে অদ্বৈত ভাব উপলব্ধি বিষয়ে ভক্তিশাস্ত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের শিক্ষা।

* *Vide* Life of St. Francis of Assisi and St. Catharine of Sienna.

নিজাস্তিত্ব এককালে বিস্মৃত হইয়া অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন হইতে পারে, শান্ত, দাস্যাদি ভাবাবলম্বনে মানবমন কেমন করিয়া সর্ব্বভাবাতীত অদ্বয় বস্তুর উপলব্ধি করিবে? কারণ, অন্ততঃ দুই ব্যক্তির উপলব্ধি ব্যতীত উহাতে কোন প্রকার ভাবের উদয়, স্থিতি ও পরিপুষ্টি কুত্রাপি দেখা যায় না।

সত্য। কিন্তু কোনও ভাব যত পরিপুষ্ট হয়, ততই উহা আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া সাধকমন হইতে অপর সকল বিরোধী ভাবকে ক্রমে তিরোহিত করে। আবার যখন উহার চরম পরিপুষ্টি হয়, তখন সাধকের সমাহিত অন্তঃকরণ, ধ্যানকালে পূর্ব্বপরিদৃষ্ট 'তুমি' (সেব্য), 'আমি' (সেবক) এবং তদুভয়ের মধ্যগত দাস্যাদি সম্বন্ধ, সময়ে সময়ে বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র 'তুমি'-শব্দ-নির্দ্দিষ্ট সেব্য বস্তুতে প্রেমে এক হইয়া অচলভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে। ভারতের বিশিষ্ট আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, মানবমন কখনই যুগপৎ 'তুমি', 'আমি' ও তদুভয়ের মধ্যগত ভাবসম্বন্ধ উপলব্ধি করেনা। উহা একক্ষণে 'তুমি'-শব্দনির্দ্দিষ্ট বস্তুর এবং পরক্ষণে 'আমি'-শব্দাভিধেয় পদার্থের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে; এবং ঐ উভয় পদার্থের মধ্যে সর্ব্বদা দ্রুত পরিভ্রমণ করিবার জন্য উহাদিগের মধ্যে একটা ভাবসম্বন্ধ তাহার বুদ্ধিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তখন মনে হয়, যেন উহা উহাদিগকে এবং উহাদিগের মধ্যগত ঐ সম্বন্ধকে যুগপৎ প্রত্যক্ষ করিতেছে। পরিপুষ্ট ভাবের প্রভাবে মনের চঞ্চলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা ক্রমে পূর্ব্বোক্ত কথা ধরিতে সক্ষম হয়। ধ্যানকালে মন ঐরূপে যত বৃত্তিহীন হয় ততই সে ক্রমে বুঝিতে পারে যে,

শান্তাদি ভাবপঞ্চকের দ্বারা অদ্বৈতভাব লাভ বিষয়ে আপত্তি ও মীমাংসা।

এক অদ্বয় পদার্থকে দুই দিক হইতে দুই ভাবে দেখিয়া 'তুমি' ও 'আমি'রূপ দুই পদার্থের কল্পনা করিয়া আসিয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবসাধনার প্রাবল্যনির্দ্দেশ।

শান্ত-দাস্যাদি ভাবের প্রত্যেকটী পূর্ণ-পরিপুষ্ট হইয়া মানব-মনকে পূর্ব্বোক্তরূপে অদ্বয় বস্তুর উপলব্ধি করাইতে কত সাধকের কতকালব্যাপী চেষ্টার যে প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। শাস্ত্ররূপ আধ্যাত্মিক ইতিহাস পাঠে বুঝা যায়, এক এক যুগে ঐ সকল ভাবের এক একটী, মানবমনের উপাসনার প্রধান অবলম্বনীয় হইয়াছিল এবং উহা দ্বারাই ঐ যুগের বিশিষ্ট সাধককুল ঈশ্বরের, ও তাঁহাদিগের মধ্যে বিরল কেহ কেহ, অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দেখা যায়, বৈদিক ও বৌদ্ধযুগে প্রধানতঃ শান্তভাবের, ঔপনিষদিক যুগে শান্তভাবের চরম পরিপুষ্টিতে অদ্বৈতভাবের এবং দাস্য ও ঈশ্বরের পিতৃভাবের, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে শান্ত ও নিষ্কামকর্ম্ম-সংযুক্ত দাস্যভাবের, তান্ত্রিকযুগে ঈশ্বরের মাতৃভাব ও মধুরভাব-সম্বন্ধের কিয়দংশের এবং বৈষ্ণবযুগে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-ভাবের চরম পরিস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল।

শান্তাদি ভাবপঞ্চের পূর্ণ পরিপুষ্টিবিষয়ে ভারত এবং ভারতেতর দেশে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ঐরূপে অদ্বৈতভাবের সহিত শান্তাদি পঞ্চভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যাইলেও, ভারতেতর দেশীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়সকলে কেবলমাত্র শান্ত, দাস্য ও ঈশ্বরের পিতৃভাব-সম্বন্ধেরই প্রকাশ দেখা যায়। য়াহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায়সকলে রাজর্ষি সোলে-মানের সখ্য ও মধুরভাবাত্মক গীতাবলী প্রচলিত থাকিলেও, উহারা ঐ সকলের ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া ভিন্নার্থ কল্পনা করিয়া

থাকে। মুসলমানধর্ম্মের সুফি সম্প্রদায়ের ভিতর সখ্য ও মধুর ভাবের অনেকটা প্রচলন থাকিলেও, মুসলমান জনসাধারণ ঐরূপে ঈশ্বরোপাসনা কোরাণবিরোধী বলিয়া বিবেচনা করে। আবার ক্যাথলিক্ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশামাতা মেরির প্রতিমাবলম্বনে জগন্মাতৃত্বের পূজা প্রকারান্তরে প্রচলিত থাকিলেও, উহা ঈশ্বরের মাতৃভাবের সহিত প্রকাশ্যরূপে সংযুক্ত না থাকায়, ভারতে প্রচলিত জগজ্জননীর পূজার ন্যায় ফলদ হইয়া সাধককে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি করাইতে ও রমণীমাত্রে ঈশ্বরীয় বিকাশ প্রত্যক্ষ করাইতে সক্ষম হয় নাই। মাতৃভাবের ঐ প্রবাহ ফল্গু নদীর ন্যায় অর্দ্ধপথে অন্তর্হিত হইয়াছে।

সাধকের ভাবের গভীরত্ব যাহা দেখিয়া বুঝা যায়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কোন প্রকার ভাবসম্বন্ধাবলম্বনে সাধকমন ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হইলে উহা ক্রমে ঐ ভাবে তন্ময় হইয়া বাহ্য জগৎ হইতে বিমুখ হয় এবং আপনাতে আপনি ডুবিয়া যায়। ঐরূপে মগ্ন হইবার কালে মনের পূর্ব্বসংস্কারসমূহ ঐ পথে বাধাপ্রদান করিয়া, তাহাকে ভাসাইয়া পুনরায় বহির্ম্মুখ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। ঐজন্য প্রবল পূর্ব্বসংস্কাববিশিষ্ট সাধারণ মানবমনের একটীমাত্র ভাবে তন্ময় হওয়াও অনেক সময় এক জীবনের চেষ্টাতে হইয়া উঠে না। ঐরূপ স্থলে সে প্রথমে নিরুৎসাহ, পরে হতোদ্যম এবং তৎপরে সাধ্যবস্তুতে বিশ্বাস হারাইয়া, বাহ্যজগতের রূপরসাদি ভোগকেই সার ভাবিয়া বসে ও তল্লাভে পুনরায় ধাবিত হয়। অতএব বাহ্যবিষয়বিমুখতা, প্রেমাস্পদের ধ্যানে তন্ময়ত্ব এবং ভাবপ্রসূত উল্লাসই সাধকের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবার একমাত্র পরিমাপক বলিয়া ভাবাধিকারে পরিগণিত হইয়াছে।

কোন এক ভাবে তন্ময়ত্বলাভে অগ্রসর হইয়া যিনি কখন অন্তর্নিহিত পূর্ব্বসংস্কারসমূহের প্রবল বাধা উপলব্ধি করেন নাই, সাধকমনের অন্তঃসংগ্রামের কথা তিনি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিবেন না। যিনি উহা করিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন—কত দুঃখে মানবজীবনে ভাবতন্ময়ত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্বল্পকালে একের পর এক করিয়া সকল প্রকার ভাবে অদৃষ্টপূর্ব্ব তন্ময়ত্ব লাভ করিতে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া ভাবিবেন, ঐরূপ হওয়া মনুষ্যশক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে।

ঠাকুরকে সর্ব্বভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে দেখিয়া যাহা মনে হয়।

ভাবরাজ্যের সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল সাধারণ মানবমন বুঝিতে সক্ষম হয় নাই বলিয়াই কি অবতারপ্রথিত ধর্ম্মবীরদিগের সাধনেতিহাস সম্যক্ লিপিবদ্ধ হয় নাই? কারণ, তৎপাঠে দেখা যায়, তাঁহাদিগের সাধনপথে প্রবেশকালে বিষয়বৈরাগ্য ও তত্ত্যাগের কথা এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভের পরে তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া বিষয়বিমুগ্ধ মনের কল্যাণের জন্য যে অদ্ভুত শক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই কথারই সবিস্তার আলোচনা বিদ্যমান। দেখা যায়, অন্তরের পূর্ব্বসংস্কারসমূহকে বিধ্বস্ত ও সমূলে উৎপাটিত করিয়া আপনার উপর সম্যক্ প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য তাঁহারা সাধনকালে যে অপূর্ব্ব অন্তঃসংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার আভাসমাত্রই কেবল উহাতে আলোচিত হইয়াছে। অথবা রূপক এবং অতিরঞ্জিত বাক্যসহায়ে ঐ সংগ্রামের কথা এমনভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তদ্বিবরণের মধ্য হইতে সত্য বাহির করিয়া লওয়াআমাদিগের পক্ষে এখন সুকঠিন হইয়াছে। কয়েকটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন।

ধর্ম্মবীরগণের সাধনেতিহাস লিপিবদ্ধ না থাকা সম্বন্ধে আলোচনা।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোককল্যাণসাধনোদ্দেশে বিশেষ বিশেষ শক্তিলাভের জন্য অনেক সময় তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, একথা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে তিনি কিছুকাল জল বা পবনাহারপূর্ব্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন ইত্যাদি কথা ভিন্ন তাঁহার অন্তরের ভাবপরম্পরার বিবরণ পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ঐ কথা।

ভগবান্ বুদ্ধের সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া অভিনিষ্ক্রমণ ও পরে ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনের যতদূর বিশদেতিহাস পাওয়া যায়, তাঁহার সাধনেতিহাস ততদূর পাওয়া যায় না। তবে অন্যান্য ধর্ম্মবীরগণের ভাবেতিহাসের যেমন কিছুই পাওয়া যায় না, তাঁহার সম্বন্ধে তদ্রূপ না হইয়া ঐ বিষয়ের অল্প স্বল্প কিছু পাওয়া গিয়া থাকে। দেখা যায়—সিদ্ধিলাভে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আহার সংযম করিয়া তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসর একাসনে ধ্যান-তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন এবং অন্তঃপবন নিরোধপূর্ব্বক, 'আস্ফানক' নামক ধ্যানাভ্যাসে নিযুক্ত হইয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ কালে অন্তর্নিহিত পূর্ব্বসংস্কারসমূহের সহিত তাঁহার সংগ্রামের কথা লিপিবদ্ধ করিবার সময় স্থূল বাহ্য ঘটনার সহায়তা লইয়া গ্রন্থকার 'মারের' সহিত তাঁহার সংগ্রামকাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে ঐ কথা।

ভগবান্ ঈশার সাধনেতিহাসের কোন কথাই একপ্রকার লিপিবদ্ধ নাই। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়সের কয়েকটী ঘটনামাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াই গ্রন্থকার, ত্রিংশ বৎসরে জন্ নামক সিদ্ধ সাধুর নিকট হইতে তাঁহার অভিষেক গ্রহণপূর্ব্বক বিজন মরুপ্রদেশে একাকী প্রবিষ্ট হইয়া চল্লিশদিনব্যাপী ধ্যান-তপস্যার কথার এবং ঐ মরুপ্রদেশে 'শয়তান' কর্ত্তৃক প্রলোভিত

হইয়া জয়লাভপূর্ব্বক তাঁহার তথা হইতে প্রত্যাগমন ও লোক-কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হইবার কথার অবতারণা করিয়াছেন। উহার পরে তিনি তিন বৎসর মাত্র স্থূল শরীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ হইতে ত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি যে কি ভাবে কালযাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোন সংবাদই নাই।

ঈশার সম্বন্ধে ঐ কথা।

ভগবান্ শঙ্করের জীবনে ঘটনাবলীর পারম্পর্য্য অনেকটা পাওয়া যাইলেও তাঁহার অন্তরের ভাবেতিহাস অনেক স্থলে অনুমান করিয়া লইতে হয়।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের সাধনেতিহাসের অনেক কথা লিপিবদ্ধ পাওয়া যাইলেও, তাঁহার কামগন্ধহীন উচ্চ ঈশ্বরপ্রেমের কথা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিহারাদি অবলম্বনে রূপকচ্ছলে বর্ণিত হওয়ায়, মানবসাধারণে উহা অনেক সময় যথাযথভাবে বুঝিতে পারে না। একথা কিন্তু অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ধর্ম্মবীর শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার প্রধান প্রধান সাঙ্গোপাঙ্গেরা সখ্য, বাৎসল্য এবং বিশেষতঃ মধুর ভাবের আরম্ভ হইতে প্রায় চরম পরিস্ফূর্ত্তি পর্য্যন্ত সাধক-মনে যে যে অবস্থা ক্রমশঃ উপস্থিত হইয়া থাকে, সে সকল, রূপকের ভাষায় যতদূর বলিতে পারা যায়, ততদূর অতি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐরূপ হইলেও কিন্তু ঐ ভাবত্রয়ের প্রত্যেকটীর সর্ব্বোচ্চ তন্ময়াবস্থায় সাধকমন যে, প্রেমাস্পদের সহিত একত্ব অনুভব-পূর্ব্বক অদ্বয় বস্তুতে লীন হইয়া থাকে—এই চরম তত্ত্বটী তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য জীবন এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধনেতিহাস বর্ত্তমান যুগে আমাদিগকে ঐ

শ্রীচৈতন্য-সম্বন্ধে ঐ কথা এবং মধুর ভাবের চরম তত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

চরম তত্ত্ব বিশদভাবে শিক্ষা দিয়া জগতের যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যাবতীয় ধর্ম্মভাব যে, সাধকমনকে একই লক্ষ্যে আনয়ন করিয়া থাকে, এবিষয় সম্যক্ বুঝিতে সক্ষম করিয়াছে। তাঁহার জীবন হইতে শিক্ষিতব্য অন্য সকল কথা গণনায় না আনিলেও, তাঁহার কৃপায় কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া আমাদিগের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি যে প্রসারতা এবং সমন্বয়াভাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্য সমগ্র সংসার তাঁহার নিকট চিরকালের জন্য নিঃসংশয় ঋণী হইয়াছে।

মধুরভাব ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মধুরভাবই শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আধ্যাত্মিক জগতে প্রধান দান। তাঁহারা পথ প্রদর্শন না করিলে, কখনই উহা ঈশ্বরলাভের জন্য এত লোকের অবলম্বনীয় হইয়া তাহাদিগকে শান্তি ও বিমলানন্দের অধিকারী করিত না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জীবনে বৃন্দাবনলীলা যে নিরর্থক অনুষ্ঠিত হয় নাই, একথা তাঁহারাই প্রথমে বুঝিয়া অপরকে বুঝাইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভ্যুদয় না হইলে, শ্রীবৃন্দাবন সামান্য বনমাত্র বলিয়া পরিগণিত হইত।

বৃন্দাবনলীলার ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আপত্তি ও মীমাংসা।

পাশ্চাত্যের অনুকরণে বাহ্য ঘটনাবলীমাত্র লিপিবদ্ধ করিতে যত্নশীল বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণ বলিবেন, কিন্তু বৃন্দাবনলীলা তোমরা যেরূপ বলিতেছ, সেরূপ বাস্তবিক যে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; অতএব তোমাদের এতটা হাসি কান্না, ভাব মহাভাব সব যে শূন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে! বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তদুত্তরে বলিতে পারেন, পুরাণদৃষ্টে আমরা যেরূপ বলিতেছি, উহা যে তদ্রূপ হয় নাই, তদ্বিষয়ে তুমিই বা এমন কি

নিঃসংশয় প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার? তোমার ইতিহাস সেই বহু প্রাচীন যুগের দ্বার নিঃসংশয় উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, এ বিষয়ে যত দিন না প্রমাণ পাইব, ততদিন আমরা বলিব, তোমার সন্দেহই শূন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এক কথা, যদিই কখন তুমি ঐরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার, তাহা হইলেও আমাদের বিশ্বাসের এমন কি হানি হইবে? নিত্য-বৃন্দাবনে শ্রীভগবানের নিত্য-লীলাকে উহা কিছুমাত্র স্পর্শ করিবে না। ভাবরাজ্যে ঐ রহস্যলীলা চিরকাল সমান সত্য থাকিবে। চিন্ময় ধামে চিন্ময় রাধাশ্যামের ঐরূপ অপূর্ব্ব প্রেমলীলা যদি দেখিতে চাও, তবে প্রথমে কায়মনোবাক্যে কামগন্ধহীন হও এবং শ্রীমতীর সখীদিগের অন্যতমের পদানুগ হইয়া নিঃস্বার্থ সেবা করিতে শিক্ষা কর। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার হৃদয়ে শ্রীহরির লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন চির-প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং তোমাকে লইয়া ঐরূপ লীলার নিত্য অভিনয় হইতেছে।

বৃন্দাবনলীলার বুঝিতে হইলে ভাবেতিহাস বুঝিতে হইবে—এবিষয়ে ঠাকুর যাহা বলিতেন।

ভাবরাজ্যকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়া যিনি বাহ্যঘটনারূপ আলম্বন ভুলিতে এবং শুদ্ধ ভাবেতিহাসের আলোচনা করিতে শিখেন নাই, তিনি শ্রীবৃন্দাবনলীলার সত্যতা ও মাধুর্য্যের উপভোগে কখন সক্ষম হইবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ লীলার কথা সোৎসাহে বলিতে বলিতে যখন দেখিতেন, উহা তাঁহার সমীপাগত ইংরাজী-শিক্ষিত নব্যযুবকদলের রুচিকর হইতেছে না, তখন বলিতেন, "তোরা ঐ লীলার ভিতর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর মনের টান-টাই শুধু দেখ্‌না, ধর্‌না—ঈশ্বরে মনের ঐরূপ টান হ'লে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। দেখ্ দেখি, গোপীরা স্বামীপুত্র, কুল শীল, মান অপমান, লজ্জা ঘৃণা, লোক-ভয় সমাজ-ভয়—সব ছেড়ে

শ্রীগোবিন্দের জন্য কতদূর উন্মত্তা হয়ে উঠেছিল!—ঐরূপ কর্‌তে পার্‌লে, তবে ভগবান্ লাভ হয়।” আবার বলিতেন,—“কামগন্ধহীন না হ’লে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ভাব বুঝা যায় না। সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণকে দেখ্‌লেই গোপীদের মনে কোটী কোটী রমণসুখের অধিক আনন্দ হ’ত, দেহবুদ্ধি হারিয়ে যেত—তুচ্ছ দেহের রমণ কি আর তখন তাদের মনে উদয় হ’তে পারে রে! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হ’তে দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হয়ে তাদের শরীরকে স্পর্শ ক’রে, প্রতি রোমকূপে যে তাদের রমণসুখের অধিক আনন্দ অনুভব করাইত!”

স্বামী বিবেকানন্দ এক সময়ে ঠাকুরের নিকট শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার ঐতিহাসিকত্ব-সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া উহার মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুর তাহাতে তাঁহাকে বলেন, “আচ্ছা, ধরিলাম যেন শ্রীমতী রাধিকা বলিয়া কেহ কখন ছিলেন না—কোন প্রেমিক সাধক রাধাচরিত্র কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত চরিত্র কল্পনাকালে ঐ সাধককে শ্রীরাধার ভাবে এককালে তন্ময় হইতে হইয়াছিল, একথা ত মানিস্? তাহা হইলে উক্ত সাধকই যে, ঐকালে আপনাকে ভুলিয়া রাধা হইয়াছিল, এবং বৃন্দাবনলীলার অভিনয় যে ঐরূপে স্থূলভাবেও হইয়াছিল, একথা প্রমাণিত হয়।”

বাস্তবিক, শ্রীবৃন্দাবনে ভগবানের প্রেমলীলাসম্বন্ধে শত সহস্র আপত্তি উত্থাপিত হইলেও শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দ্বারা প্রথমাবিষ্কৃত এবং তাঁহাদিগের শুদ্ধ পবিত্র জীবনাবলম্বনে প্রকাশিত মধুরভাবসম্বন্ধ চিরকালই সত্য থাকিবে—চিরকালই ঐ বিষয়ের অধিকারী সাধক আপনাকে স্ত্রী ভাবিয়া এবং শ্রীভগবান্‌কে নিজ পতিস্বরূপে দেখিয়া, তাঁহার পুণ্যদর্শনলাভে

ধন্য হইবে, এবং ঐ ভাবের চরম পরিপুষ্টিতে শুদ্ধাদ্বয় ব্রহ্ম-স্বরূপেও প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীভগবানে পতিভাবারোপ করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য হইলেও, পুংশরীরধারী-দিগের নিকট উহা অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব একথা সহজে মনে উদিত হয় যে, ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব এরূপ বিসদৃশ সাধনপথ কেন লোকে প্রবর্ত্তিত করিলেন। তদুত্তরে বলিতে হয় যে, যুগাবতারগণের সকল কার্য্য লোককল্যাণের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সাধনপথের প্রবর্ত্তনও ঐজন্যই হইয়াছিল। সাধকগণ তৎকালে আধ্যাত্মিক রাজ্যে যেরূপ আদর্শ উপলব্ধি করিবার জন্য বহুকাল হইতে ব্যগ্র হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাদিগকে মধুরভাবরূপ পথে অগ্রসর করিয়াছিলেন। নতুবা ঈশ্বরাবতার নিত্যমুক্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজ কল্যাণের নিমিত্ত যে, ঐ ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়া উহার পূর্ণাদর্শ জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "হাতীর বাহিরের দাঁত যেমন শত্রুকে আক্রমণের জন্য এবং ভিতরের দাঁত খাদ্য চর্ব্বণ করিয়া নিজ শরীর পোষণের জন্য থাকে, তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে ও বাহিরে দুইপ্রকার ভাবের প্রকাশ ছিল। বাহিরের মধুরভাবসহায়ে তিনি লোক-কল্যাণ সাধন করিতেন এবং অন্তরের অদ্বৈতভাবে প্রেমের চরম পরিপুষ্টিতে ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বয়ং ভূমানন্দ অনুভব করিতেন।"

শ্রীচৈতন্যের পুরুষ-জাতিকে মধুরভাব-সাধনে প্রবৃত্ত করিবার কারণ।

পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, বৌদ্ধযুগের অবসানকালে দেশে বজ্রা-চার্য্যগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন—

নির্ব্বাণপ্রয়াসী মানবমন বাসনাসমূহের হস্ত হইতে মুক্তপ্রায় হইয়া ধ্যানসহায়ে যখন মহাশূন্যে লীন হইতে অগ্রসর হয়, তখন 'নিরাত্মা' নামক দেবী তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে ঐরূপ হইতে না দিয়া নিজাঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখেন, এবং তখন সাধকের শরীররূপ স্থূল ভোগায়তন না থাকিলেও, সূক্ষ্মশরীর বিশিষ্ট তাহাকে ইন্দ্রিয়জ সর্ব্ব ভোগসুখের সারসমষ্টি নিত্য উপভোগ করাইয়া থাকেন। স্থূলবিষয়ভোগত্যাগে ভাবরাজ্যের সূক্ষ্ম নিরবচ্ছিন্ন ভোগসুখপ্রাপ্তিরূপ তাঁহাদিগের প্রচারিত মত, কালে বিকৃত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন স্থূল ভোগসুখপ্রাপ্তিকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য করিয়া তুলিবে এবং দেশে ব্যভিচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ ঐ সকল বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মমত অবলম্বন করিয়া নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। উচ্চবর্ণদিগের অধিকাংশের মধ্যে তন্ত্রোক্ত বামাচার বিকৃত হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার সকাম পূজা ও উপাসনা দ্বারা অসাধারণ বিভূতি ও ভোগসুখলাভরূপ মতের প্রচলন হইয়াছিল। আবার, এই কালের যথার্থ সাধককুল আধ্যাত্মিক রাজ্যে ভাবসহায়ে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভে প্রয়াসী হইয়া পথের সন্ধান পাইতেছিলেন না। ভগবান্ শ্রীচৈতন্য নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া অদ্ভুত ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শ ঐ সকল সাধকদিগের সম্মুখে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে, শুদ্ধ পবিত্র হইয়া আপনাকে প্রকৃতি ভাবিয়া, ঈশ্বরকে পতিরূপে ভজনা করিলে জীব যে, সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন দিব্যানন্দলাভে সত্য সত্য সমর্থ হয়, তাহা তাহাদিগকে দেখাইয়া গেলেন, এবং স্থূলদৃষ্টি-সম্পন্ন সাধারণ জনগণের নিকটে ঈশ্বরের নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া

তৎকালে দেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা ও শ্রীচৈতন্য কিরূপে উহাকে উন্নীত করেন।

তাহাদিগকে নাম জপ ও উচ্চসঙ্কীর্ত্তনে নিযুক্ত করিলেন। ঐরূপে পথভ্রষ্ট লক্ষ্যবিচ্যুত বহুল বিকৃতবৌদ্ধসম্প্রদায়সকল তাঁহার কৃপায় পুনরায় আধ্যাত্মিক পথে উন্নীত হইয়াছিল। বিকৃত বামাচার-অনুষ্ঠানকারীর দলসকল প্রথম প্রথম প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও, পরে তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব জীবনাদর্শের অদ্ভুত আকর্ষণে ত্যাগশীল হইয়া, নিষ্কামভাবে পূজা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাতার দর্শন লাভ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া সেইজন্য কোন কোন গ্রন্থকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন, তিনি অবতীর্ণ হইবার কালে শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়সকলও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।*

মধুরভাবের স্থূল কথা।

সচ্চিদানন্দ-ঘন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ—এবং জগতের স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থ ও জীবগণের প্রত্যেকেই তাঁহার মহাভাবময়ী প্রকৃতির অংশ-সম্ভূত—অতএব, তাঁহার স্ত্রী। সেজন্য শুদ্ধ পবিত্র হইয়া জীব তাঁহাকে পতিরূপে সর্ব্বান্তঃকরণে ভজনা করিলে, তাঁহার কৃপায় তাহার গতি, মুক্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দপ্রাপ্তি হয়—ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকর্ত্তৃক প্রচারিত মধুরভাবের স্থূল কথা। মহাভাবে সর্ব্বভাবের একত্র সমাবেশ। প্রধানা গোপী শ্রীরাধা সেই মহাভাবস্বরূপিণী এবং অন্য গোপিকাগণের প্রত্যেকে মহাভাবান্তর্গত অন্তর্ভাবসকলের এক দুই বা ততোধিক ভাব-স্বরূপিণী। সুতরাং ব্রজগোপিকাগণের ভাবানুকরণে সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সাধক ঐ সকল অন্তর্ভাব নিজায়ত্ত করিতে সমর্থ হয় এবং পরিশেষে মহাভাবোত্থ মহানন্দের আভাস প্রাপ্ত হইয়া

* চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ দেখ।

মানসিক ভাবের প্রাবল্যে তাঁহার শারীরিক ঐরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া বুঝা যায়, 'মন সৃষ্টি করে এ শরীর।'

বেদান্তশাস্ত্রের শিক্ষা—মানবের মন তাহার শরীরকে বর্ত্তমান আকারে সৃষ্টি করিয়াছে—'মন সৃষ্টি করে এ শরীর' এবং তীব্র ইচ্ছা বা বাসনা-সহায়ে তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতনভাবে গঠিত করিতেছে। শরীরের উপর মনের ঐরূপ প্রভুত্বের কথা শুনিলে, আমরা বুঝিতে ও ধারণা করিতে সমর্থ হই না। কারণ, যেরূপ তীব্র বাসনা উপস্থিত হইলে মন অন্য সকল বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিষয়বিশেষে কেন্দ্রীভূত হয় ও অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশ করে, সেই-রূপ তীব্র বাসনা আমরা কোন বিষয় লাভ করিবার জন্যই অনুভব করি না। বিষয়বিশেষ উপলব্ধি করিবার তীব্র বাসনায় ঠাকুরের শরীর স্বল্পকালে ঐরূপে পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, বেদান্তের পূর্ব্বোক্ত কথা সবিশেষ প্রমাণিত হইতেছে, একথা বলা বাহুল্য। পদ্ম-লোচনাদি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা ঠাকুরের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল শ্রবণপূর্ব্বক বেদপুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের সিদ্ধ ঋষিকুলের ঐ বিষয়ক উপলব্ধিসকলের সহিত মিলাইতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার উপলব্ধিসকল বেদপুরাণকে অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে!" মানসিক ভাবের প্রাবল্যে ঠাকুরের শরীরিক পরিবর্ত্তন সকলের অনুশীলনে তদ্রূপ স্তম্ভিত হইয়া বলিতে হয়,—তাঁহার শারীরিক বিকারসমূহ শারীরবিজ্ঞান-রাজ্যের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক উহাতে অপূর্ব্ব যুগান্তর উপস্থিত করিবার সূচনা করিয়াছে।

সে যাহা হউক, ঠাকুরের পতিভাবে ঈশ্বরপ্রেম এখন পরিশুদ্ধ ও ঘনীভূত হওয়াতেই, তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী

ঠাকুরের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ।

রাধারাণীর কৃপা অনুভব করিয়াছিলেন এবং ঐ প্রেমের প্রভাবে স্বল্পকাল পরেই সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। দৃষ্ট মূর্ত্তি অন্য সকলের ন্যায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। ঐ দর্শন লাভের দুই তিন মাস পরে পরমহংস শ্রীমৎ তোতাপুরী আসিয়া তাঁহাকে বেদান্তপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতভাব সাধনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন! অতএব বুঝা যাইতেছে,—মধুরভাব সাধনায় সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর কিছুকাল ঐ ভাবসহায়ে ঈশ্বরসম্ভোগে কালযাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি,—ঐ কালে শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় এককালে তন্ময় হইয়া তিনি নিজ পৃথক অস্তিত্ব-বোধ হারাইয়া কখন আপনাকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, আবার কখন বা আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকলকে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বলিয়া দর্শন করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে যখন আমরা গমনাগমন করিতেছি তখন তিনি একদিন বাগান হইতে একটী ঘাসফুল সংগ্রহ করিয়া হর্ষোৎফুল্লবদনে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, —"তখন তখন (মধুরভাব-সাধনকালে) যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতাম, তাঁহার অঙ্গের এই রকম রং ছিল।"

যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের মনে প্রকৃতি হইবার বাসনা।

অন্তরস্থ প্রকৃতিভাবের প্রেরণায় যৌবনের প্রারম্ভে কামার-পুকুরে বাস করিবার কাল হইতে ঠাকুরের মনে এক প্রকার বাসনার উদয় হইত। ব্রজগোপীগণ স্ত্রীশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেমে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিয়া-ছিলেন জানিয়া, ঠাকুরের মনে হইত, তিনি যদি স্ত্রীশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে গোপিকাদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে ভজনা ও লাভ করিয়া ধন্য

হইয়াছিলেন। ফলেও তৎকালে তদীয় ভাব ও উপদেশ পথ-ভ্রষ্টকে পথ দেখাইয়া, সমাজচ্যুতদিগকে নবীন সমাজবন্ধনে আনিয়া, জাতিবহির্ভূতদিগকে ভগবদ্ভক্তরূপ জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া এবং সর্ব্বসম্প্রদায়ের গোচরে ত্যাগবৈরাগ্যের পবিত্র উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়া, অশেষ লোককল্যাণ সাধিত করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে—সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রণয় ও মিলনসম্ভূত 'অষ্ট সাত্ত্বিকবিকার' * নামক মানসিক ও শারীরিক বিকারসমূহ শ্রীশ্রীজগৎস্বামীর তীব্র ধ্যানানুচিন্তনে পবিত্রচেতা সাধকের সত্যসত্যই উপস্থিত হইয়া থাকে, একথা নিঃসংশয় প্রমাণিত করিয়া ভগবান্ শ্রীচৈতন্যপ্রচারিত মধুরভাব তৎকালে অলঙ্কার শাস্ত্রকে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রসকলের অঙ্গীভূত করিয়াছিল, কুকাব্য-সকলকে উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবে রঞ্জিত করিয়া সাধকমনের উপভোগ্য ও উন্নতিবিধায়ক করিয়াছিল, এবং শান্তভাবানুষ্ঠানে অবশ্য-পরিহর্ত্তব্য কামক্রোধাদি ইতর ভাবসমূহ, শ্রীভগবান্‌কে আপনার করিয়া লইয়া তন্নিমিত্ত এবং তাঁহারই উপর সাধককে প্রয়োগ করিতে শিখাইয়া তাহার সাধনপথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

বেদান্তবিৎ মধুরভাব-সাধনকে যে ভাবে সাধকের কল্যাণকর বলিয়া গ্রহণ করেন।

পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত বর্ত্তমান যুগের নব্য সম্প্রদায়ের চক্ষে মধুরভাব, পুংশরীরধারীদিগের পক্ষে অস্বাভাবিক ও বিসদৃশ বলিয়া প্রতীত হইলেও, বেদান্তবাদীর নিকটে উহার সমুচিত মূল্য নির্দ্ধারিত হইতে বিলম্ব হয় না। তিনি দেখেন,

---

* যে চিত্তং তনুঞ্চ ক্ষোভয়ন্তি তে সাত্ত্বিকাঃ। তে অষ্টৌ স্তম্ভ স্বেদঃ রোমাঞ্চ-স্বরভেদ-বেপথু-বৈবর্ণ্যাশ্রুপ্রলয়াঃ ইতি। তে ধূমায়িতা জ্বলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্তা সুদীপ্তা ইতি পঞ্চবিধা যথোত্তরসুখদাঃ স্যুঃ।—আকরগ্রন্থ।

ভাবসমূহই বহুকালাভ্যাসে মানব-মনে দৃঢ়সংস্কাররূপে পরিণত হয় এবং জন্মজন্মাগত ঐরূপ সংস্কারের জন্যই মানব এক অদ্বয় ব্রহ্ম-বস্তুর স্থলে এই বিচিত্র জগৎ দেখিতে পাইয়া থাকে। ঈশ্বরানুগ্রহে এই মুহূর্ত্তে যদি সে জগৎ নাই বলিয়া ঠিক্ ঠিক্ ভাবনা করিতে পারে, তবে তদ্দণ্ডেই উহা তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সম্মুখ হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইবে। জগৎ আছে, ভাবে বলিয়াই মানবের নিকট জগৎ বর্ত্তমান। আমি পুরুষ বলিয়া আপনাকে ভাবি বলিয়াই পুরুষভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছি এবং অন্যে স্ত্রী বলিয়া ভাবে বলিয়াই স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। আবার, মানবহৃদয়ে এক ভাব প্রবল হইয়া অপর সকল বিপরীত ভাবকে যে সমাচ্ছন্ন এবং ক্রমে বিনষ্ট করে, ইহাও নিত্যপরিদৃষ্ট। অতএব ঈশ্বরের প্রতি মধুরভাবসম্বন্ধের আরোপ করিয়া উহার প্রাবল্যে সাধকের নিজ মনের অন্য সকল ভাবকে সমাচ্ছন্ন এবং ক্রমে উৎসাদিত করিবার চেষ্টাকে বেদান্তবিৎ অন্য কণ্টকের সাহায্যে পদবিদ্ধ কণ্টকের অপনয়নের চেষ্টার ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকেন। মানবমনের অন্য সকল সংস্কারের অবলম্বনস্বরূপ 'আমি দেহী' বলিয়া বোধ এবং তদ্দেহসংযোগে 'আমি পুরুষ বা স্ত্রী' বলিয়া সংস্কারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। শ্রীভগবানে পতি-ভাবারোপ করিয়া 'আমি স্ত্রী' বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে সাধক পুরুষ আপনার পুংস্ত্ব ভুলিতে সক্ষম হইলে, তিনি যে উহার পরে 'আমি স্ত্রী' এ ভাবকেও অতি সহজে নিক্ষেপ করিয়া ভাবাতীত অবস্থায় উপনীত হইবেন, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব মধুরভাবে সিদ্ধ হইলে সাধক যে, ভাবাতীত ভূমির অতি নিকটেই উপস্থিত হইবেন বেদান্তবাদী দার্শনিকের চক্ষে ইহাই সর্ব্বথা প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি রাধাভাব প্রাপ্ত হওয়াই সাধকের

চরম লক্ষ্য ? উত্তরে বলিতে হয়, বৈষ্ণব গোস্বামিগণ বর্ত্তমানে উহা অস্বীকারপূর্ব্বক সখীভাবপ্রাপ্তিই সাধ্য এবং মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার ভাবলাভ সাধকের পক্ষে অসাধ্য বলিয়া প্রচার করিলেও, উহাই সাধকের চরম লক্ষ্য বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ, দেখা যায়, সখীদিগের ও শ্রীমতীর ভাবের মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান নাই, কেবলমাত্র পরিমাণ-গত পার্থক্যই বর্ত্তমান। দেখা যায়, শ্রীমতীর ন্যায় সখীগণও সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে ভজনা করিতেন এবং শ্রীরাধার সহিত সম্মিলনে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ দেখিয়া, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্যই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনসম্পাদনে সর্ব্বদা যত্নবতী। আবার দেখা যায়, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি প্রাচীন গোস্বামিপাদগণের প্রত্যেকে মধুরভাব-পরিপুষ্টির জন্য পৃথক্ পৃথক্ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের সেবায় শ্রীবৃন্দাবনে জীবন অতিবাহিত করিলেও, তৎসঙ্গে শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা করিবার প্রয়াস পান নাই—আপনাদিগকে রাধাস্থানীয় ভাবিতেন বলিয়াই যে, তাঁহারা ঐরূপ করেন নাই, একথাই উহাতে অনুমিত হয়।

শ্রীমতীর ভাব প্রাপ্ত হওয়াই মধুরভাব সাধনের চরম লক্ষ্য।

বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত মধুরভাবের যাঁহারা বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবাদি প্রাচীন গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থসমূহের এবং শ্রীবিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-প্রমুখ বৈষ্ণব কবিকুলের পূর্ব্বরাগ, দান, মান ও মাথুর-সম্বন্ধীয় পদাবলী-সকলের আলোচনা করিবেন। মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর উহাতে কি অপূর্ব্ব চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে সুগম হইবে বলিয়াই আমরা উহার সারাংশের এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

ঠাকুরের মধুরভাব সাধন।

ঠাকুরের শুদ্ধ একাগ্রমনে যখন যে কোন ভাবের উদয় হইত, তাহাতেই তখন তিনি তন্ময় হইয়া কিছুকাল অবস্থান করিতেন। ঐ ভাব তখন তাঁহার মনে পূর্ণাধিকার স্থাপনপূর্ব্বক অন্য সকল ভাবের লোপ করিয়া দিত এবং তাঁহার শরীরকে পরিবর্ত্তিত করিয়া উহার প্রকাশানুরূপ পূর্ণাবয়ব যন্ত্রস্বরূপ করিয়া তুলিত। ঠাকুরের জীবনালোচনা করিলে, বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনের ঐরূপ স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন করিবার কালে তাঁহার ঐরূপ স্বভাবের পরিচয় আমরা নিত্য পাইতাম। দেখিতাম, সঙ্গীতাদি শ্রবণে বা অন্য কোন উপায়ে তাঁহার মন ভাববিশেষে মগ্ন হইবার কালে যদি কেহ সহসা অন্য ভাবের সঙ্গীত বা কথা আরম্ভ করিত, তাহা হইলে তিনি মনে বিষম যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। লক্ষ্যে প্রবাহিত চিত্তবৃত্তিসকলের সহসা গতিরোধ হওয়াতেই যে

বাল্যকাল হইতে ঠাকুরের মনের ভাবতন্ময়তার আচরণ।

তাঁহার ঐরূপ কষ্ট উপস্থিত হইত, একথা বলা বাহুল্য। মহামুনি পতঞ্জলি, এক ভাবে তরঙ্গিত চিত্তবৃত্তিযুক্ত মনকে সবিকল্পক সমাধিস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং ভক্তিগ্রন্থসকলে ঐ সমাধি ভাব-সমাধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, ঠাকুরের মন ঐরূপ সমাধিতে অবস্থান করিতে আজীবন সমর্থ ছিল।

সাধনকালে তাঁহার মনের উক্ত স্বভাবের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়।

সাধনায় প্রবর্ত্তিত হইবার কাল হইতে তাঁহার মনের পূর্ব্বোক্ত স্বভাব এক অপূর্ব্ব বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল। কারণ, দেখা যায়,—ঐকালে তাঁহার মন পূর্ব্বের ন্যায় কোন ভাবে কিছুক্ষণ-মাত্র অবস্থান করিয়াই অন্য ভাববিশেষ অবলম্বন করিতেছে না; কিন্তু কোন এক ভাবে আবিষ্ট হইলে, যতক্ষণ না ঐ ভাবের চরম সীমায় উপনীত হইয়া অদ্বৈতভাবের আভাস পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতেছে, ততক্ষণ উহাকে অবলম্বন করিয়াই সর্ব্বক্ষণ অবস্থান করিতেছে। উক্ত বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, দাস্যভাবের চরম সীমায় উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি মাতৃভাবোপলব্ধি করিতে অগ্রসর হন নাই; আবার, তন্ত্রোপদিষ্ট মাতৃভাবসাধনায় চরমোপলব্ধি না করিয়া বাৎসল্যাদি ভাব সাধনে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহার সাধনকালের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে ঐরূপ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়।

ব্রাহ্মণীর আগমনকালে ঠাকুরের মন ঈশ্বরের মাতৃভাবের অনুধ্যানে পূর্ণ ছিল। জগতের যাবতীয় প্রাণী ও পদার্থে, বিশেষতঃ, স্ত্রীমূর্ত্তিসকলে তখন তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণীকে দর্শনমাত্র তিনি কেন মাতৃসম্বোধন করিয়াছিলেন এবং আপনাকে ব্রাহ্মণীর

বালক বলিয়া এককালে উপলব্ধি করিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার ক্রোড়ে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহার হস্তে আহার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ স্পষ্ট বুঝা যায়। হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী এই কালে কখন কখন ব্রজগোপিকাগণের ভাবে আবিষ্টা হইয়া মধুররসাত্মক সঙ্গীতসকল আরম্ভ করিলে, ঠাকুর বলিতেন, ঐ ভাব তাঁহার ভাল লাগে না, এবং ঐভাব সম্বরণপূর্ব্বক মাতৃ-ভাবের ভজনসকল গাহিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন। ব্রাহ্মণীও উহাতে ঠাকুরের মানসিক অবস্থা যথাযথ বুঝিয়া, তাঁহার প্রীতির জন্য তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীজগদম্বার দাসীভাবে সঙ্গীত আরম্ভ করিতেন, অথবা ব্রজগোপালের প্রতি নন্দরাণী শ্রীমতী যশোদার হৃদয়ের গভীরোচ্ছ্বাসপূর্ণ সঙ্গীতের অবতারণা করিতেন। উক্ত ঘটনা অবশ্য, ঠাকুরের মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইবার বহু পূর্ব্বের কথা এবং ঠাকুরের মনে 'ভাবের ঘরে চুরি' যে বিন্দুমাত্র কোনকালে ছিল না, একথা উহাতে বুঝিতে পারা যায়।

সাধনকালের পূর্ব্বে ঠাকুরের মধুরভাব ভাল লাগিত না।

সে যাহা হউক, উহার কয়েক বৎসর পরে ঠাকুরের মন কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া বাৎসল্যভাব সাধনে অগ্রসর হইয়াছিল, সেকথা আমরা পাঠককে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব মধুরভাব সাধনে অগ্রসর হইয়া তিনি এখন যে সকল অনুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন, সেই সকল কথা আমরা বলিতে প্রবৃত্ত হই।

ঠাকুরের জীবনালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—আমরা যাহাকে 'নিরক্ষর' বলি, তিনি প্রায় পূর্ণমাত্রায় তদ্রূপ অবস্থাসম্পন্ন হইলেও, কেমন করিয়া আজীবন শাস্ত্র-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। গুরুগ্রহণ করি-বার পূর্ব্বে কেবলমাত্র নিজ হৃদয়ের প্রেরণায় তিনি যে সকল

ঠাকুরের সাধনসকল কখন শাস্ত্রবিরোধী হয় নাই। উহাতে যাহা প্রমাণিত হয়।

সাধনানুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন, সে সকলও কখন শাস্ত্রবিরোধী না হইয়া উহার অনুগামী হইয়াছিল। 'ভাবের ঘরে চুরি' না রাখিয়া শুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হইলে ঐরূপ যে হইয়া থাকে, তাঁহার জীবনের উক্ত ঘটনা এ বিষয়ের পরিচয় প্রদান করে। ঘটনা ঐরূপ হওয়ার বৈচিত্র্য কিছুই নাই; কারণ, শাস্ত্রসমূহ ঐ ভাবেই যে প্রণীত হইয়াছে একথা স্বল্প চিন্তার ফলে বুঝিতে পারা যায়। ঠাকুরের ন্যায় হৃদয়ের সত্যলাভের চেষ্টা পূর্ব্বক উপলব্ধিসকল লিপিবদ্ধ হইয়াই পরে 'শাস্ত্র' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সে যাহা হউক, নিরক্ষর ঠাকুরের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপলব্ধিসকলের যথাযথ অনুভূতি হওয়ায় তাঁহার অলৌকিক জীবনের দ্বারা শাস্ত্রসমূহের সত্যতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ ঐকথা নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,—ঠাকুরের এবার নিরক্ষর হইয়া আগমনের কারণ, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ অবস্থা ও উপলব্ধিসমূহকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য।

তাঁহার স্বভাবতঃ শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষার দৃষ্টান্ত—সাধনকালে নামভেদ ও বেশ গ্রহণ।

শাস্ত্রমর্য্যাদা স্বভাবতঃ রক্ষা করিবার দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা এখানে, ভাবের প্রেরণায় ঠাকুরের একের পর অন্য করিয়া নানা বেশ গ্রহণের কথার উল্লেখ করিতে পারি। ঋষিগণ উপনিষদ্‌মুখে বলিয়াছেন,—'তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ'* সিদ্ধ হওয়া যায় না। ঠাকুরের জীবনেও দেখিতে পাওয়া যায়,—তিনি যখন যে ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন নিজ হৃদয়ের প্রেরণায় প্রথমেই সেই ভাবানুকূল বেশভূষা বা বাহ্য চিহ্নসকল

* মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।২।৪ —অর্থ—সন্ন্যাসের লিঙ্গ বা চিহ্ন (যথা, গৈরিকাদি) ধারণা করিয়া কেবলমাত্র তপস্যা দ্বারা আত্মদর্শন হয় না।

ধারণ করিয়াছিলেন। যথা—তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবে সিদ্ধিলাভের জন্য তিনি রক্তবস্ত্র, বিভূতি, সিন্দুর ও রুদ্রাক্ষাদি ধারণ করিয়াছিলেন; বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত ভাবসমূহের সাধনকালে গুরুপরম্পরা-প্রসিদ্ধ ভেক্ বা তদনুকূল বেশ গ্রহণ করিয়া শ্বেতবস্ত্র, শ্বেতচন্দন তুলসী-মাল্যাদিতে নিজাঙ্গ ভূষিত করিয়াছিলেন! বেদান্তোক্ত অদ্বৈতভাবে সিদ্ধ হইবেন বলিয়া শিখাসূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক কাষায় ধারণ করিয়াছিলেন—ইত্যাদি। আবার পুংভাবসমূহের সাধন কালে তিনি যেমন বিবিধ পুরুষবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ স্ত্রীজনোচিত ভাবসমূহের সাধনকালে রমণীর বেশভূষায় আপনাকে সজ্জিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ঠাকুর আমাদিগকে বারংবার শিক্ষা দিয়াছেন,—লজ্জা ঘৃণা ভয় এবং জন্ম-জন্মাগত জাতি-কুল-শীলাদি অষ্টপাশ ত্যাগ না করিলে, কেহ কখন ঈশ্বরলাভ-পথে অগ্রসর হইতে পারে না। ঐশিক্ষা তিনি স্বয়ং আজীবন, কায়মনোবাক্যে, কতদূর পালন করিয়াছিলেন, তাহা সাধনকালে তাঁহার ঐরূপ বিবিধ বেশধারণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি কার্য্যকলাপের অনুশীলনে স্পষ্ট বুঝিতে পায়া যায়।

মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত ঠাকুরের স্ত্রীবেশ গ্রহণ।

মধুরভাব সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা ধারণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং পরমভক্ত মথুরামোহন তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কখন বহুমূল্য বারাণসী সাড়ী এবং কখন ঘাগ্‌রা, ওড়্‌না, কাঁচুলি প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। আবার, 'বাবা'র রমণীবেশ সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মথুর চাঁচর কেশপাশ (পরচুলা) এবং এক সুট্ স্বর্ণালঙ্কারেও তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শ্রবণ করিয়াছি, ভক্তিমান্ মথুরের ঐরূপ

দান, ঠাকুরের কঠোর ত্যাগে কলঙ্কার্পণ করিতে দুষ্টচিত্তদিগকে অবসর দিয়াছিল; কিন্তু ঠাকুর ও মথুরামোহন সে সকল কথায় কিছুমাত্র মনোযোগী না হইয়া আপন আপন লক্ষ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মথুরামোহন, 'বাবা'র পরিতৃপ্তিতে এবং 'তিনি যে উহা নিরর্থক করিতেছেন না'—এই বিশ্বাসে পরমসুখী হইয়াছিলেন; এবং ঠাকুর ঐরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া শ্রীহরির প্রেমৈকলোলুপা ব্রজরমণীর ভাবে ক্রমে এতদূর মগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার আপনাকে পুরুষবোধ এককালে অন্তর্হিত হইয়া প্রতি চিন্তা, চেষ্টা ও বাক্য রমণীর ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, মধুরভাবাবেশে তিনি ঐরূপে ছয়মাস কাল রমণীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন।

স্ত্রীবেশ গ্রহণে ঠাকুরের প্রত্যেক আচরণ স্ত্রী-জাতির ন্যায় হওয়া।

ঠাকুরের ভিতর স্ত্রী ও পুরুষ—উভয় ভাবের বিচিত্র সমাবেশের কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। অতএব স্ত্রীবেশের উদ্দীপনায় তাঁহার মনে যে এখন রমণীভাবের উদয় হইবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি? কিন্তু ঐ ভাবের প্রেরণায় তাঁহার চলন, বলন, হাস্য, কটাক্ষ, অঙ্গভঙ্গী এবং শরীর ও মনের প্রত্যেক চেষ্টা যে, এককালে ললনা-সুলভ হইয়া উঠিবে, একথা কেহ কখন কল্পনা করিতে পারে নাই। কিন্তু ঐরূপ অসম্ভব ঘটনা যে এখন বাস্তবিক হইয়াছিল, একথা আমরা ঠাকুর এবং হৃদয়—উভয়ের নিকটে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি। দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমনকালে আমরা অনেকবার তাঁহাকে রঙ্গচ্ছলে স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করিতে দেখিয়াছি। তখন উহা এতদূর সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইত যে, রমণীগণও উহা দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতেন।

ঠাকুর এই সময়ে কখন কখন রাণী রাসমণির জানবাজারস্থ

বাটীতে যাইয়া শ্রীযুক্ত মথুরামোহনের পুরাঙ্গনাদিগের সহিত বাস করিয়াছিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীরা তাঁহার কামগন্ধহীন পূতচরিত্রের কথা সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বেই দেবতা-সদৃশ জ্ঞান করিতেন। এখন আবার তাঁহার স্ত্রীসুলভ আচার-ব্যবহারে এবং অকৃত্রিম যত্ন ও স্নেহে এতদূর মুগ্ধা হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে তাঁহারা আপনাদিগের অন্যতম বলিয়া নিশ্চয় ধারণাপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে লজ্জা-সঙ্কোচাদি আবরণের কিছুমাত্র রক্ষা করিতে সমর্থা হয়েন নাই।* ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি,—শ্রীযুক্ত মথুরের কন্যাগণের মধ্যে কাহারও স্বামী ঐকালে জানবাজার ভবনে উপস্থিত হইলে, তিনি ঐ কন্যার কেশবিন্যাস ও বেশভূষাদি নিজ হস্তে সম্পাদনপূর্ব্বক স্বামীর চিত্তরঞ্জনের নানা উপায় তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিয়া সখীর ন্যায় তাহার হস্তধারণ করিয়া লইয়া যাইয়া স্বামীর পার্শ্বে দিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিতেন,—'তাহারাও তখন আমাকে তাহাদিগের সখী বলিয়া বোধ করিয়া কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইত না!'

মথুর বাবুর বাটীতে রমণীগণের সহিত ঠাকুরের সখীভাবে আচরণ।

হৃদয় বলিতেন,—"ঐরূপে রমণীগণপরিবৃত হইয়া থাকিবার কালে ঠাকুরকে সহসা চিনিয়া লওয়া তাঁহার নিত্যপরিচিত আত্মীয়দিগের পক্ষেও দুরূহ হইত। মথুর বাবু ঐকালে একসময়ে আমাকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'বল দেখি, উহাদিগের মধ্যে তোমার মামা কোন্‌টী?' এতকাল একসঙ্গে বাস ও নিত্য সেবাদি করিয়াও তখন আমি তাঁহাকে

রমণীবেশ গ্রহণে ঠাকুরকে পুরুষ বলিয়া চেনা দুঃসাধ্য হইত।

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৭ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৯৯—২০১।

সহসা চিনিয়া লইতে পারি নাই! দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে মামা তখন প্রতিদিন প্রত্যূষে সাজি হস্তে লইয়া বাগানে পুষ্পচয়ন করিতেন—আমরা ঐ সময়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, চলিবার সময় রমণীর ন্যায় তাঁহার বামপদই প্রতিবার অগ্রসর হইতেছে। ভৈরবী ব্রাহ্মণী বলিতেন,—'ঐরূপে পুষ্পচয়ন করিবার কালে তাঁহাকে (ঠাকুরকে) দেখিয়া আমার সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ শ্রীমতী রাধারাণী বলিয়া ভ্রম হইয়াছে!' ঐরূপে পুষ্পচয়ন করিয়া বিচিত্র মালা গাঁথিয়া তিনি এই কালে প্রতিদিন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীকে সজ্জিত করিতেন এবং কখন কখন শ্রীশ্রীজগদম্বাকেও ঐরূপ সাজাইয়া ৺কাত্যায়নীর নিকটে ব্রজগোপিকাগণের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণকে স্বামিরূপে পাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট সকরুণ প্রার্থনা করিতেন!"

ঐরূপে শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবা-পূজাদি শ্রীকৃষ্ণদর্শন ও তাঁহাকে স্বীয় বল্লভরূপে প্রাপ্ত হইবার মানসে সম্পাদনপূর্ব্বক ঠাকুর এখন অনন্যচিত্তে শ্রীশ্রীযুগলপাদপদ্মসেবায় রত হইয়াছিলেন এবং সাগ্রহ প্রার্থনা ও প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

মধুরভাব সাধনে নিযুক্ত ঠাকুরের আচরণ ও শারীরিক বিকারসমূহ।

দিবা কিম্বা রাত্রি—কোনকালেই তাঁহার হৃদয়ে সে আকুল প্রার্থনার বিরাম হইত না এবং দিন, পক্ষ বা মাসান্তেও অবিশ্বাস-প্রসূত নৈরাশ্য আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে সে প্রতীক্ষা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিত না। ক্রমে ঐ প্রার্থনা আকুল ক্রন্দনে এবং ঐ প্রতীক্ষা উন্মত্তের ন্যায় উৎকণ্ঠা ও চঞ্চলতায় পরিণত হইয়া তাঁহার আহারনিদ্রাদির লোপসাধন করিয়াছিল। আর, বিরহ?—নিতান্ত প্রিয়জনের সহিত সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সম্মিলিত হইবার অসীম লালসা নানা বিঘ্ন-বাধায় প্রতিরুদ্ধ

হইলে মানবের হৃদয়-মন-মথনকরী শরীরেন্দ্রিয়-বিকলকরী যে অবস্থা আনয়ন করে, সেই বিরহ?—উহা, তাঁহাতে অশেষ যন্ত্রণার নিদান মানসিক বিকাররূপে কেবলমাত্র প্রকাশিত হইয়াই উপশান্ত হয় নাই, কিন্তু সাধনকালের পূর্ব্বাবস্থায় অনুভূত নিদারুণ শারীরিক উত্তাপ ও জ্বালারূপে পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছিল। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি,—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের প্রবল প্রভাবে এইকালে তাঁহার শরীরের প্রতি লোমকূপ দিয়া সময়ে সময়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত নির্গমন হইত, দেহের গ্রন্থি-সকল শিথিল বা ভগ্নপ্রায় বলিয়া লক্ষিত হইত এবং হৃদয়ের অসীম যন্ত্রণায় ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য হইতে এককালে বিরত হওয়ায়, দেহ কখন কখন মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিত!

ঠাকুরের অতীন্দ্রিয় প্রেমের সহিত আমাদের ঐ বিষয়ক ধারণার তুলনা।

দেহের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ, তন্মাত্রৈকবুদ্ধি মানব আমরা, প্রেম বলিতে এক দেহের প্রতি অন্য দেহের আকর্ষণই বুঝিয়া থাকি। অথবা বহু চেষ্টার ফলে স্থূল দেহবুদ্ধি হইতে কিঞ্চিন্মাত্র ঊর্দ্ধে উঠিয়া যদি উহাকে দেহবিশেষাশ্রয়ে প্রকাশিত গুণসমষ্টির প্রতি আকর্ষণ বলিয়া অনুভব করি, তবে 'অতীন্দ্রিয় প্রেম' বলিয়া উহার আখ্যা প্রদানপূর্ব্বক উহার কতই না যশোগান করি। কিন্তু কবিকুলবন্দিত আমাদিগের ঐ অতীন্দ্রিয় প্রেম যে স্থূল দেহবুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম ভোগলালসা পরিশূন্য নহে, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঠাকুরের জীবনে প্রকাশিত যথার্থ অতীন্দ্রিয় প্রেমের তুলনায় উহা কি তুচ্ছ, হেয় এবং অন্তঃসারশূন্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়!

ভক্তিগ্রন্থসকলে উল্লিখিত আছে, ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধা-

রাণীই কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত অতীন্দ্রিয় প্রেমের পরাকাষ্ঠা জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া উহার পূর্ণাদর্শ জগতে রাখিয়া গিয়াছেন। লজ্জা ঘৃণা ভয় ছাড়িয়া, লোক-ভয় সমাজভয় পরিত্যাগ করিয়া, জাতি কুল শীল পদমর্য্যাদাদি সকল বাহ্য বিষয় ভুলিয়া এবং নিজ দেহ-মনের ভোগসুখের কথা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুখেই কেবলমাত্র আপনাকে সুখী অনুভব করিতে তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল ভক্তিশাস্ত্রে আর পাওয়া যায় না। শাস্ত্র সেজন্য বলেন, শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন ঐ প্রেমের আংশিক উপলব্ধি করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিতে জগতে কেহ কখন সমর্থ হয় না। কারণ, সচ্চিদানঘন-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতীর কামগন্ধহীন প্রেমে চিরকাল সর্ব্বতোভাবে আবদ্ধ বা বশীভূত হইয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহারই ইঙ্গিতে ভক্তসকলের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন। অতএব, প্রেমঘনতনু শ্রীমতীর প্রেমের অনুরূপ বা তজ্জাতীয় প্রেমলাভ না হইলে, কেহ কখন ঈশ্বরকে পতিভাবে লাভ করিতে এবং ঐ প্রেমের পূর্ণ মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না, ভক্তিশাস্ত্রের পূর্ব্বোক্ত কথার ইহাই যে অভিপ্রায়, একথা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীমতীর অতীন্দ্রিয় প্রেম সম্বন্ধে ভক্তি-শাস্ত্রের কথা।

ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব মহিমা, মায়ারহিতবিগ্রহ পরমহংসাগ্রণী শ্রীশুকদেবপ্রমুখ আত্মারাম মুনিসকলের দ্বারা বহুশঃ গীত হইলেও, ভারতের জনসাধারণ, উহা কিরূপে জীবনে উপলব্ধি করিতে হইবে তাহা বহুকাল পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে নাই। গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণ বলেন, উহা বুঝাইবার জন্য শ্রীভগবান্‌কে শ্রীমতীর সহিত পুনরায়

শ্রীমতীর অতীন্দ্রিয় প্রেমের কথা বুঝাইবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের আগমন।

একশরীরালম্বনে একাধারে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল এবং অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর বা রাধারূপে প্রকাশিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবই মধুরভাবের প্রেমাদর্শ শিক্ষা দিয়া লোককল্যাণ-সাধনের জন্য আবির্ভূত শ্রীভগবানের ঐ অপূর্ব্ব বিগ্রহ। তাঁহারা একথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে শ্রীমতী রাধারাণীর শরীর-মনে যে সকল লক্ষণ প্রকাশিত হইত, পুংশরীরধারী হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গদেবে সে সমস্ত লক্ষণই ঈশ্বরপ্রেমের প্রাবল্যে আবির্ভূত হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শরীর-মনে মধুরভাবোত্থ ভক্তিলক্ষণসকলের প্রকাশ দেখিয়াই তাঁহারা তাঁহাকে শ্রীমতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে ঐরূপ অতীন্দ্রিয় প্রেমাদর্শের দ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল, একথা বুঝা যায়।

ঠাকুরের শ্রীমতী রাধিকার উপাসনা ও দর্শনলাভ।

সে যাহা হউক, শ্রীমতী বাধারাণীর কৃপা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণদর্শন অসম্ভব জানিয়া, ঠাকুর এখন তদ্গতচিত্তে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রেমঘনমূর্ত্তির স্মরণ মনন ও ধ্যানে নিরন্তর মগ্ন হইয়া, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিজ হৃদয়ের আকুল আবেগ অবিরাম নিবেদন করিয়াছিলেন। ফলে. অচিরেই তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর কামগন্ধহীন শ্রীমূর্ত্তির দর্শন লাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে অন্যান্য দেবদেবীসকলের দর্শনকালে ঠাকুর যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই দর্শনকালেও তিনি সেইরূপে ঐ মূর্ত্তি নিজাঙ্গে সম্মিলিত হইয়া গেল, এইরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন,—"শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্ব্বস্ব-হারা সেই নিরুপম পবিত্রোজ্জ্বল মূর্ত্তির মহিমা ও মাধুর্য্য বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্রীমতীর অঙ্গকান্তি নাগকেশরপুষ্পের কেসর-সকলের ন্যায় গৌরবর্ণ ছিল।"

ঠাকুরের আপনাকে শ্রীমতী বলিয়া অনুভব ও তাহার কারণ।

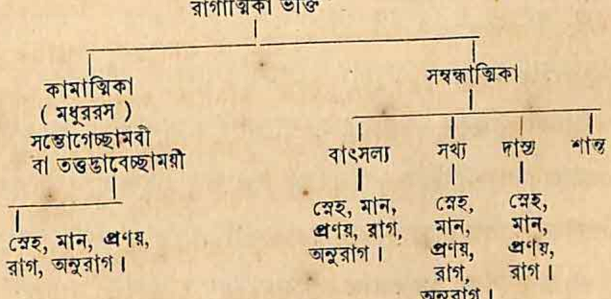
এখন হইতে ঠাকুর ভাবাবেশে আপনাকে শ্রীমতী বলিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। শ্রীমতী রাধা-রাণীর শ্রীমূর্ত্তি ও চরিত্রের গভীর অনুধ্যানে আপন পৃথগস্তিত্ব-বোধ এককালে হারাইয়াই তাঁহার ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং একথা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় যে, তাঁহার মধুরভাবোত্থ ঈশ্বরপ্রেম এখন পরিবর্দ্ধিত হইয়া শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমানুরূপ সুগভীর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলেও ঐরূপ দেখা গিয়াছিল। কারণ, পূর্ব্বোক্ত দর্শন ও অবস্থার পর হইতে শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের ন্যায় তাঁহাতেও মধুরভাবের পরাকাষ্ঠাপ্রসূত মহাভাবের সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থে মহাভাবে প্রকাশিত শারীরিক লক্ষণসকলের কথা লিপিবদ্ধ আছে। বৈষ্ণবতন্ত্রনিপুণা ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং পরে বৈষ্ণব-চরণাদি শাস্ত্রজ্ঞ সাধকেরা ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে মহাভাবের প্রেরণায় ঐ সকল লক্ষণের আবির্ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া, তাঁহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও পূজা অর্পণ করিয়াছিলেন। মহাভাবের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর আমাদিগকে বহুবার বলিয়াছেন,—উনিশপ্রকারের ভাব একাধারে প্রকাশিত হইলে, তাহাকে মহাভাব বলে—একথা ভক্তিশাস্ত্রে আছে। সাধন করিয়া এক একটা ভাবে সিদ্ধ হইতেই লোকের জীবন কাটিয়া যায়! (নিজ শরীর দেখাইয়া) এখানে একাধারে একত্র ঐ প্রকার উনিশটী ভাবের পূর্ণ প্রকাশ।"*

শ্রীকৃষ্ণবিরহের দারুণ যন্ত্রণায় ঠাকুরের শরীরের প্রতি

* শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ রাগাত্মিকা ভক্তির নিম্ন-লিখিত বিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

প্রকৃতিভাবে ঠাকুরের শরীরের অদ্ভুত পরিবর্তন।

লোমকূপ হইতে রক্তনির্গমনের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি—উহা মহাভাবের পরাকাষ্ঠায় এই কালেই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। প্রকৃতি ভাবিতে ভাবিতে তিনি এইকালে এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, স্বপ্নে বা ভ্রমেও কখনও আপনাকে পুরুষ বলিয়া ভাবিতে পারিতেন না এবং স্ত্রীশরীরের ন্যায় কার্য্যকলাপে তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় স্বতঃই প্রবৃত্ত হইত! আমরা তাঁহার নিজ-মুখে শ্রবণ করিয়াছি,—স্বাধিষ্ঠানচক্রের অবস্থান-প্রদেশের রোম-কূপসকল হইতে তাঁহার এইকালে প্রতিমাসে নিয়মিত সময়ে বিন্দু বিন্দু শোণিত-নির্গমন হইত এবং স্ত্রীশরীরের ন্যায় প্রতি-বারই উপর্য্যুপরি দিবসত্রয় ঐরূপ হইত! তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়নাথ আমাদিগকে বলিয়াছেন,—তিনি উহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন এবং পরিহিত বস্ত্র দুষ্ট হইবার আশঙ্কায় ঠাকুরকে উহার জন্য এইকালে কৌপীন ব্যবহার করিতেও দেখিয়াছেন!



মহাভাবে কামাত্মিকা এবং সম্বন্ধাত্মিকা উভয় প্রকার ভক্তির পূর্ব্বোল্লিখিত ঊনবিংশ প্রকার অন্তর্ভাবের একত্র সমাবেশ হয়। ঠাকুর এখানে উহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হইতেন। ঐরূপে নিজ পুরুষশরীরকে শ্রীকৃষ্ণলাভের পথের অন্তরায় বলিয়া বিবেচনা করিয়া, তিনি তখন কল্পনা করিতেন যে, যদি আবার ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে ব্রাহ্মণের ঘরের পরমা সুন্দরী দীর্ঘকেশী বাল-বিধবা হইবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতি বলিয়া জানিবেন না। মোটা ভাত কাপড়ের মত কিছু সংস্থান থাকিবে, কুঁড়ে ঘরের পার্শ্বে দুই এক কাঠা জমী থাকিবে—যাহাতে নিজ হস্তে দুই পাঁচ প্রকার শাকসবজী নিজ ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন করিতে পারিবেন, এবং তৎসঙ্গে একজন বৃদ্ধা অভিভাবিকা, একটী গাভী—যাহাকে তিনি স্বহস্তে দোহন করিতে পারিবেন এবং একখানি সূতা কাটিবার চরকা থাকিবে। বালকের কল্পনা আরও অধিক অগ্রসর হইয়া ভাবিত, দিনের বেলা গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া ঐ চরকায় সূতা কাটিতে কাটিতে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক সঙ্গীত করিবে এবং সন্ধ্যার পর ঐ গাভীর দুগ্ধে প্রস্তুত মোদকাদি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বহস্তে খাওয়াইবার নিমিত্ত গোপনে ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে থাকিবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও উহাতে প্রসন্ন হইয়া গোপবালকবেশে সহসা আগমন করিয়া ঐ সকল গ্রহণ করিবেন এবং অপরের অগোচরে ঐরূপে নিত্য গমনাগমন করিতে থাকিবেন। ঠাকুরের মনের ঐ বাসনা ঐ ভাবে পূর্ণ না হইলেও, মধুরভাব-সাধনকালে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সিদ্ধ হইয়াছিল।

'ভাগবত, ভক্ত, ভগবান—তিন এক, এক তিন' রূপ দর্শন।

মধুরভাবে অবস্থানকালে ঠাকুরের আর একটী দর্শনের কথা এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা বর্ত্তমান বিষয়ের উপসংহার করিব। ঐকালে বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখস্থ দালানে বসিয়া তিনি একদিন শ্রীমদ্-ভাগবত-পাঠ শুনিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির সন্দর্শন লাভ

করিলেন। পরে দেখিতে পাইলেন, ঐ মূর্ত্তির পাদপদ্ম হইতে দড়ার মত একটা জ্যোতি বহির্গত হইয়া প্রথমে ভাগবত গ্রন্থকে স্পর্শ করিল এবং পরে তাঁহার নিজ বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন হইয়া ঐ তিন বস্তুকে একত্র কিছুকাল সংযুক্ত করিয়া রাখিল।

ঠাকুর বলিতেন,—ঐরূপ দর্শন করিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্ তিন পদার্থ ভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও, এক পদার্থ বা এক পদার্থের প্রকাশ সম্ভূত। "ভাগবত (শাস্ত্র) ভক্ত ও ভগবান্, তিন এক, এক তিন!"

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ঠাকুরের বেদান্তসাধন।

মধুরভাবসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর এখন ভাবসাধনের চরম ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। অতএব তাঁহার অপূর্ব্ব সাধনকথা অতঃপর লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার এই কালের মানসিক অবস্থার কথা একবার আলোচনা করিয়া দেখা ভাল।

ঠাকুরের এই কালের মানসিক অবস্থার আলোচনা—(১) কাম কাঞ্চনত্যাগে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা।

আমরা দেখিয়াছি, কোনরূপ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইতে হইলে, সাধককে সংসারের রূপরসাদি ভোগ্যবিষয়সমূহকে দূরে পরিহার করিয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধ ভক্ত তুলসীদাস যে বলিয়াছেন—যাঁহা রাম তাঁহা কাম্‌ নেহি *—একথা বাস্তবিকই সত্য। ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধনেতিহাস ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করে। কামকাঞ্চনত্যাগ-রূপ ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি ভাবসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ঐ ভিত্তি কখনও তিলমাত্র

† সকাম কর্ম্ম।

* যাঁহা রাম তাঁহা কাম নেহি,
যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম।
দুঁহু একসাথ্ মিলত নেহি,
রবি রজনী এক ঠাম॥
তুলসীদাস-কৃত দোঁহা।

পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া, তিনি যখন যে ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অতি স্বল্পকালেই তাহা নিজ জীবনে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব কামকাঞ্চনের প্রলোভন ভূমির সীমা বহুদূর পশ্চাতে রাখিয়া তাঁহার মন যে, এখন নিরন্তর অবস্থান করিত, একথা স্পষ্ট বুঝা যায়।

(২) নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক ও ইহামুত্রফল-ভোগে বিরাগ।

বিষয়কামনা ত্যাগ করিয়া বৎসরকাল নিরন্তর ঐরূপে ঈশ্বরলাভে সচেষ্ট থাকায়, অভ্যাসযোগে তাঁহার মন এখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন বিষয়ের স্মরণ মনন করা উহার নিকট বিষবৎ বলিয়া প্রতীত হইত। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরকেই সারাৎসার পরাৎপর বস্তু বলিয়া সর্ব্বতোভাবে ধারণা করায় উহা ইহকালে বা পরকালে তদতিরিক্ত অপর কোন বস্তুলাভে এককালে উদাসীন ও স্পৃহাশূন্য হইয়াছিল।

শম দমাদি ষট্ সম্পত্তি ও মুমুক্ষুতা।

সাংসারিক সকল বিষয় এবং নিজ শরীরের সুখদুঃখাদি সকল কথা বিস্মৃত হইয়া অভীষ্ট বিষয়ের একাগ্র অনুধ্যানে তাঁহার মন এখন এতদূর অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, মুহূর্ত্তমাত্রেই বাহ্যবিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে সমাহৃত হইয়া, উহা ঐ বিষয়ে নিবিষ্ট হইত এবং উহাতেই আনন্দানুভব করিত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও, উহার ঐ আনন্দের কিছুমাত্র বিরাম হইত না এবং ঈশ্বর ভিন্ন জগতে অপর কোন লব্ধব্য বস্তু যে আছে বা থাকিতে পারে, এ চিন্তার উদয় উহাতে ক্ষণেকের জন্যও উপস্থিত হইত না।

আর, জগৎকারণের প্রতি, 'গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ

শরণং সুহৃৎ' বলিয়া অনুরাগ, বিশ্বাস ও নির্ভর ?—ঠাকুরের মনে ঐরূপ অনুরাগ, বিশ্বাস ও নির্ভরতার শুধু যে সীমা ছিল না, তাহা নহে, এবং উহাদিগের সহায়ে শুদ্ধ যে তিনি আপনাকে তাঁহার সহিত সপ্রেম সম্বন্ধে নিত্যযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাও নহে—কিন্তু মাতার প্রতি বালকের ন্যায় ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগ, বিশ্বাস ও নির্ভরতায় সাধক যে, তাঁহাকে সর্ব্বদা নিজ সকাশে দেখিতে পায়, তাঁহার মধুর বাণী সর্ব্বদা কর্ণগোচর করিয়া কৃতকৃতার্থ হয় এবং তাঁহার প্রবল হস্ত দ্বারা রক্ষিত হইয়া সংসারপথে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়—একথার বহুশঃ প্রমাণ পাইয়া জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্য শ্রীশ্রীজগদম্বার আদেশে ও ইঙ্গিতে নির্ভয়ে অনুষ্ঠান করিতে ঠাকুরের মন এখন সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

(৪) ঈশ্বরনির্ভরতা ও দর্শনজন্য ভয়শূন্যতা।

প্রশ্ন উঠিতে পারে,—জগৎকারণকে ঐরূপে নিজ মাতার ন্যায় লাভ করিয়া এবং সর্ব্বদা নিজ সমীপে দেখিতে পাইয়াও ঠাকুর আবার সাধনপথে নিযুক্ত হইয়াছিলেন কেন ? যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সাধকের যোগ-তপস্যাদি সাধনের অনুষ্ঠান, তাঁহাকেই যদি আপনার হইতেও আপনার রূপে প্রাপ্ত হইলাম, তবে আবার সাধন কিসের জন্য ? ঐ কথার আলোচনা আমরা পূর্ব্বে একভাবে করিয়া আসিলেও, তৎসম্বন্ধে অন্য একভাবে এখন দুই চারিটী কথা বলিব। ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার সাধনেতিহাস শুনিতে শুনিতে, আমাদিগের মনে একদিন ঐরূপ প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল এবং উহা প্রকাশ করিতেও সঙ্কুচিত হই নাই। তদুত্তরে তিনি তখন আমাদিগকে যাহা

ঈশ্বর-দর্শনের পরেও ঠাকুর সাধন কেন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার কথা।

বলিয়াছিলেন, তাহাই এখানে বলিব। ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—"ছাখ্, সমুদ্রের তীরে যে সর্ব্বদা বাস করে, তার যেমন কখন কখন মনে হয় যে, রত্নাকর সমুদ্রের গর্ভে কত কি রত্ন আছে, তা দেখি, তেমনি মাকে পেয়ে ও মার কাছে সর্ব্বদা থেকেও আমার তখন মনে হ'ত, অনন্তভাবময়ী অনন্তরূপিণী মাকে নানাভাবে ও নানারূপে দেখ্ব। সেজন্য যখন যে ভাবে তাঁকে দেখ্তে ইচ্ছা হ'ত, সেই ভাবে দেখ্বার জন্য তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ধ'র্তাম্। কৃপাময়ী মাও তখন, তাঁর ঐভাব দেখ্তে,উ পলব্ধি ক'র্তে যা কিছু প্রয়োজন, তা নিজেই জুগিয়ে দিয়ে, করিয়ে নিয়ে, সেই ভাবে ও রূপে দেখা দিতেন। ঐরূপেই ভিন্ন ভিন্ন মতের বা পথের সাধন করা হয়েছিল।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মধুরভাবে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর ভাবসাধনের চরম ভূমিতে উপনীত হইয়াছিলেন। উহার পরেই ঠাকুরের মনে সর্ব্বভাবাতীত বেদান্ত-প্রসিদ্ধ অদ্বৈতভাবসাধনে প্রবল প্রেরণা আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে ঐ প্রেরণা তাঁহার জীবনে কিরূপে উপস্থিত হইয়াছিল এবং কিরূপেই বা তিনি এখন শ্রীশ্রীজগন্মাতার নির্গুণ নিরাকার নির্ব্বিকল্প তুরীয় রূপের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আমরা পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

ঠাকুরের জননীর গঙ্গা-তীরে বাস করিবার সঙ্কল্প এবং দক্ষিণেশ্বরে আগমন।

ঠাকুর যখন অদ্বৈতভাবসাধনে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার বৃদ্ধা মাতা দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারের মৃত্যু হইলে, শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা অপর দুইটী পুত্রের মুখ চাহিয়া কোনরূপে বুক বাঁধিয়া ছিলেন। কিন্তু উহার অনতিকাল পরে তাঁহার প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্র

গদাধর পাগল হইয়াছে বলিয়া লোকে যখন রটনা করিতে লাগিল, তখন তাঁহার দুঃখ-শোকের আর অবধি রহিল না। পুত্রকে গৃহে আনাইয়া নানা চিকিৎসা ও শান্তিস্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠানে তাঁহার ঐ ভাবের যখন কথঞ্চিৎ উপশম হইল, তখন বৃদ্ধা আবার আশায় বুক বাঁধিয়া তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহের পরে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়া গদাধরের ঐ অবস্থা আবার যখন উপস্থিত হইল, তখন বৃদ্ধা আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না—প্রথমে কামারপুকুরে এবং পরে মুকুন্দপুরের প্রাচীন শিবালয়ে গমনপূর্ব্বক পুত্রের আরোগ্য-কামনায় হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। পরে মহাদেবের প্রত্যাদেশে পুত্র দিব্যোন্মাদ হইয়াছে জানিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেও, বৃদ্ধা অনতিকাল পরে সংসারে বীতরাগ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে পুত্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং জীবনের অবশিষ্টকাল ভাগীরথীতীরে যাপন করিবেন বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। কারণ, যাহাদের জন্য এবং যাহাদের লইয়া তাঁহার সংসার করা, তাহারাই যদি একে একে সংসার ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল, তবে এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার আর উহাতে লিপ্ত থাকিবার প্রয়োজন কি? শ্রীযুত মথুরের অন্নমেরু অনুষ্ঠানের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি। আমাদিগের অনুমান, ঠাকুরের মাতা ঐ সময়ে পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্প করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হন। বৃদ্ধার ঐ সঙ্কল্প পূর্ণ হইয়াছিল এবং এখন হইতে দ্বাদশ বৎসরান্তে তাঁহার শরীরত্যাগের কালের মধ্যে তিনি পুনরায় কামারপুকুরে আগমন করেন নাই। অতএব ঠাকুরের জটাধারী বাবাজীর নিকট হইতে 'রাম'-মন্ত্রে দীক্ষা ও রামলালা বিগ্রহ গ্রহণ এবং মধুরভাব ও বেদান্তভাব প্রভৃতির সাধন যে তাঁহার মাতার দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঠাকুর-জননীর লোভ-রাহিত্য।

ঠাকুরের মাতার উদার হৃদয়ের পরিচায়ক একটী ঘটনা আমরা পাঠককে এখানে বলিতে চাহি। ঘটনাটী তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে আগমনের স্বল্প-কাল পরেই উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐকালে শ্রীযুত মথুরের কালীবাটীতে অক্ষুণ্ণ অধিকার, এবং মুক্তহস্ত হইয়া তিনি নানা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ও প্রভূত অন্নদান করিতেছিলেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির অবধি না থাকায়, তিনি ভবিষ্যতে তাঁহার অবর্ত্তমানে ঠাকুরের শারীরিক সেবার যাহাতে ত্রুটি না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য ভিতরে ভিতরে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন ; কিন্তু ঠাকুরের কঠোর ত্যাগশীলতা দেখিয়া উহা মুখ ফুটিয়া তাঁহাকে বলিতে এপর্য্যন্ত সাহসী হন নাই। ঠাকুরের মনের ভাব জানিবার জন্য তাঁহার যাহাতে শ্রবণগোচর হয়, এরূপ স্থলে দাঁড়াইয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে একদিন ঠাকুরের নামে একখানি তালুক লেখা-পড়া করিয়া দিবার পরামর্শ হৃদয়ের সহিত করিতে যাইয়া, বিষম অনর্থে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ, ঐ কথার কিঞ্চিদাভাস কর্ণগোচর হইবামাত্র ঠাকুর উন্মত্তপ্রায় হইয়া 'শালা, তুই আমাকে বিষয়ী করিতে চাস্' বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে বেগে ধাবিত হইয়াছিলেন! সুতরাং পূর্ব্বোক্তভাব মনে জাগরূক থাকিলেও, মথুর ঐ অভিপ্রায় সম্পাদনের কোনরূপ সুযোগ লাভ করেন নাই। ঠাকুরের মাতার আগমনে তিনি এখন সুযোগ বুঝিয়া, বৃদ্ধা চন্দ্রাদেবীকে পিতামহী সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন এবং প্রতিদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিলেন। পরে অবসর বুঝিয়া একদিন

তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন—'ঠাকুরমা, তুমি ত আমার নিকট হইতে কখন কিছু সেবা গ্রহণ করিলে না? তুমি যদি যথার্থই আমাকে আপনার বলিয়া ভাব, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে তোমার যাহা ইচ্ছা, চাহিয়া লও।' সরলহৃদয়া বৃদ্ধা মথুরের ঐরূপ কথায় বিশেষ বিপন্না হইলেন। কারণ, ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিলেন না, সুতরাং কি যে চাহিয়া লইবেন, তাহা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে বলিতে হইল,— "বাবা, তোমার কল্যাণে আমার ত এখন কোন বিষয়ের অভাব নাই, যখন কোন জিনিসের আবশ্যক বুঝিব, তখন চাহিয়া লইব।' এই বলিয়া বৃদ্ধা আপনার পেঁট্‌রা খুলিয়া মথুরকে বলিলেন,— 'দেখিবে, এই দেখ, আমার এত পরিবার কাপড় রহিয়াছে; আর তোমার কল্যাণে এখানে খাবার ত কোন কষ্টই নাই, সকল বন্দোবস্তই ত তুমি করিয়া দিয়াছ ও দিতেছ; তবে আর কি চাহি, বল?" মথুর কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন, 'যাহা ইচ্ছা কিছু লও' বলিয়া বারংবার অনুরোধ করিলেন। তখন ঠাকুরের জননীর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটী অভাবের কথা মনে পড়িল; তিনি বলিলেন,—'যদি নেহাৎ দেবে, তবে আমার এখন মুখে দিবার গুলের অভাব হইয়াছে, তার জন্য এক আনার দোক্তা তামাক কিনে দাও।' বিষয়ী মথুরের চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—'এমন মা না হইলে কি অমন ত্যাগশীল পুত্র হয়!'—এই বলিয়া বৃদ্ধার অভিপ্রায়মত দোক্তা তামাক আনাইয়া দিলেন।

ঠাকুরের বেদান্তসাধনে নিযুক্ত হইবার কালে তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র হলধারী দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দজীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া এবং

ভাগবতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থে তাঁহার যৎসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া, তিনি অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কখন কখন ঠাকুরকে কিরূপে শ্লেষ করিতেন ও তাঁহার আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থাসমূহকে মস্তিষ্কের বিকার-প্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন—এবং ঠাকুর তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ঐ কথা নিবেদন করিয়া কিরূপে বারংবার আশ্বস্ত হইতেন, সে সকল কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিয়াছি। হলধারীর ঐরূপ শ্লেষপূর্ণ বাক্যে ঠাকুর একসময়ে ভাবাবেশে এক সৌম্য মূর্ত্তির দর্শন ও 'ভাবমুখে থাক্' বলিয়া প্রত্যাদেশ যে পাইয়াছিলেন, সে কথারও আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। আমাদিগের অনুমান, ঐ সকল ঠাকুরের বেদান্তসাধনে নিযুক্ত হইবার কিছু পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল এবং মধুরভাব সাধনের সময় ঠাকুরকে স্ত্রীবেশাদি ধারণ করিতে এবং স্ত্রীভাবে সর্ব্বদা থাকিতে দেখিয়াই হলধারী তাঁহাকে আত্মজ্ঞানবিহীন বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমদাচার্য্য তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও অবস্থানের সময় হলধারী যে, কালীবাটীতে ছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত একত্রে শাস্ত্র-চর্চ্চা করিতেন, একথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি শ্রীমৎ তোতা ও হলধারীর ঐরূপে অধ্যাত্মরামায়ণ-চর্চ্চাকালে ঠাকুর এক দিন, জায়া ও অনুজ লক্ষ্মণ সহ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ তোতা সম্ভবতঃ সন ১২৭১ সালের শেষভাগে দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার কয়েক মাস পরে শারীরিক অসুস্থতাদি কারণনিবন্ধন হলধারী কালী-বাটীর কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামকুমারের পুত্র অক্ষয় তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হয়েন।

হলধারীর কর্ম্মত্যাগ ও অক্ষয়ের আগমন।

ভক্তের স্বভাব—তাঁহারা সাযুজ্য বা নির্ব্বাণ মুক্তি লাভে কখন প্রয়াসী হন না। ভাববিশেষ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের নানা রূপগুণাদির মহিমা সম্ভোগ করিতেই সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন। দেবীভক্ত শ্রীরাম-প্রসাদের 'চিনি হ'তে চাহি না মা, চিনি খেতে ভালবাসি'-রূপ কথা ভক্তহৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস বলিয়া সর্ব্বকাল প্রসিদ্ধ আছে। অতএব ভাবসাধনের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়া ঠাকুরের ভাবাতীত অদ্বৈতাবস্থা লাভের জন্য প্রয়াস, অনেকের বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ ভাবিবার পূর্ব্বে আমাদিগের স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, ঠাকুর স্বপ্রণোদিত হইয়া এখন আর কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ ছিলেন না। জগদম্বার বালক ঠাকুর, এখন তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তাঁহারই মুখ চাহিয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছিলেন এবং তিনি তাঁহাকে যে ভাবে যখন ঘুরাইতে ফিরাইতেছিলেন, সেই ভাবেই তখন পরমানন্দে চালিত হইতেছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতাও সেজন্য তাঁহার সম্পূর্ণ ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া, নিজ উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনের জন্য ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব অভিনব আদর্শে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। জগদম্বার নিয়োগানুসারে ঠাকুর সর্ব্বপ্রকার সাধনের শেষে সেই উদ্দেশ্যবিশেষের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং উহা বুঝিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল মাতার সহিত প্রেমে এক হইয়াও কিঞ্চিৎ পৃথক্ থাকিয়া তৎপ্রদত্ত লোককল্যাণসাধনরূপ সুমহৎ দায়িত্ব সানন্দে বহন করিয়াছিলেন।

ভাবসমাধিতে সিদ্ধ ঠাকুরের অদ্বৈতভাব-সাধনে প্রবৃত্তি হইবার কারণ।

মধুরভাব সাধনের পরে ঠাকুরের অদ্বৈতভাব সাধনের যুক্তি-

যুক্ততা আর এক দিক দিয়া দেখিলে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। ভাব ও ভাবাতীত রাজ্য পরস্পর কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে সর্ব্বদা অবস্থিত। কারণ, ভাবাতীত অদ্বৈতরাজ্যের ভূমানন্দই সীমাবদ্ধ হইয়া ভাবরাজ্যের দর্শন-স্পর্শনাদি সম্ভোগানন্দরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। অতএব মধুরভাবে পরাকাষ্ঠালাভে ভাবরাজ্যের চরমভূমিতে উপনীত হইবার পরে ভাবাতীত অদ্বৈত-ভূমি ভিন্ন অন্য কোথায় আর তাঁহার মন অগ্রসর হইবে?

ভাবসাধনের চরমে অদ্বৈতভাবলাভের চেষ্টার যুক্তিযুক্ততা।

সে যাহা হউক, শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতেই যে, ঠাকুর এখন অদ্বৈতভাবসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, একথা আমরা নিম্নলিখিত ঘটনায় সম্যক্ বুঝিতে পারিব—

সাগরসঙ্গমে স্নান ও শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাৎ প্রকাশ দর্শন করিবেন বলিয়া, পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ তোতা এইকালে মধ্যভারত হইতে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হন। পুণ্যতোয়া নর্ম্মদাতীরে বহুকাল একান্তবাস পূর্ব্বক সাধন-ভজনে নিমগ্ন থাকিয়া তিনি যে, নির্ব্বিকল্প সমাধিপথে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেন, একথার পরিচয় তথাকার প্রাচীন সাধুরা এখনও প্রদান করিয়া থাকেন। ঐরূপে ব্রহ্মজ্ঞ হইবার পরে তাঁহার মনে কিছুকাল যদৃচ্ছা পরিভ্রমণের সঙ্কল্প উদিত হয় এবং উহার প্রেরণাতেই তিনি এখন পূর্ব্বভারতে আগমনপূর্ব্বক তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে ভ্রমণ করিতে থাকেন। ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন আত্মারাম পুরুষদিগের সমাধি-ভিন্ন-কালে সমগ্র জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব হইয়া থাকে এবং জগদন্তর্গত বিশেষ বিশেষ দেশ, কাল ও পদার্থে মায়া-সংযোগে উচ্চাবচ ব্রহ্ম-প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা

শ্রীমৎ তোতাপুরীর আগমন।

দেবস্থান, তীর্থ ও সাধুদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, একথা চিরকাল প্রসিদ্ধ আছে। ব্রহ্মজ্ঞ তোতা ঐরূপ ভাবের প্রেরণাতেই দেব ও তীর্থদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত তীর্থদ্বয়-দর্শনান্তে ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে পুনরায় ফিরিবার কালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। তিন দিবসের অধিক কাল একস্থানে যাপন করা তাঁহার নিয়ম ছিল না। অতএব কালীবাটীতে তিনি দিবসত্রয় মাত্র অতিবাহিত করিবেন বলিয়াই আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহার অচিন্ত্যলীলায় তদীয় জ্ঞানের মাত্রা সম্পূর্ণ করিয়া দিবেন বলিয়া এবং তাঁহার দ্বারা নিজ বালককে বেদান্ত সাধন করাইবেন বলিয়া যে, তাঁহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছিলেন, একথা তিনি প্রথমতঃ বুঝিতে পারেন নাই।

ঠাকুর ও তোতাপুরীর প্রথম সম্ভাষণ এবং ঠাকুরের বেদান্তসাধন-বিষয়ে প্রত্যাদেশ-লাভ।

শ্রীমৎ তোতাপুরী কালীবাটীতে আগমন করিয়া প্রথমেই ঘাটের সুবৃহৎ চাঁদনীতে আসিয়া উপস্থিত হন। অন্য সাধারণের ন্যায় সামান্য একখানি বস্ত্র মাত্র পরিধান করিয়া অন্যমনে ঠাকুর তখন তথায় এক পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তাঁহার তপোদীপ্ত ভাবোজ্জ্বল বদনের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র শ্রীমৎ তোতা আকৃষ্ট হইলেন এবং প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, ইনি সামান্য পুরুষ নহেন, বেদান্তসাধনের এরূপ উত্তম অধিকারী বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। 'তন্ত্রপ্রাণ বঙ্গে বেদান্তের এরূপ অধিকারী আছে!'—ভাবিতে ভাবিতে শ্রীমৎ তোতা বিস্ময় কৌতূহলে আবিষ্ট হইয়া ঠাকুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে উত্তম অধিকারী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি বেদান্ত সাধন করিবে?"

জটাজূটধারী দীর্ঘবপুঃ উলঙ্গ সন্ন্যাসীর ঐ প্রশ্নে ঠাকুর উত্তর করিলেন,—"কি করিব না করিব, আমি কিছুই জানি না, আমার মা সব জানেন, তিনি আদেশ করিলে করিব।"

শ্রীমৎ তোতা—"তবে যাও, তোমার মাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। কারণ, আমি এখানে দীর্ঘকাল থাকিব না।"

ঠাকুর ঐ কথায় আর কোন উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে ৺জগদম্বার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার বাণী শুনিতে পাইলেন,—"যাও শিক্ষা কর, তোমাকে শিখাইবার জন্যই সন্ন্যাসীর এখানে আগমন হইয়াছে।"

অর্দ্ধবাহ্যভাবাবিষ্ট ঠাকুর তখন হর্ষোৎফুল্লবদনে তোতাপুরী গোস্বামীর সমীপে আসিয়া তাঁহার মাতার ঐরূপ প্রত্যাদেশ নিবেদন করিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিতা ৺দেবীকেই ঠাকুর প্রেমে ঐরূপে মাতৃসম্বোধন করিতেছেন বুঝিয়া, শ্রীমৎ তোতা তাঁহার বালকের ন্যায় সরল ভাবে মুগ্ধ হইলেও তাঁহার ঐ প্রকার স্বভাব অজ্ঞতা ও কুসংস্কারনিবন্ধন হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিলেন। ঐরূপ সিদ্ধান্তে তাঁহার অধরপ্রান্তে একটু করুণা ও ব্যঙ্গপ্রসূত হাস্যের রেখা যে এখন দেখা দিয়াছিল, একথা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। কারণ, শ্রীমৎ তোতার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বেদান্তোক্ত কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন দেব দেবীর নিকট মস্তক অবনত করিত না এবং ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ সংযত সাধকের ঐরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বমাত্রে বিশ্বাস ভিন্ন তাঁহাকে ভক্তি ও উপাসনাদি করিবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিত না। আর ত্রিগুণময়ী ব্রহ্মশক্তি মায়া?—গোস্বামীজী উহাকে ভ্রমমাত্র বলিয়া ধারণা করিয়া উহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব

শ্রীশ্রীজগদম্বা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ তোতার যেরূপ ধারণা ছিল।

স্বীকারের বা উহার প্রসন্নতার জন্য উপাসনার কোনরূপ আবশ্যকতা অনুভব করিতেন না। ফলতঃ অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য সাধকের নিজ পুরুষকার অবলম্বন ভিন্ন ঈশ্বর বা শক্তিসংযুক্ত ব্রহ্মের কৃপাপূর্ণ সহায়তা প্রার্থনার কিঞ্চিন্মাত্র সাফল্য তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন না, এবং যাহারা ঐরূপ করে, তাহারা অজ্ঞানতা-প্রসূত সংস্কারবশতঃ কবিয়া থাকে বলিয়া ভাবিতেন।

ঠাকুরের গুপ্তভাবে সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় ও উহার কারণ।

সে যাহা হউক, তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হইয়া জ্ঞানমার্গের সাধনে প্রবৃত্ত হইলে, ঠাকুরের মনের পূর্ব্বোক্ত সংস্কার অচিরে দূর হইবে ভাবিয়া তোতা তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে আর কিছু এখন না বলিয়া অন্য কথার অবতারণা করিলেন এবং বলিলেন,—বেদান্তসাধনে উপদিষ্ট ও প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাঁহাকে শিখাসূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইবে। ঠাকুর উহাতে স্বীকৃত হইতে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—গোপনে ঐরূপ করিলে যদি হয় তাহা হইলে ঐরূপ করিতে তাঁহার কিছু মাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু প্রকাশ্যে ঐরূপ করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা জননীর প্রাণে বিষমাঘাত প্রদান করিতে তিনি কিছুতেই সমর্থ হইবেন না। গোস্বামীজী উহাতে ঠাকুরের গুপ্তভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ের কারণ সবিশেষ বুঝিতে পারিলেন এবং "উত্তম কথা, শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে তোমাকে গোপনেই দীক্ষিত করিব" বলিয়া কালীবাটীর উদ্যানের উত্তরাংশে অবস্থিত রমণীয় পঞ্চবটীতলে আগমনপূর্ব্বক আপন আসন বিস্তীর্ণ করিলেন।

অনন্তর শুভদিনের উদয় জানিয়া শ্রীমৎ তোতা ঠাকুরকে

পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে আদেশ করিলেন এবং ঐ কার্য্য সমাধা হইলে শিষ্যের নিজ আত্মার তৃপ্তির জন্য যথাবিধানে পিণ্ডপ্রদান করাইলেন।

ঠাকুরের সন্ন্যাসদীক্ষা-গ্রহণের পূর্ব্বকার্য্য-সকল সম্পাদন।

কারণ, সন্ন্যাসদীক্ষাগ্রহণের সময় হইতে সাধক ভূরাদি সমস্ত লোক প্রাপ্তির আশা ও অধিকার নিঃশেষে বর্জ্জন করেন বলিয়া শাস্ত্র তাঁহাকে তৎপূর্ব্বে আপন প্রেত-পিণ্ড আপনি প্রদান করিতে বলিয়াছেন।

ঠাকুর যখন যাহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন তখন নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক তিনি যেরূপ করিতে আদেশ করিয়াছেন, অসীম বিশ্বাসের সহিত তাহা অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব শ্রীমৎ তোতা তাঁহাকে এখন যেরূপ করিতে বলিতে-ছিলেন তাহাই তিনি বর্ণে বর্ণে অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। শ্রাদ্ধাদি পূর্ব্বক্রিয়া সমাপন করিয়া তিনি সংযত হইয়া রহিলেন এবং পঞ্চবটীস্থ নিজ সাধনকুটীরে গুরুনির্দ্দিষ্ট দ্রব্যসকল আহরণ করিয়া সানন্দে শুভমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাত্রি অবসানে শুভ-ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তের উদয় হইলে, গুরু ও শিষ্য উভয়ে কুটীরে সমাগত হইলেন। পূর্ব্বকৃত্য সমাপ্ত হইল, হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং সনাতন কাল হইতে ঈশ্বরার্থে সর্ব্বস্ব-ত্যাগরূপ যে ব্রত গুরুপরম্পরাগত হইয়া ভারতকে এখনও ব্রহ্মজ্ঞ পদবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই ত্যাগব্রতা-বলম্বনের পূর্ব্বোচ্চার্য্য মন্ত্রসকলের পূত-গম্ভীর ধ্বনি পঞ্চবটীর বন উপবনসকলকে মুখরিত করিয়া তুলিল। পবিত্রসলিলা ভাগী-রথার স্নেহসম্পূর্ণ কোমল বক্ষ সেই ধ্বনির সুখস্পর্শে স্পন্দিত

হওয়ায় তাঁহাতে নূতন জীবনের অপূর্ব্ব সঞ্চার প্রকাশিত হইল, এবং বহুকাল পরে আবার ভারতের এবং সমগ্র জগতের বহুজনহিতায় প্রকৃত সাধক সর্ব্বস্বত্যাগরূপ ব্রতাবলম্বন করিতেছেন জানাইয়াই তিনি যেন আনন্দকলগানে ঐ সংবাদ দিগন্তে বহন করিতে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন।

গুরু মন্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন; শিষ্য অবহিতচিত্তে তাঁহাকে অনুসরণ পূর্ব্বক সেই সকল কথা উচ্চারণ করিয়া সমিদ্ধ হুতাশনে আহুতিপ্রদানে প্রস্তুত হইলেন। প্রথমে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারিত হইল—

সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে প্রার্থনামন্ত্র।

'পরব্রহ্মতত্ত্ব আমাকে প্রাপ্ত হউক্। পরমানন্দলক্ষণোপেত বস্তু আমাকে প্রাপ্ত হউক্। অখণ্ডৈকরস মধুময় ব্রহ্মবস্তু আমাতে প্রকাশিত হউক্। হে ব্রহ্মবিদ্যাসহ নিত্য বর্ত্তমান পরমাত্মন্, দেবমনুষ্যাদি তোমার সমগ্র সন্তানগণের মধ্যে আমি তোমার বিশেষ করুণাযোগ্য বালক সেবক; হে সংসাররূপ-দুঃস্বপ্নহারিন্ পরমেশ্বর, দ্বৈতপ্রতিভাসরূপ আমার যাবতীয় দুঃস্বপ্ন বিনাশ কর। হে পরমাত্মন্, আমার যাবতীয় প্রাণবৃত্তি আমি নিঃশেষে তোমাতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া ত্বদেকচিত্ত হইতেছি। হে সর্ব্বপ্রেরক দেব, জ্ঞানপ্রতিবন্ধক যাবতীয় মলিনতা আমা হইতে বিদূরিত করিয়া অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনাদিরহিত তত্ত্বজ্ঞান যাহাতে আমাতে উপস্থিত হয় তাহাই কর। সূর্য্য, বায়ু, নদীসকলের স্নিগ্ধ নির্ম্মল বারি, ব্রীহিযবাদি শস্য, বনস্পতিসমূহ, জগতের সকল পদার্থ তোমার নিদেশে অনুকূল প্রকাশযুক্ত হইয়া আমাকে তত্ত্বজ্ঞানলাভে সহায়তা করুক্। হে ব্রহ্মন্, তুমিই জগতে বিশেষ শক্তিমান্ নানা রূপে প্রকাশিত হইয়া

রহিয়াছ। শরীর মন শুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানধারণের যোগ্যতা লাভের জন্য আমি অগ্নি স্বরূপ তোমাতে আহুতি প্রদান করিতেছি—প্রসন্ন হও!"*

সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্ব-সম্পাদ্য বিরজা হোমের সংক্ষেপ ভাবার্থ।

অনন্তর বিরজা হোম আরম্ভ হইল—"পৃথ্বী, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশরূপে আমাতে অবস্থিত ভূতপঞ্চ শুদ্ধ হউক্; আহুতি দ্বারা রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যানাদি, আমাতে অবস্থিত বায়ুসকল শুদ্ধ হউক; আহুতি দ্বারা রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"আমার অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়-রূপ কোষ-পঞ্চ শুদ্ধ হউক্; আহুতি দ্বারা রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধপ্রসূত, আমাতে অবস্থিত বিষয়-সংস্কারসমূহ শুদ্ধ হউক্; আহুতি দ্বারা রজোগুণসুলভ মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"আমার মন, বাক্য, কায়, কর্ম্মাদি শুদ্ধ হউক্; আহুতি দ্বারা রজোগুণসুলভ মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃ-স্বরূপ হই—স্বাহা।

"হে অগ্নিশরীরে শয়ান, জ্ঞান-প্রতিবন্ধ-হরণ-কুশল, লোহি-তাক্ষ পুরুষ, জাগরিত হও; হে অভীষ্টপূরণকারিন্, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানপ্রতিবন্ধক নাশপূর্ব্বক গুরুমুখে শ্রুত জ্ঞান যাহাতে আমার অন্তরে সম্যক্ উদিত হয় তাহাই করিয়া দাও; আমাতে

* ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রের ভাবার্থ।

যাহা কিছু বর্ত্তমান সে সকল সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হউক্; আহুতি দ্বারা রজঃপ্রসূত মলিনতা বিদূরিত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা!

"চিদাভাস ব্রহ্মস্বরূপ আমি, দারা, পুত্র, সম্পৎ, লোকমান্য, সুন্দর শরীরাদি লাভের সমস্ত বাসনা অগ্নিতে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক ত্যাগ করিতেছি—স্বাহা।"

ঠাকুরের শিখা সূত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ।

ঐরূপে বহু আহুতি প্রদত্ত হইবার পর 'ভূরাদি সকল লোক লাভের প্রত্যাশা আমি এইক্ষণ হইতে ত্যাগ করিলাম' এবং 'জগতের সর্ব্বভূতকে অভয় প্রদান করিতেছি'—বলিয়া হোম পরিসমাপ্ত হইল; শিখা, সূত্র ও যজ্ঞোপবীত যথাবিধানে আহুতি দিয়া আবহমান কাল হইতে সাধকপরম্পরানিষেবিত গুরুপ্রদত্ত কৌপীন কাষায় ও নামে * ভূষিত হইয়া ঠাকুর শ্রীমৎ তোতার নিকটে উপদেশ গ্রহণের জন্য উপবিষ্ট হইলেন।

ঠাকুরের ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের জন্য শ্রীমৎ তোতার প্রেরণা।

অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞ তোতা ঠাকুরকে এখন বেদান্তপ্রসিদ্ধ 'নেতি নেতি' উপায়াবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বলিলেন—

নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, দেশকালাদি দ্বারা সর্ব্বদা অপরিচ্ছিন্ন এক মাত্র ব্রহ্মবস্তুই নিত্য সত্য। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া

* আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সন্ন্যাসদীক্ষা দানের সময় শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী, ঠাকুরকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। অন্য কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের পরম ভক্ত সেবক, শ্রীযুত মথুরামোহনই তাঁহাকে ঐ নামে প্রথম অভিহিত করেন। প্রথম মতটীই আমাদিগের সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

নিজপ্রভাবে তাঁহাকে নামরূপের দ্বারা খণ্ডিতবৎ প্রতীত করাইলেও তিনি কখনও বাস্তবিক ঐরূপ নহেন। কারণ, সমাধিকালে মায়াজনিত দেশকাল বা নামরূপের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি হয় না। অতএব নামরূপের সীমার মধ্যে যাহা কিছু অবস্থিত তাহা কখনও নিত্য বস্তু হইতে পারে না, তাহাকেই দূরপরিহার কর। নামরূপের দৃঢ় পিঞ্জর সিংহবিক্রমে ভেদ করিয়া নির্গত হও। আপনাতে অবস্থিত আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে ডুবিয়া যাও। সমাধিসহায়ে তাঁহাতে অবস্থান কর; দেখিবে, নামরূপাত্মক জগৎ তখন কোথায় লুপ্ত হইবে, ক্ষুদ্র আমিজ্ঞান বিরাটে লীন ও স্তব্ধীভূত হইবে এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে নিজ স্বরূপ বলিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবে। "যে জ্ঞানাবলম্বনে এক ব্যক্তি অপরকে দেখে, জানে বা অপরের কথা শুনে,তাহা অল্প বা ক্ষুদ্র; যাহা অল্প, তাহা তুচ্ছ—তাহাতে পরানন্দ নাই; কিন্তু যে জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া এক ব্যক্তি অপরকে দেখে না, জানে না বা অপরের বাণী ইন্দ্রিয়গোচর করে না—তাহাই ভূমা বা মহান্, তৎসহায়ে পরমানন্দে অবস্থিতি হয়। যিনি সর্ব্বথা সকলের অন্তরে বিজ্ঞাতা হইয়া রহিয়াছেন, কোন্ মনবুদ্ধি তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হইবে?"

ঠাকুরের মনকে নির্বিকল্প করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ায় তোতার আচরণ এবং ঠাকুরের নির্বিকল্পসমাধিলাভ।

শ্রীমৎ তোতা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নানা যুক্তি ও সিদ্ধান্তবাক্যসহায়ে ঠাকুরকে সেদিন সমাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, তিনি যেন সেদিন তাঁহার আজীবন সাধনালব্ধ উপলব্ধিসমূহ অন্তরে প্রবেশ করাইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অদ্বৈতভাবে সমাহিত করিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন।

তিনি বলিতেন, "দীক্ষা প্রদান করিয়া ন্যাংটা নানা সিদ্ধান্তবাক্যের উপদেশ করিতে লাগিল এবং মনকে সর্ব্বতোভাবে নির্ব্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিল। আমার কিন্তু এমনি হইল যে, ধ্যান করিতে বসিয়া চেষ্টা করিয়াও মনকে নির্ব্বিকল্প করিতে বা নামরূপের গণ্ডী ছাড়াইতে পারিলাম না। অন্য সকল বিষয় হইতে মন সহজেই গুটাইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু ঐরূপে গুটাইবামাত্র তাহাতে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিরপরিচিত চিদ্‌ঘনোজ্জ্বল মূর্ত্তি জ্বলন্ত জীবন্তভাবে সমুদিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার নামরূপ ত্যাগের কথা এককালে ভুলাইয়া দিতে লাগিল! সিদ্ধান্ত-বাক্যসকল শ্রবণপূর্ব্বক ধ্যানে বসিয়া যখন উপর্য্যুপরি ঐরূপ হইতে লাগিল তখন নির্ব্বিকল্প সমাধি-সম্বন্ধে এক প্রকার নিরাশ হইলাম এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ন্যাংটাকে বলিলাম, 'হইল না, মনকে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে মগ্ন হইতে পারিলাম না।' ন্যাংটা তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিল, 'কেঁও, হোগা নেহি' অর্থাৎ—কি? হইবে না, এত বড় কথা? বলিয়া কুটীরের মধ্যে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া ভগ্ন কাচখণ্ড দেখিতে পাইয়া উহা গ্রহণ করিল এবং সূচীর ন্যায় উহার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ভ্রূমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া বলিল, 'এই বিন্দুতে মনকে গুটাইয়া আন্।' তখন পুনরায় দৃঢ়সংকল্প করিয়া ধ্যানে বসিলাম এবং ৺জগদম্বার শ্রীমূর্ত্তি পূর্ব্বের ন্যায় মনে উদিত হইবামাত্র জ্ঞানকে অসি কল্পনা করিয়া উহা দ্বারা ঐ মূর্ত্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম! তখন আর মনে কোনরূপ বিকল্প রহিল না; একেবারে হু হু করিয়া উহা সমগ্র নাম-রূপ-রাজ্যের উপরে উঠিয়া গেল এবং সমাধিনিমগ্ন হইলাম!"

ঠাকুর নির্বিকল্প সমাধি যথার্থই লাভ করিয়াছেন কি না তৎদ্বিষয়ে তোতার পরীক্ষা ও বিস্ময়

ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সমাধিস্থ হইলে শ্রীমৎ তোতা অনেকক্ষণ তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট রহিলেন। পরে নিঃশব্দে কুটীরের বাহিরে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার অজ্ঞাতসারে পাছে কেহ কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক ঠাকুরকে বিরক্ত করে এজন্য দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন। অনন্তর কুটীরের অনতিদূরে পঞ্চবটীতলে নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য ঠাকুরের আহ্বান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

দিন যাইল, রাত্রি আসিল। দিনের পর দিন আসিয়া দিবসত্রয় অতিবাহিত হইল। তথাপি ঠাকুর শ্রীমৎ তোতাকে দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিলেন না! তখন বিস্ময়-কৌতূহলে তোতা আপনিই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং শিষ্যের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবেন বলিয়া অর্গল মোচন করিয়া কুটীরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—যেমন বসাইয়া গিয়াছিলেন ঠাকুর সেই ভাবেই বসিয়া আছেন, দেহে প্রাণের প্রকাশ মাত্র নাই, কিন্তু মুখ প্রশান্ত, গম্ভীর, জ্যোতিঃপূর্ণ! বুঝিলেন—বহির্জগৎ সম্বন্ধে শিষ্য এখনও সম্পূর্ণ মৃতকল্প—নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপবৎ তাঁহার চিত্ত ব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান করিতেছে!

সমাধিরহস্যজ্ঞ তোতা স্তম্ভিতহৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—যাহা দেখিতেছি তাহা কি বাস্তবিক সত্য—চল্লিশ বৎসরব্যাপী কঠোর সাধনায় যাহা জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহা কি এই মহাপুরুষ সত্য সত্যই এক দিবসে আয়ত্ত করিলেন! সন্দেহাবেগে তোতা পুনরায় পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন, তন্ন তন্ন করিয়া শিষ্যদেহে প্রকাশিত লক্ষণসকল অনুধাবন করিতে লাগিলেন। হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে কি না, নাসিকাদ্বারে বিন্দু-

মাত্র বায়ু নির্গত হইতেছে কি না, বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। ধীর স্থির কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত শিষ্যশরীর বারম্বার স্পর্শ করিলেন। কিছুমাত্র বিকার বৈলক্ষণ্য বা চেতনার উদয় হইল না! তখন বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইয়া তোতা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

'য়হ ক্যা দৈবী মায়া'—সত্য সত্যই সমাধি, বেদান্তোক্ত জ্ঞানমার্গের চরম ফল, নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়াছে!—দেবতার এ কি অত্যদ্ভুত মায়া!

শ্রীমৎ তোতার ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ করিবার চেষ্টা।

অনন্তর সমাধি হইতে শিষ্যকে ব্যুত্থিত করিবেন বলিয়া তোতা প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন এবং 'হরি ওম্' মন্ত্রের সুগম্ভীর আরাবে পঞ্চবটীর স্থল-জল-ব্যোম পূর্ণ হইয়া উঠিল।

পরে শিষ্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া এবং নির্ব্বিকল্প ভূমিতে তাহাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া শ্রীমৎ তোতা কিরূপে এখানে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের সহায়ে কিরূপে নিজ আধ্যাত্মিক জীবন সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিলেন, সে সকল কথা আমরা অন্যত্র* সবিস্তারে বলিয়াছি বলিয়া এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

একাদিক্রমে একাদশ মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া শ্রীমৎ তোতা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্থান করিলেন। ঐ ঘটনার অব্যবহিত পরেই ঠাকুরের মনে দৃঢ় সঙ্কল্প উপস্থিত হইল, তিনি এখন হইতে নিরন্তর নির্ব্বিকল্প অদ্বৈত ভূমিতে অবস্থান করিবেন। কিরূপে তিনি ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন—জীব-কোটি সাধকবর্গের কথা দূরে থাকুক, অবতারপ্রতিম আধিকারিক

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৮ম অধ্যায়, ২৪৮—২৭০ পৃঃ।

পুরুষেরাও যে ঘনীভূত অদ্বৈতাবস্থায় বহুকাল অবস্থান করিতে সক্ষম হয়েন না, সেই ভূমিতে কিরূপে তিনি নিরন্তর ছয় মাস কাল অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—এবং ঐকালে কিরূপে জনৈক সাধু পুরুষ কালীবাটীতে আগমন পূর্ব্বক ঠাকুরের দ্বারা পরে লোককল্যাণ বিশেষরূপে সাধিত হইবে একথা জানিতে পারিয়া ছয় মাস কাল তথায় অবস্থান করিয়া নানা উপায়ে তাঁহার শরীর রক্ষা করিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র * বলিয়াছি। অতএব ঠাকুরের সহায়ে এইকালে মথুর বাবুর জীবনে যে বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

ঠাকুরের জগদম্বা দাসীর কঠিন পীড়া আরোগ্য করা।

ঠাকুরের ভিতর নানা প্রকার অদ্ভুত দৈবশক্তির দর্শনে শ্রীযুত মথুরামোহনের ভক্তি বিশ্বাস ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই কালের একটী ঘটনায় সেই ভক্তি অধিকতর অচল অটল ভাব ধারণ পূর্ব্বক মথুরামোহনকে চিরকাল ঠাকুরের শরণাপন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

মথুরামোহনের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী এইকালে গ্রহণীরোগে আক্রান্তা হয়েন। রোগ ক্রমশঃ এত বাড়িয়া উঠে যে, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বৈদ্য সকলে তাঁহার জীবন-রক্ষাসম্বন্ধে প্রথমে সংশয়াপন্ন এবং পরে হতাশ হয়েন।

ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, মথুরামোহন সুপুরুষ ছিলেন, কিন্তু দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপবান্ দেখিয়াই রাসমণি তাঁহাকে প্রথমে নিজ তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ীর

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—২য় অধ্যায়, ৪৮—৫৭ পৃঃ।

সহিত এবং ঐ কন্যার মৃত্যু হইলে পুনরায় নিজ কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। অতএব বিবাহের পরেই শ্রীযুত মথুরের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় এবং স্বীয় বুদ্ধিবলে ও কর্ম্মকুশলতায় ক্রমে তিনি নিজ শ্বশ্রূঠাকুরাণীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হইয়া উঠেন। অনন্তর রাণী রাসমণির মৃত্যু হইলে কিরূপে তিনি রাণীর বিষয়সংক্রান্ত সকল কার্য্য পরিচালনায় একরূপ একাধিপত্য লাভ করেন তাহা আমরা পাঠককে ইতিপূর্ব্বে জানাইয়াছি।

শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক পীড়ায় মথুরামোহন এখন যে কেবল প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইতে বসিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজ শ্বশ্রূঠাকুরাণীর বিষয়ের উপর পূর্ব্বোক্ত আধিপত্যও হারাইতে বসিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মনের এখনকার অবস্থাসম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

রোগীর অবস্থা দেখিয়া যখন ডাক্তার বৈদ্যেরা জবাবদিয়া গেলেন মথুর তখনকাতর হইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কালীমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া ঠাকুরের অনুসন্ধানে পঞ্চবটীতে আসিলেন। তাঁহার ঐ প্রকার উন্মত্তপ্রায় অবস্থা দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে সযত্নে পার্শ্বে বসাইলেন এবং ঐরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মথুর তাহাতে তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া সজলনয়নে গদ গদ বাক্যে সকল কথা নিবেদন করিয়া দীনভাবে বারম্বার বলিতে লাগিলেন, 'আমার যাহা হইবার তাহা ত হইতে চলিল; বাবা, তোমার সেবাধিকার হইতেও এইবার বঞ্চিত হইলাম, তোমার সেবা আর করিতে পাইব না।'

মথুরের ঐরূপ দৈন্য দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় করুণায় পূর্ণ

হইল। তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া মথুরকে বলিলেন, ‘ভয় নাই, তোমার পত্নী আরোগ্য হইবে!’ বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জানিতেন, সুতরাং, তাঁহার অভয়বাণীতে প্রাণ পাইয়া সেদিন বিদায়গ্রহণ করিলেন। অনন্তর জানবাজারে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি দেখিলেন, সহসা জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে! ঠাকুর বলিতেন, “সেই দিন হইতে জগদম্বা দাসী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল এবং তাহার ঐ রোগটার ভোগ (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই শরীরের উপর দিয়া হইতে থাকিল; জগদম্বা দাসীকে ভাল করিয়া ছয়মাস কাল পেটের পীড়া ও অন্যান্য যন্ত্রণায় ভুগিতে হইয়াছিল!”

শ্রীযুত মথুরের ঠাকুরের প্রতি অদ্ভুত প্রেমপূর্ণ-সেবার কথা আলোচনা করিবার সময় ঠাকুর একদিন আমাদিগের নিকট পূর্ব্বোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, “মথুর যে চৌদ্দ বৎসর সেবা করিয়াছিল তাহা কি অমনি করিয়াছিল?—মা, তাহাকে (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর দিয়া নানা প্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত সব দেখাইয়াছিলেন, সে জন্যই সে অত সেবা করিয়াছিল।”

ষোড়শ অধ্যায়।

বেদান্তসাধনের শেষকথা ও ইসলামধর্ম্মসাধন।

ঠাকুরের কঠিন ব্যাধি। ঐ কালে তাঁহার মনের অপূর্ব্ব আচরণ।

শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক পীড়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আরোগ্য করিয়াই হউক অথবা অদ্বৈত-ভাব-ভূমিতে নিরন্তর অবস্থানের জন্য ঠাকুর দীর্ঘ ছয় মাস কাল ধরিয়া যে অমানুষী চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার ফলেই হউক তাঁহার দৃঢ় শরীর ভগ্ন হইয়া এখন কয়েক মাস রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। তাঁহার নিকটে শুনিয়াছি, ঐ সময়ে তিনি আমাশয় পীড়ায় কঠিনভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ভাগিনেয় হৃদয় নিরন্তর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিল, এবং শ্রীযুত মথুর তাঁহাকে সুস্থ ও রোগমুক্ত করিবার জন্য প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসা ও পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শরীর ঐরূপে ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও ঠাকুরের দেহবোধবিবর্জ্জিত মন এখন কি যে অপূর্ব্ব শান্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অবস্থান করিত তাহা বলিবার নহে। বিন্দুমাত্র উত্তেজনায়* উহা শরীর, ব্যাধি এবং সংসারের সকল বিষয় হইতে পৃথক্ হইয়া দূরে নির্ব্বিকল্প ভূমিতে এককালে উপনীত হইত, এবং ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বরের স্মরণমাত্রেই অন্য সকল কথা ভুলিয়া তন্ময় হইয়া কিছুকালের জন্য আপনার পৃথগস্তিত্ববোধ সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিত! সুতরাং ব্যাধির প্রকোপে শরীরে

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, ২য় অধ্যায়—৫৮ পৃষ্ঠা দেখ।

অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইলেও তিনি যে, উহার সামান্যমাত্রই উপলব্ধি করিতেন, একথা বুঝিতে পারা যায়। তবে, ঐ ব্যাধির যন্ত্রণা সময়ে সময়ে তাঁহার মনকে উচ্চভাবভূমি হইতে নামাইয়া শরীরে যে নিবিষ্ট করিত, একথাও আমরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন, এই কালেই আবার তাঁহার নিকটে বেদান্তমার্গ-বিচরণশীল সাধকাগ্রণী পরমহংসসকলের আগমন হইয়াছিল এবং 'নেতি নেতি', 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' প্রভৃতি বেদান্তপ্রসিদ্ধ তত্ত্বসমূহের বিচারধ্বনিতে তাঁহার বাসগৃহ নিরন্তর মুখরিত হইয়া থাকিত।* বেদান্তপ্রসিদ্ধ ঐসকল উচ্চ তত্ত্বের বিচারকালে তাঁহারা যখন কোন বিষয়ে সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেন না, ঠাকুরকেই তখন মধ্যস্থ হইয়া উহার মীমাংসা করিয়া দিতে হইত। বলা বাহুল্য, ইতর সাধারণের ন্যায় ব্যাধির প্রকোপে নিরন্তর মুহ্যমান হইয়া থাকিলে কঠোর দার্শনিক বিচারে ঐরূপে প্রতিনিয়ত যোগদান করা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইত না।

অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ঠাকুরের দর্শন—ঐ দর্শনের ফলে তাঁহার উপলব্ধিসমূহ।

আমরা অন্যত্র বলিয়াছি, নির্ব্বিকল্প ভূমিতে নিরন্তর অবস্থানকালের শেষভাগে ঠাকুরের এক বিচিত্র দর্শন বা উপলব্ধি উপস্থিত হইয়াছিল। ভাবমুখে অবস্থান করিবার জন্য তিনি তৃতীয়বার আদিষ্ট হইয়াছিলেন।† 'দর্শন' বলিয়া ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিলেও উহা যে তাঁহার প্রাণে প্রাণে উপলব্ধির কথা ইহা পাঠক বুঝিয়া লইবেন। কারণ, পূর্ব্ব দুইবারের ন্যায় ঠাকুর

---

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—২য় অধ্যায়—৪৮—৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

† বর্ত্তমান গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় দেখ।

এই কালে কোন দৃষ্ট মূর্ত্তির মুখে ঐ কথা শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু তুরীয়, অদ্বৈতভাবে একেবারে একীভূত হইয়া অবস্থান করিবার কালে যখন তাঁহার মন কথঞ্চিৎ পৃথক্ হইয়া কখন কখন আপনাকে সগুণ বিরাট ব্রহ্মের বা শ্রীশ্রীজগদম্বার অংশ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছিল তখন উহা বিরাট ব্রহ্মের বিরাট মনে ঐরূপ ভাব বা ইচ্ছার বিদ্যমানতা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছিল † ঐ উপলব্ধি হইতে তাঁহার নিজ জীবনের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা তাঁহার সম্মুখে এখন সম্যক্ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল।

কারণ, শরীর রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিন্দুমাত্র বাসনা অন্তরে না থাকিলেও শ্রীশ্রীজগদম্বার বিচিত্র ইচ্ছায় ঐরূপে পুনরায় ভাবমুখে অবস্থান করিতে আদিষ্ট হইয়া ঠাকুর এখন বুঝিতে পারিলেন যে, নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও ভগবল্লীলাপ্রয়োজনের জন্য তাঁহাকে অতঃপর দেহ রক্ষা করিতে হইবে এবং নিত্যকাল ব্রহ্মে অবস্থান করিলে শরীর থাকা সম্ভবপর নহে বলিয়াই তিনি ঐরূপ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। পরে জাতিস্মরত্বসহায়ে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাববান্ আধিকারিক অবতার পুরুষ, বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মগ্লানি দূর করিয়া লোককল্যাণ সাধনের জন্যই তাঁহাকে দেহধারণ ও তপস্যাদিসাধন করিতে হইয়াছে। বুঝিতে পারিলেন, শ্রীশ্রীজগন্মাতা উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনের জন্যই এবার তাঁহাকে বাহ্যৈশ্বর্য্যের আড়ম্বরপরিশূন্য করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে নিরক্ষর করিয়া আনয়ন কয়িয়াছেন। বুঝিলেন, শ্রীশ্রীজগন্মাতার এ লীলারহস্য তাঁহার জীবৎকালে স্বল্পলোকেই ধরিতে বুঝিতে সমর্থ হইবে এবং

---

† গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, ৩য় অধ্যায়—৯৯ হইতে ১০৪ পৃষ্ঠা দেখ।

ইতরসাধারণে ঐ কথা বুঝিতে আরম্ভ করিলেই মাতা নিজ সন্তানকে আপন অঙ্গে মিলিত করিয়া লইবেন—কিন্তু তাঁহার শরীরমনের দ্বারা যে প্রবল আধ্যাত্মিক তরঙ্গ জগতে উদিত হইবে তাহা সর্ব্বতোভাবে অমোঘ থাকিয়া তিনি দেহ রক্ষা করিবার পরেও অনন্তকাল জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করিতে থাকিবে।

ঐরূপ অসাধারণ উপলব্ধিসকল ঠাকুরের কিরূপে উপস্থিত হইয়াছিল বুঝিতে হইলে শাস্ত্রের কয়েকটি কথা আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। শাস্ত্র বলেন, অদ্বৈতভাব-সহায়ে জ্ঞানস্বরূপে পূর্ণরূপে অবস্থান করিবার পূর্ব্বে সাধক জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়া থাকেন। * অথবা, ঐ ভাবের পরিণামে তাঁহার স্মৃতি তখন এতদূর পরিণত অবস্থায় উপস্থিত হয় যে, ইতি-পূর্ব্বে তিনি যে ভাবে, যথায়, যতবার শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং ঐ জন্মসকলে যাহা কিছু সুকৃত দুষ্কৃতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সে সকল কথা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইয়া থাকে। ফলে, সংসারের সকল বিষয়ের নশ্বরতা এবং রূপরসাদি ভোগসুখের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া বারম্বার একই ভাবে জন্মপরিগ্রহের নিষ্ফলতা সম্যক্ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া তাঁহার মনে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং ঐ বৈরাগ্য-সহায়ে তাঁহার প্রাণ সর্ব্ববিধ বাসনা হইতে এককালে পৃথক্ হইয়া দণ্ডায়মান হয়।

ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে সাধকের জাতিস্মরত্ব-লাভসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা।

---

* সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানং। পাতঞ্জলসূত্র-বিভূতিপাদ, ১৮শ সূত্র।

উপনিষদ্ বলেন, * ঐরূপ পুরুষ সিদ্ধসঙ্কল্প হয়েন এবং দেব পিতৃ প্রভৃতি যখন যে লোক প্রত্যক্ষ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় তখনই তাঁহার মন সমাধি-বলে ঐ সকল লোক সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। মহামুনি পতঞ্জলি তৎকৃত যোগশাস্ত্রে ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐরূপ পুরুষে সর্ব্ববিধ বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য্যের উদয় হইয়া থাকে। আবার, পঞ্চদশীকার সায়ন-মাধব ঐরূপ পুরুষের বাসনারাহিত্য এবং যোগৈশ্বর্য্যলাভ উভয় কথার সামঞ্জস্য করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐরূপ বিচিত্র ঐশ্বর্য্যসকল লাভ করিলেও বাসনা না থাকায় তাঁহারা ঐ সকল শক্তি নিজ ভোগসুখলাভের জন্য কখনও প্রয়োগ করেন না। সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরেচ্ছাধীন থাকিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে আধিকারিক † পুরুষেরাই কেবল কখন কখন বহুজনহিতায় ঐ শক্তিসকলের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পঞ্চদশীকার বলেন, ঐজন্য পুরুষ সংসারে যে অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করেন, ঐ জ্ঞানলাভের পরে তদবস্থাতেই কালাতিপাত করেন, সমর্থ হইলেও ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যকতা কিছুমাত্র অনুভব করেন না।

ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সাধকের সর্ব্বপ্রকার যোগ-বিভূতি ও সিদ্ধ-সঙ্কল্পত্বলাভসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা।

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় কথাসকল স্মরণ রাখিয়া ঠাকুরের বর্ত্তমান জীবনের অনুশীলনে তাঁহার এই কালের বিচিত্র অনুভূতিসকল সম্যক্ না হইলেও অনেকাংশে বুঝিতে পারা যায়। বুঝা যায় যে, তিনি ভগবৎপাদপদ্মে অন্তরের সহিত সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া সর্ব্ব-প্রকারে বাসনাপরিশূন্য হইয়াছিলেন বলিয়াই

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রকথা-নুসারে ঠাকুরের জীবনালোচনায় তাঁহার অপূর্ব্ব উপলব্ধিস কলের কারণ বুঝা যায়।

* ছান্দোগ্যোপনিষৎ—৮ম প্রপাঠক—২য় খণ্ড। † লোককল্যাণ সাধনের জন্য যাঁহারা বিশেষ অধিকার বা শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

অত স্বল্পকালে ব্রহ্মজ্ঞানের নির্ব্বিকল্প ভূমিতে উঠিতে এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বুঝা যায় যে, তিনি জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়াই এইকালে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যিনি 'শ্রীরাম' এবং 'শ্রীকৃষ্ণ' রূপে আবির্ভূত হইয়া লোককল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, তিনিই বর্ত্তমান কালে পুনরায় শরীর পরিগ্রহ করিয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণ' রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। বুঝা যায় যে, লোককল্যাণ-সাধনের জন্য পরজীবনে তাঁহাতে বিচিত্র বিভূতিসকলের প্রকাশ নিত্য দেখিতে পাইলেও কেন আমরা কখনও তাঁহাকে আপন শরীরমনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ঐ সকল দিব্যশক্তির প্রয়োগ করিতে দেখিতে পাই না। বুঝা যায়, কেন তিনি সঙ্কল্পমাত্রেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি অপরের মধ্যে জাগরিত করিয়া দিতে সমর্থ হইতেন; এবং বুঝা যায়, কেন তাঁহার দিব্যপ্রভাব দিন দিন পৃথিবীর সকল দেশে অপূর্ব্ব আধিপত্যলাভ করিতেছে।

পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধিসকল ঠাকুরের যুগপৎ উপস্থিত না হইবার কারণ।

অদ্বৈতভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভাবরাজ্যে পুনরায় অবরোহণ করিবার কালে ঠাকুর ঐরূপে নিজ জীবনের ভূতভবিষ্যৎ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ উপলব্ধিসকল তাঁহাতে যে, সহসা একদিন যুগপৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় না। আমাদিগের অনুমান, ভাবভূমিতে অবরোহণের পরে বৎসরকালের মধ্যে তিনি ঐ সকল কথা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতা ঐ কালে তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে আবরণের পর আবরণ উঠাইয়া দিন দিন তাঁহাকে ঐ সকল কথা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধিসকল ঠাকুরের মনে যুগপৎ কেন উপস্থিত হয় নাই তদ্বিষয়ের কারণ

জিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগকে বলিতে হয় যে, অদ্বৈতভাবে অবস্থানপূর্ব্বক গভীর ব্রহ্মানন্দসম্ভোগে তিনি এইকালে নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন। সুতারং তাঁহার মন যতদিন না বহির্মুখী বৃত্তি পুনরায় অবলম্বন করিয়াছিল ততদিন ঐ সকল বিষয় উপলব্ধি করিবার তাঁহার অবসর ছিল না এবং প্রবৃত্তিও হয় নাই। সে যাহা হউক, সাধনকালের প্রারম্ভে ঠাকুর যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'মা আমি কি করিব, তাহা কিছুই জানি না, তুই স্বয়ং আমাকে যাহা শিখাইবি, তাহাই শিখিব'—তাহা এই কালে পূর্ব্বোক্তরূপে পূর্ণ হইয়াছিল।

অদ্বৈত-ভাব-ভূমিতে আরূঢ় হইয়া ঠাকুরের এই কালে আর একটী বিষয়ও উপলব্ধি হইয়াছিল। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ব্ববিধ সাধন-ভজনের চরম উদ্দেশ্য। কারণ, ভারতের প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মতাবলম্বনে সাধন করিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা প্রত্যেকেই সাধককে উক্ত ভূমির দিকে অগ্রসর করে। অদ্বৈতভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেই জন্য আমাদিগকে বারম্বার বলিতেন, 'উহা শেষ কথা রে, শেষ কথা, ঈশ্বর-প্রেমের চরম পরিণতিতে সর্ব্বশেষে উহা সাধক-জীবনে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়; জানিবি, সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত, তত পথ।'

অদ্বৈতভাব লাভ করাই সকল সাধনের উদ্দেশ্য বলিয়া ঠাকুরের উপলব্ধি।

ঐরূপে অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়া ঠাকুরের মন অসীম উদারতা লাভ করিয়াছিল। ঈশ্বরলাভকে যাহারা মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া শিক্ষা প্রদান করে, ঐরূপ সকল সম্প্রদায়ের

প্রতি উহা এখন অপূর্ব্ব সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ঐরূপ উদারতা এবং সহানুভূতি যে তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি, এবং পূর্ব্বযুগের কোন সাধকাগ্রণী যে, উহা তাঁহার ন্যায় পূর্ণভাবে লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, এ কথা প্রথমে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে এবং প্রসিদ্ধ তীর্থসকলে নানা সম্প্রদায়ের প্রবীণ সাধকসকলের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমে তাঁহার ঐ কথার উপলব্ধি হইয়াছিল বলিয়াই আমাদিগের ধারণা; কিন্তু এখন হইতে তিনি ধর্ম্মের একদেশী ভাব অবলোকন করিলেই প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ হীনবুদ্ধি দূর করিতে সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট হইতেন।

পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধি তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কেহ পূর্ণভাবে করে নাই।

অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঠাকুরের মন এখন কিরূপ উদার ভাবসম্পন্ন হইয়াছিল তাহা আমরা এই কালের একটী ঘটনায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি। আমরা দেখিয়াছি, ঐ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইবার পরে ঠাকুরের শরীর কয়েক মাসের জন্য রোগাক্রান্ত হয়। ব্যাধির হস্ত হইতে তাঁহার মুক্ত হইবার পরে উল্লিখিত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের মনের উদারতা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত—তাঁহার ইসলামধর্ম্মসাধন।

গোবিন্দ রায় নামক এক ব্যক্তি এই সময়ের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে ধর্ম্মান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। হৃদয় বলেন, ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। সম্ভবতঃ পারসী ও আরবী ভাষায় ইঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা মতামত আলোচনা করিয়া এবং নানা সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া ইনি পরিশেষে ইসলাম ধর্ম্মের উদার মতে আকৃষ্ট হইয়া যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করেন। ধর্ম্মপিপাসু গোবিন্দ ইসলামের ধর্ম্মমত গ্রহণ করিলেও উহার সামাজিক নিয়মপদ্ধতি

কতদূর অনুসরণ করিতেন, বলিতে পারি না। কিন্তু দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অবধি তিনি যে, কোরাণ পাঠ এবং তদুক্ত প্রণালীতে সাধনভজনে মহোৎসাহে নিযুক্ত ছিলেন, একথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। গোবিন্দ প্রেমিক ছিলেন। বোধ হয়, ইস্‌লামের স্থফি সম্প্রদায়ে প্রচলিত শিক্ষা এবং ভাবসহায়ে ঈশ্বরের উপাসনা করিবার পদ্ধতি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। কারণ, ঐ সম্প্রদায়ের দরবেশদিগের মত তিনি এখন ভাবসাধনে অহোরাত্র নিযুক্ত থাকিতেন।

স্থফি গোবিন্দ রায়ের আগমন।

যেরূপেই হউক, গোবিন্দ এখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হয়েন এবং সাধনানুকূল বুঝিয়া পঞ্চবটীর শান্তিপ্রদ ছায়ায় আসনবিস্তীর্ণ করিয়া কিছুকাল কাটাইতে থাকেন। রাণী রাসমণির কালীবাটীতে, তখন হিন্দু সংসারত্যাগীদের ন্যায় মুসলমান ফকীরগণেরও সমাদর ছিল, এবং কালীবাটীর আতিথ্য উভয় দলের উপরেই সমভাবে বর্ষিত হইত। অতএব এখানে থাকিবার কালে গোবিন্দের ভিক্ষাটনাদি করিতে হইত না এবং ইষ্টচিন্তায় নিযুক্ত হইয়া তিনি সানন্দে দিন যাপন করিতেন।

গোবিন্দের সহিত আলাপ করিয়া ঠাকুরের সঙ্কল্প।

প্রেমিক গোবিন্দকে দেখিয়া ঠাকুর তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়েন, এবং তাঁহার সহিত আলপে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সরল বিশ্বাস ও প্রেমে মুগ্ধ হয়েন। ঐরূপে ঠাকুরের মন এখন ইসলামধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি ভাবিতে থাকেন, 'ইহাও ত ঈশ্বরলাভের এক পথ, অনন্তলীলাময়ী মা এপথ দিয়াও ত কত লোককে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মলাভে ধন্য করিতেছেন; এ পথ দিয়া কিরূপে তিনি তাঁহার আশ্রিতদিগকে কৃতার্থ করেন

তাহা দেখিতে হইবে, গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া ঐভাব-সাধনে নিযুক্ত হইব।'

যে চিন্তা, সেই কাজ। ঠাকুর গোবিন্দকে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যথাবিধি ইসলামধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ঐ সময়ে 'আল্লা' মন্ত্র জপ করিতাম, মুসলমানদিগের ন্যায় কাছা খুলিয়া কাপড় পরিতাম, ত্রিসন্ধ্যা নমাজ পড়িতাম, এবং হিন্দুভাব মন হইতে এককালে লুপ্ত হওয়ায় হিন্দুর দেবদেবীকে প্রণাম দূরে থাকুক, দর্শন পর্য্যন্ত করিতে প্রবৃত্তি হইত না। ঐভাবে তিন দিবস অতিবাহিত হইবার পরে ঐ মতের সাধনফল সম্যক্ হস্তগত হইয়াছিল।" ইসলামধর্ম্মসাধনকালে ঠাকুর প্রথমে এক দীর্ঘ শ্মশ্রুবিশিষ্ট, সুগম্ভীর জ্যোতির্ম্ময় পুরুষপ্রবরের দিব্য দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। পরে সগুণ বিরাট ব্রহ্মের উপলব্ধি পূর্ব্বক তুরীয় নির্গুণব্রহ্মে তাঁহার মন লীন হইয়া গিয়াছিল।

গোবিন্দের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধনে ঠাকুরের সিদ্ধিলাভ।

হৃদয় বলেন, মুসলমানধর্ম্মসাধনের সময় ঠাকুর, মুসলমান-দিগের খাদ্যসকল, এমন কি গোমাংস গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। মথুরামোহনের সানুনয় অনুরোধই তখন তাঁহাকে ঐ কর্ম্ম হইতে নিরস্ত করিয়াছিল। বালকস্বভাব ঠাকুরের ঐরূপ ইচ্ছা অন্ততঃ আংশিক পূর্ণ না হইলে তিনি কখন নিরস্ত হইবেন না ভাবিয়া মথুর ঐ সময়ে এক মুসলমান পাচক আনাইয়া তাহার নির্দ্দেশে এক ব্রাহ্মণের দ্বারা মুসলমানদিগের প্রণালীতে খাদ্যসকল রন্ধন করাইয়া ঠাকুরকে খাইতে দিয়াছিলেন। মুসলমানধর্ম্ম সাধনের সময় ঠাকুর কালীবাটীর অভ্যন্তরে একবারও পদার্পণ

মুসলমানধর্ম্ম সাধনকালে ঠাকুরের আচরণ।

করেন নাই। উহার বাহিরে অবস্থিত মথুরামোহনের কুঠিতেই থাকিতেন।

ভারতের হিন্দু ও মুসলমান জাতি কালে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, ঠাকুরের ইসলাম মত সাধনে ঐ বিষয় বুঝা যায়।

বেদান্তসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের মন অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি কিরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায় এবং একমাত্র বেদান্তবিজ্ঞানে বিশ্বাসী হইয়াই যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলমানকুল পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন এবং ভ্রাতৃভাবে নিবদ্ধ হইতে পারে একথাও হৃদয়ঙ্গম হয়। নতুবা ঠাকুর যেমন বলিতেন, 'হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেন একটা পর্ব্বত ব্যবধান রহিয়াছে—পরস্পরের চিন্তাপ্রণালী, ধর্ম্মবিশ্বাস ও কার্য্যকলাপ এতকাল একত্র বাসেও পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে।' ঐ পাহাড় যে একদিন অন্তর্হিত হইবে এবং উভয়ে প্রেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবে, যুগাবতার ঠাকুরের মুসলমান-ধর্ম্মসাধন কি তাহারই সূচনা করিয়া যাইল ?

পরবর্ত্তীকালে ঠাকুরের মনে অদ্বৈতস্মৃতি কত দূর প্রবল ছিল।

নির্ব্বিকল্প ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে ঠাকুরের এখন দ্বৈতভূমির সীমান্তরালে অবস্থিত বিষয় ও ব্যক্তিসকলকে দেখিয়া অদ্বৈতস্মৃতি অনেক সময় সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিত এবং তাঁহাকে তুরীয়ভাবে লীন করিত। সঙ্কল্প না করিলেও সামান্য মাত্র উদ্দীপনায় আমরা তাঁহার ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। অতএব এখন হইতে তিনি সঙ্কল্প করিবামাত্র যে, ঐ ভূমিতে আরোহণে সমর্থ ছিলেন, এ কথা বলা বাহুল্য। অদ্বৈতভাব যে, তাঁহার কতদূর অন্তরের পদার্থ ছিল তাহা পূর্ব্বোক্ত-প্রকার সামান্য বিষয়সকল হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, এবং

বুঝা যায় যে ঐ ভাব তাঁহার হৃদয়ে যেমন দুরবগাহ তেমনই দূর প্রচারী ছিল। ঠাকুরের জীবন হইতে ঐ ভাবের পরিচায়ক কয়েকটী ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন।

ঐ বিষয়ক কয়েকটী দৃষ্টান্ত—(১) বৃদ্ধ ঘেসেড়া।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর প্রশস্ত উদ্যান বর্ষাকালে তৃণাচ্ছন্ন হওয়ায় মালিদিগের তরিতরকারি বপনের বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। তজ্জন্য ঘেসেড়াদিগকে ঐ সময়ে ঘাস কাটিয়া লইবার অনুমতি প্রদান করা হয়। একজন বৃদ্ধ ঘেসেড়া একদিন ঐরূপে বিনা-মূল্যে ঘাস লইবার অনুমতি পাইয়া সানন্দে ঘাস কাটিতেছিল এবং পরে মোট বাঁধিয়া উহা বাজারে বিক্রয় করিতে যাইবার উপক্রম করিতেছিল। ঠাকুর দেখিতে পাইলেন, লোভে পড়িয়া সে এত ঘাস কাটিয়াছে যে, ঐ ঘাসের বোঝা লইয়া যাওয়া বৃদ্ধের শক্তিতে সম্ভবে না। দরিদ্র ঘেসেড়া কিন্তু ঐ বিষয় কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া বৃহৎ বোঝাটী মাথায় তুলিয়া লইবার জন্য নানারূপে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও উহা উঠাইতে পারিতেছিল না। ঐ বিষয় দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। ভাবিলেন, অন্তরে পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ আত্মা বিদ্যমান এবং বাহিরে এত নিবুদ্ধিতা, এত অজ্ঞান! 'হে রাম, তোমার বিচিত্র লীলা!'—বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন!

(২) আহত পতঙ্গ।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর দেখিলেন একটী পতঙ্গ (ফড়িং) উড়িয়া আসিতেছে এবং উহার গুহ্যদেশে একটী লম্বা কাটি বিদ্ধ রহিয়াছে। কোন দুষ্ট বালকে ঐরূপ করিয়াছে ভাবিয়া তিনি প্রথমে ব্যথিত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবাবিষ্ট হইয়া 'হে রাম, তুমি আপনার দুর্দ্দশা আপনি করিয়াছ' বলিয়া হাস্যের রোল উঠাইলেন!

কালীবাটীর উদ্যানের স্থানবিশেষ নবীন দূর্ব্বাদলে সমাচ্ছন্ন হইয়া এক সময়ে রমণীয়দর্শন হইয়াছিল। ঠাকুর উহা দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, ঐ স্থানকে সর্ব্বতোভাবে তাঁহার নিজ অঙ্গ বলিয়া তখন অনুভব করিতেছিলেন; এমন সময়ে সহসা এক ব্যক্তি ঐস্থানের উপর দিয়া অন্যত্র গমন করিতে লাগিল। তিনি উহাতে নিজ বক্ষের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়া এককালে অস্থির হইয়া পড়িলেন। ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'বুকের উপর দিয়া কেহ চলিয়া যাইলে যেমন যন্ত্রণার অনুভব হয় ঐ কালে ঠিক সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলাম। ঐরূপ ভাবাবস্থা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, আমার উহা ছয় ঘণ্টাকাল মাত্র ছিল, তাহাতেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম।'

(৩) পদদলিত নবীন দুর্ব্বাদল।

কালীবাটীর চাঁদ্‌নি-সমাযুক্ত বৃহৎ ঘাটে দণ্ডায়মান হইয়া ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে গঙ্গাদর্শন করিতেছিলেন। ঘাটে তখন দুইখানি নৌকা লাগিয়াছিল এবং মাঝিরা কোন বিষয় লইয়া পরস্পর কলহ করিতেছিল। কলহ ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া সবল ব্যক্তি দুর্ব্বলের পৃষ্ঠদেশে বিষম চপেটাঘাত করিল। ঠাকুর উহাতে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ঐরূপ কাতর ক্রন্দন কালীঘরে হৃদয়ের কর্ণে প্রবেশ করায় সে দ্রুতপদে তথায় আগমনপূর্ব্বক দেখিল তাঁহার পৃষ্ঠদেশ আরক্তিম হইয়াছে এবং ফুলিয়া উঠিয়াছে। ক্রোধে অধীর হইয়া হৃদয় বারম্বার বলিতে লাগিল, 'মামা, কে তোমায় মারিয়াছে দেখাইয়া দাও, আমি তার মাথাটা ছিঁড়িয়া লই।' পরে ঠাকুর কথঞ্চিৎ

(৪) নৌকায় মাঝিদ্বয়ের পরস্পর কলহে ঠাকুরের নিজ শরীরে আঘাতানুভব।

শান্ত হইলে ঘটনা শুনিয়া হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, ইহাও কি কখন সম্ভবপর ! ঘটনাটী শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন । ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐরূপ অনেক ঘটনার* উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাহুল্য বোধে আমরা নিরস্ত হইলাম ।

সপ্তদশ অধ্যায়।

জন্মভূমিসন্দর্শন ।

প্রায় ছয়মাস কাল ভুগিয়া ঠাকুরের শরীর অবশেষে ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইল, এবং মন ভাবমুখে দ্বৈতাদ্বৈতভূমিতে অবস্থান করিতে অনেকাংশে অভ্যস্ত হইয়া আসিল। কিন্তু তাঁহার শরীর তখনও পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হয় নাই। সুতরাং বর্ষাগমে গঙ্গার জল লবণাক্ত হইলে বিশুদ্ধ পানীয়ের অভাবে তাঁহার পেটের পীড়া যে পুনরায় দেখা দিবে না, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা কি ? অতএব স্থির হইল, এখন তাঁহার কয়েকমাসের জন্য জন্মভূমি কামারপুকুরে গমন করাই শ্রেয়ঃ। তখন সন ১২৭৪ সালের জ্যৈষ্ঠ হইবে। আয়োজন হইতে লাগিল। মথুর-পত্নী ভক্তিমতী জগদম্বা দাসী, কামারপুকুরের ঠাকুরের সংসার, শিবের সংসারের ন্যায় চিরদরিদ্র বলিয়া জানিতেন। অতএব সেখানে যাইয়া 'বাবা'-কে যাহাতে

ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের কামারপুকুরে গমন।

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ, ২য় অধ্যায়—৭৪,৭৫ পৃষ্ঠা দেখ।

কোন বিষয়ের জন্য কষ্ট পাইতে না হয়, এরূপভাবে সকল কথা তন্ন তন্ন করিয়া ভাবিয়া দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। * অনন্তর শুভ মুহূর্ত্তের উদয় হইলে, ঠাকুর যাত্রা করিলেন। হৃদয় ও ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহার সঙ্গে যাইল। তাঁহার বৃদ্ধা জননী কিন্তু গঙ্গাতীরে বাস করিবেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাই স্থির রাখিয়া দক্ষিণেশ্বরে, মথুরের নিকটে বাস করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রায় আট বৎসরকাল ঠাকুর কামারপুকুরে আগমন করেন নাই, সুতরাং তাঁহার আত্মীয়বর্গ যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন একথা বলা বাহুল্য। কখনও স্ত্রীবেশ ধরিয়া 'হরি হরি' করিতেছেন, কখনও সন্ন্যাসী হইয়াছেন, কখনও 'আল্লা আল্লা' বলিতেছেন, প্রভৃতি তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হওয়ায় ঐরূপ হইবার বিশেষ কারণ যে ছিল একথা বলিতে হইবে না। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাদিগের মধ্যে আসিবামাত্র তাঁহাদিগের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইল।

ঠাকুরকে তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ যেভাবে দেখিয়া ছিল।

তাঁহারা দেখিলেন, তিনি পূর্ব্বে যেমন ছিলেন এখনও তদ্রূপ আছেন। সেই অমায়িকতা, সেই প্রেমপূর্ণ হাস্য-পরিহাস, সেই কঠোর সত্যনিষ্ঠা, সেই ধর্ম্মপ্রাণতা, সেই হরিনামে বিহ্বল হইয়া আত্মহারা হওয়া—সেই সকলই তাঁহাতে পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে, কেবল, কি একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় দিব্যাবেশ তাঁহার শরীরমনকে সর্ব্বদা এমন সমুদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে যে সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইতে, এবং তিনি স্বয়ং ঐরূপ না করিলে ক্ষুদ্র সংসারের বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে,

* গুরুভাব উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায়, ১২ ও ১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

হৃদয়ে কোথা হইতে বিষম সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হয়। আবার, নিকটে থাকিলে সংসারের সকল দুর্ভাবনা যেমন কোথায় অপসারিত হইয়া প্রাণে একটী ধীর স্থির আনন্দ ও শান্তি প্রবাহিত থাকে, দূরে যাইলে তেমনি পুনরায় তাঁহার নিকটে যাইবার জন্য কি একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। সে যাহা হউক, বহুকাল পরে তাঁহাকে পাইয়া এই দরিদ্র সংসারে এখন আনন্দের হাটবাজার বসিল, এবং নববধূকে আনাইয়া সুখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্য রমনীগণের নির্দ্দেশে ঠাকুরের শ্বশুরালয় জয়রামবাটী গ্রামেও লোক প্রেরিত হইল। ঠাকুর ঐ বিষয় জানিতে পারিয়া উহাতে বিশেষ সম্মতি বা আপত্তি কিছুই প্রকাশ করিলেন না। বিবাহের পর নববধূর ভাগ্যে একবার মাত্র স্বামিসন্দর্শন লাভ হইয়াছিল। কারণ তাঁহার সপ্তম বর্ষ বয়সকালে কুলপ্রথানুসারে ঠাকুরকে একদিন জয়রামবাটীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তখনও তিনি নিতান্ত বালিকা, ঐ বিষয় বুঝিবার কিছুমাত্র অধিকারিণী ছিলেন না। সুতরাং ঐ ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার এইটুকুমাত্রই মনে ছিল যে, হৃদয়ের সহিত ঠাকুর তাঁহার পিত্রালয়ে আসিলে বাটীর কোন নিভৃত অংশে তিনি লুকাইয়াও পরিত্রাণ পান নাই। কারণ, কোথা হইতে অনেকগুলি পদ্মফুল আনিয়া কিছুক্ষণ বাদে হৃদয় তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল এবং লজ্জা ও ভয়ে তিনি নিতান্ত সঙ্কুচিত হইলেও পাদপদ্ম পূজা করিয়াছিল। ঐ ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর পরে তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহাকে কামারপুকুরে প্রথম লইয়া যাওয়া হয়। সেবার তাঁহাকে তথায় একমাস থাকিতেও হইয়াছিল। কিন্তু, ঠাকুর ও ঠাকুরের জননী তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকায় উভয়ের কাহাকেও দেখা তাঁহার ভাগ্যে হইয়া

উঠে নাই। উহার ছয় মাস আন্দাজ পরে পুনরায় শ্বশুরালয়ে আগমন পূর্ব্বক দেড়মাস কাল থাকিয়াও পূর্ব্বোক্ত কারণে তিনি তাঁহাদের কাহাকেও দেখিতে পান নাই। মাত্র তিন চারি মাস তাঁহার তথা হইতে পিত্রালয়ে ফিরিবার পরেই এখন সংবাদ আসিল—ঠাকুর আসিয়াছেন, তাঁহাকে কামারপুকুরে যাইতে হইবে। তিনি তখন ছয় সাত মাস হইল চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। সুতরাং বলিতে গেলে, বিবাহের পরে ইহাই তাঁহার প্রথম স্বামিসন্দর্শন।

শ্রীশ্রীমার কামার পুকুরে আগমন।

কামারপুকুরে ঠাকুর এবার ছয়, সাত মাস ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার বাল্যবন্ধুগণ এবং গ্রামস্থ পরিচিত স্ত্রীপুরুষ সকলে তাঁহার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় মিলিত হইয়া তাঁহার প্রীতিসম্পাদনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরও বহুকাল পরে তাঁহাদিগকে দেখিয়া পরিতুস্ট হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রমের পর অবসরলাভে চিন্তাশীল মনীষিগণ বালকবালিকাদিগের অর্থহীন উদ্দেশ্যরহিত ক্রীড়াদিতে যোগদান করিয়া যেরূপ আনন্দ অনুভব করেন, কামারাপুকুরের স্ত্রী-পুরুষ সকলের ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবনে যোগদান করিয়া ঠাকুরের বর্ত্তমান আনন্দ তদ্রূপ হইয়াছিল। তবে, ইহজীবনের নশ্বরতা অনুভব করিয়া যাহাতে তাহারা সংসারে থাকিয়াও ধীরে ধীরে সংযত হইতে এবং সকল বিষয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষালাভ করে তদ্বিষয়ে তিনি যে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন একথা নিশ্চয় বলা যায়। ক্রীড়া, কৌতুক, হাস্য, পরিহাসের ভিতর দিয়া তিনি আমাদিগকে নিরন্তর ঐ সকল বিষয় যে ভাবে শিক্ষা দিতেন তাহা হইতে আমরা পূর্ব্বোক্ত কথা অনুমান করিতে পারি।

আত্মীয়বর্গ ও বাল্যবন্ধুরগণের সহিত ঠাকুরের এই কালের আচরণ।

আবার এই ক্ষুদ্র পল্লীর ক্ষুদ্র সংসারে থাকিয়াও কেহ কেহ ধর্ম্মজীবনে অশাতীত অগ্রসর হইয়াছে দেখিয়া তিনি ঈশ্বরের অচিন্ত্য মহিমা-ধ্যানে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ঐ বিষয়ক একটী ঘটনার তিনি বহুবার আমাদিগের নিকট উল্লেখ করিতেন—

উহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা।

ঠাকুর বলিতেন, এই সময়ে একদিন তিনি আহারান্তে নিজ গৃহে বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রতিবেশিনী কয়েকটী রমণী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং নিকটে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় নানা প্রশ্নালাপে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সময় সহসা ঠাকুরের ভাবাবেশ হয় এবং তাঁহার অনুভূতি হইতে থাকে তিনি যেন মীনরূপে সচ্চিদানন্দ সাগরে পরমানন্দে ভাসিতেছেন, ডুবিতেছেন, এবং নানা ভাবে সন্তরণে ক্রীড়া করিতেছেন। কথা কহিতে কহিতে ঐরূপে ভাবাবেশে মগ্ন হওয়া ঠাকুরের অনেক সময়েই উপস্থিত হইত। সুতরাং রমণীগণ উহাতে কিছুমাত্র মন না দিয়া উপস্থিত বিষয়ে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে একজন তাঁহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া ঠাকুরের ভাবাবেশ যতক্ষণ না ভঙ্গ হয়, ততক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে বলিলেন। বলিলেন, 'উনি (ঠাকুর) এখন মীন হইয়া সচ্চিদানন্দ সাগরে সন্তরণ দিতেছেন, গোলমাল করিলে উঁহার ঐ আনন্দে ব্যাঘাত হইবে!' রমণীর কথায় অনেকে তখন বিশ্বাস স্থাপন না করিলেও সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে ভাবভঙ্গে ঠাকুরকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—'রমণী সত্যই বলিয়াছে! আশ্চর্য্য, কিরূপে ঐ বিষয় জানিতে পারিল!"

কামরপুকুর পল্লীস্থ নরনারীর দৈনন্দিন জীবন ঠাকুরের নিকটে

এখন যে অনেকাংশে নবীন বলিয়া বোধ হইয়াছিল একথা বুঝিতে পারা যায়। বিদেশ হইতে বহুকাল পরে প্রত্যাগত ব্যক্তির, স্বদেশের প্রত্যেক ব্যক্তি ও বিষয়কে যেমন নূতন বলিয়া বোধ হয় ঠাকুরের এখন অনেকটা তদ্রূপ হইয়াছিল। কারণ, কেবল আট বৎসরকাল মাত্র জন্মভূমি হইতে দূরে থাকিলেও ঐ কালের মধ্যে ঠাকুরের অন্তরে সাধনার প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া উহাতে আমূল পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়াছিল। ঐ আট বৎসরকালের ভিতর তিনি আপনাকে ভুলিয়াছিলেন, জগৎ ভুলিয়াছিলেন এবং দূরাৎ সুদূরে দেশকালের সীমার বহির্ভাগে যাইয়া উহার ভিতর পুনরাগমনকালে সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া আগমনপূর্ব্বক সকল ব্যক্তি ও বিষয়কে অপূর্ব্ব নবীন ভাবে দেখিতে পাইতেছিলেন! চিন্তা-শ্রেণীসমূহের পারম্পর্য্য হইতেই আমাদিগের কালের অনুভূতি এবং উহার দৈর্ঘ্য স্বল্পতাদি পরিমাণের উপলব্ধি হইয়া থাকে, একথা দর্শনপ্রসিদ্ধ। ঐ জন্য স্বল্পকালের মধ্যে প্রভূত চিন্তা-রাশি অন্তরে উদয় ও লয় হইলে ঐ কাল আমাদিগের নিকট সুদীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হয়। পূর্ব্বোক্ত আট বৎসরে ঠাকুরের অন্তরে কি বিপুল চিন্তারাশি প্রকটিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ঐ কালকে সুতরাং তাঁহার যে এক যুগতুল্য বলিয়া অনুভব হইবে, ইহাতে বিচিত্রতা কি?

কামারপুকুরবাসীদিগকে ঠাকুরের অপূর্ব্ব নূতন ভাবে দেখিবার কারণ।

কামারপুকুরে স্ত্রী-পুরুষ সকলকে ঠাকুর কি অদ্ভুত প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। গ্রামের জমীদার, লাহা বাবুদের বাটী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ, কামার, সূত্রধর, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি সকল জাতীয় প্রতিবেশি-

গণের পরিবারভুক্ত স্ত্রী-পুরুষদিগের সকলেই তাঁহার সহিত শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রেমসম্বন্ধে নিয়ন্ত্রিত ছিল। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস লাহার সরলহৃদয়া ভক্তিমতী বিধবা ভগ্নী প্রসন্ন ও ঠাকুরের বাল্যসখা তৎপুত্র গয়াবিষ্ণু লাহা, সরল বিশ্বাসী শ্রীনিবাস শাঁখারী, পাইনদের বাটীর ভক্তিপরায়ণা রমণীগণ, ঠাকুরের ভিক্ষামাতা কামারকন্যা ধনী প্রভৃতি অনেকের ভক্তিভালবাসার কথা ঠাকুর বিশেষ প্রীতির সহিত অনেক সময়ে আমাদিগকে বলিতেন, এবং আমরাও শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম। ইঁহারা সকলে প্রায় সর্ব্বক্ষণ তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিতেন। বিষয় বা গৃহকর্ম্মের অনুরোধে যাঁহারা ঐরূপ করিতে পারিতেন না, তাঁহারা সকাল, সন্ধ্যা বা মধ্যাহ্নে অবসর পাইলেই আসিয়া উপস্থিত হইতেন। ঐরূপে আসিবার কালে রমণীগণ আবার তাঁহাকে ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত হইবার জন্য নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইতেন। গ্রামবাসীদিগের ঐ সকল মধুর আচরণ, এবং গৃহে পরিজনমধ্যে থাকিয়াও ঠাকুর নিরন্তর কিরূপ দিব্য ভাবাবেশে থাকিতেন,সে সকল কথার আভাস আমরা অন্যত্র পাঠককে দিয়াছি, * সেজন্য পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

জন্মভূমির সহিত ঠাকুরের চিরপ্রেমসম্বন্ধ।

কামারপুকুরে আসিয়া ঠাকুর এইবার অন্য একটী সুমহৎ কর্ত্তব্য পালনেও যত্নপরায়ণ হইয়াছিলেন। কারণ, নিজ পত্নীর কামারপুকুরে আসা না আসা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও যখন তিনি তাঁহার সেবা করিতে সত্য সত্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঠাকুর তখন তাঁহাকে শিক্ষা দীক্ষাদি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার কল্যাণসাধনে

ঠাকুরের নিজ পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনের আরম্ভ।

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—১ম অধ্যায়, ১২—১৬ পৃঃ।

তৎপর হইয়াছিলেন। ঠাকুরকে বিবাহিত জানিয়া তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের গুরু শ্রীমদাচার্য্য তোতাপুরী তাঁহাকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, “তাহাতে আসে যায় কি ? স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান, সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ন থাকে সে ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ; স্ত্রী ও পুরুষের উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়াছে ; স্ত্রীপুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে এখনও বহুদূরে রহিয়াছে।” শ্রীমৎ তোতার পূর্ব্বোক্ত কথা ঠাকুরের স্মরণপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে বহুকালব্যাপী সাধনলব্ধ নিজ বিজ্ঞানের পরীক্ষায় এবং নিজ পত্নীর যথার্থ কল্যাণসাধনে নিযুক্ত করিয়াছিল।

ঐ বিষয়ে ঠাকুর কতদূর স্থসিদ্ধ হইয়া ছিলেন।

কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলে ঠাকুর কখনও কোনও কার্য্য উপেক্ষা করিতে বা অর্দ্ধসম্পন্ন করিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন না। বর্ত্তমান বিষয়েও তদ্রূপ হইয়াছিল। ঐহিক পারত্রিক সকল সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মুখাপেক্ষী বালিকা পত্নীকে শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়া তিনি ঐ বিষয় অর্দ্ধনিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। গৃহকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যাহাতে তিনি লোক-চরিত্রজ্ঞা হন, টাকার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, এবং সর্ব্বোপরি ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, এবং যেখানে যেমন সেখানে তেমন ব্যবহার করিতে নিপুণা হইয়া উঠেন * তদ্বিষয়ে এখন হইতে

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—২য় অধ্যায়, ৯১ পৃঃ এবং ৪র্থ অধ্যায় ১৪০-১৪২ পৃঃ দেখ।

তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। অখণ্ডব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন নিজ আদর্শ জীবন সম্মুখে রাখিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে শিক্ষা-প্রদানের ফল কতদূর কিরূপ হইয়াছিল তাহা আমরা অন্যত্র অনেক স্থলে আভাস প্রদান করিয়াছি। অতএব এখানে সংক্ষেপে ইহাই বলিলে চলিবে যে, শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী, ঠাকুরের কামগন্ধরহিত বিশুদ্ধ প্রেমলাভে সর্ব্বতোভাবে পরিতৃপ্তা হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতাজ্ঞানে আজীবন পূজা করিতে এবং তাঁহার শ্রীপদানুসারিণী হইয়া নিজ জীবন গড়িয়া তুলিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।

পত্নীর প্রতি ঠাকুরের ঐরূপ আচরণ দর্শনে ব্রাহ্মণীর আশঙ্কা ও ভাবান্তর।

ঐরূপে পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যপালনে অগ্রসর হইলে ঠাকুরকে ভৈরবী ব্রাহ্মণী এখন অনেক সময় বুঝিতে পারেন নাই। আমরা দেখিয়াছি, শ্রীমৎ তোতার সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুরের সন্ন্যাস-গ্রহণ কালেও তিনি, তাঁহাকে ঐরূপ সঙ্কল্প হইতে বিরত করিবার চেষ্টা কয়িয়াছিলেন। * কারণ, তিনি ভাবিয়াছিলেন ঐরূপ করিলে ঠাকুরের হৃদয় হইতে ঈশ্বরপ্রেমের এককালে উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। বর্ত্তমানকালে ঐরূপ কোন আশঙ্কাই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। বোধ হয় তিনি ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর নিজ পত্নীর সহিত ঐরূপ ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইলে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হইবে। ঠাকুর কিন্তু পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারেও ব্রাহ্মণীর উপদেশ রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণী যে উহাতে নিতান্ত ক্ষুণ্ণা হইলেন একথা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু শুধু তাহাই নহে, ঐ ঘটনায় তাঁহার অভি-

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—২য় অধ্যায়, ৪৮ পৃঃ।

মান প্রতিহত হইয়া ক্রমে অহঙ্কারে পরিণত হয় এবং কিছুকালের জন্য উহা তাঁহাকে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীনা করে। হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, সময়ে সময়ে তিনি উহার প্রকাশ্যে পরিচয়ও প্রদান করিয়া বসিতেন। যথা—আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোন প্রশ্ন তাঁহার সমীপে উত্থাপন করিয়া যদি কেহ বলিত শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মতামত গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী ক্রুদ্ধা হইয়া বলিয়া বসিতেন, 'সে আবার বলিবে কি? তাহার চক্ষুদান ত আমিই করিয়াছি!' অথবা সামান্য কারণে এবং সময়ে সময়ে বিনা কারণেও বাটীর স্ত্রীলোক-দিগের উপরে অসন্তুষ্ট হইয়া তিরস্কার করিয়া বসিতেন। ঠাকুর কিন্তু তাঁহার ঐরূপ কথা বা অন্যায় অত্যাচারে অবিচলিত থাকিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে বিরত হয়েন নাই।

ঠাকুরের নির্দ্দেশে শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীও ব্রাহ্মণীকে নিজ শ্বশ্রূতুল্য জানিয়া ভক্তিপ্রীতির সহিত সর্ব্বদা তাঁহার সেবাদিতে নিযুক্ত থাকিতেন এবং আপনাকে অজ্ঞ বালিকা জানিয়া তাঁহার কোন কথা বা কার্য্যের কখনও প্রতিবাদ করিতেন না।

অভিমান, অহঙ্কারের বৃদ্ধিতে ব্রাহ্মণীর বুদ্ধি নাশ।

অভিমান, অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইলে বুদ্ধিমান মনুষ্যেরও মতিভ্রম উপস্থিত হয়। অতএব ঐরূপ অহঙ্কার পদে পদে প্রতিহত হইতে বিলম্ব হয় না। আবার ঐরূপে প্রতিহত হওয়াতে মানব উহার বিপরীত ফল চিন্তা করিয়া উহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আপন কল্যাণ-সাধনের অবসর লাভ করে। বিদুষী সাধিকা ব্রাহ্মণীরও এখন ঐরূপ হইয়াছিল। কারণ ঐরূপ অহঙ্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি, 'যেখানে যেমন, সেখানে তেমন' ব্যবহার করিতে না পারিয়া এই সময়ে একদিন

বিষম অনর্থ উপস্থিত করিলেন। ঘটনাটী এইরূপে উপস্থিত হইল—

শ্রীনিবাস শাঁখারীর কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। উচ্চ জাতিতে জন্ম পরিগ্রহ না করিলেও শ্রীনিবাস ভগবদ্ভক্তিতে অনেক ব্রাহ্মণের অপেক্ষাও বড় ছিলেন। শ্রীশ্রীরঘুবীরের প্রসাদ পাইবার জন্য ইনি একদিন এই সময়ে ঠাকুরের সমীপে আগমন করেন। ভক্ত শ্রীনিবাসকে লইয়া ঠাকুর এবং তাঁহার পরিবারবর্গের সকলে যে সেদিন আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা বলিতে হইবে না। ভক্তিমতী ব্রাহ্মণীও শ্রীনিবাসের বিশ্বাস ভক্তি দর্শনে পরিতুষ্টা হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত নানা ভক্তিপ্রসঙ্গে অতিবাহিত হইল এবং শ্রীশ্রীরঘুবীরের ভোগরাগাদি সম্পূর্ণ হইলে শ্রীনিবাস প্রসাদ পাইতে বসিলেন। ভোজনান্তে প্রচলিত প্রথামত তিনি আপন উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন 'আমরাই উহা করিব এখন।' ব্রাহ্মণী বারম্বার ঐরূপ বলায় শ্রীনিবাস অগত্যা নিরস্ত হইয়া নিজ বাটীতে গমন করিলেন।

ঐ বিষয়ক ঘটনা।

সমাজ-প্রবল পল্লীগ্রামে সামান্য সামাজিক নিয়মভঙ্গ লইয়া অনেক সময় বিষম গণ্ডগোল এবং দলাদলির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এখনও ঐরূপ হইবার উপক্রম হইল। কারণ, ব্রাহ্মণকন্যা ভৈরবী শ্রীনিবাসের উচ্ছিষ্ট মোচন করিবেন, এই বিষয় লইয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে সমাগতা পল্লীবাসিনী ব্রাহ্মণকন্যাগণ বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহাদের ঐরূপ আপত্তি স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। ক্রমে গণ্ডগোল বাড়িয়া

ব্রাহ্মণীর সহিত হৃদয়ের কলহ।

উঠিল এবং ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় ঐ কথা শুনিতে পাইলেন। সামান্য বিষয় লইয়া বিষম গোল বাঁধিবার সম্ভাবনা দেখিয়া, হৃদয় ব্রাহ্মণীকে ঐ কার্য্য হইতে বলিলেও তিনি তাঁহার কথা গ্রহণ করিলেন না। তখন হৃদয়ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন এবং ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। হৃদয় বলিতে লাগিলেন, 'ঐরূপ করিলে তোমাকে ঘরে থাকিতে স্থান দিব না।' ব্রাহ্মণীও ছাড়িবার পাত্রী নহে, বলিলেন, 'না দিলেই ক্ষতি কি?—শীতলার ঘরে* মনসা † শোবে এখন।' তখন বাটীর অন্য সকলে মধ্যস্থ হইয়া নানা অনুনয়বিনয়ে ব্রাহ্মণীকে ঐকার্য্য হইতে নিরস্ত করিয়া বিবাদ শান্তি করিলেন।

ব্রাহ্মণীর নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অপরাধের আশঙ্কা, অনুতাপ ও ক্ষমা চাহিয়া কাশী গমন।

অভিমানিনী ব্রাহ্মণী ঐরূপে নিরস্ত হইলেও কিন্তু সেদিন অন্তরে বিষম আঘাৎ পাইয়াছিলেন। ক্রোধের উপশম হইলে তিনি শান্তভাবে চিন্তা করিয়া আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, এখানে যখন ঐরূপ মতিভ্রম উপস্থিত হইতেছে তখন অতঃপর এখানে তাঁহার আর অবস্থান করা শ্রেয়ঃ নহে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন সাধকের দৃষ্টি কোনরূপে নিজান্তরে পতিত হইলে চিত্তের কোন মলিনভাবই তখন তাঁহার নিকট আত্মগোপন করিতে পারে না—ব্রাহ্মণীরও এখন তদ্রূপ হইয়াছিল। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভাবপরিবর্ত্তনের আলোচনা করিয়া তিনি উহারও মূলে আত্মদোষ দেখিতে পাইলেন এবং মনে মনে সাতিশয় অনুতপ্তা হইলেন। অনন্তর কয়েকদিন গত হইলে একদিন ভক্তিসহকারে বিবিধ পুষ্পমাল্য স্বহস্তে রচনা ও চন্দন-

* দেবমন্দিরে।

† ব্রাহ্মণী ঐরূপে ক্রুদ্ধ সর্পের সহিত আপনাকে সমতুল্য করেন।

চর্চ্চিত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গজ্ঞানে ঠাকুরকে মনোহর বেশে ভূষিত করিলেন এবং সর্ব্বান্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরে সংযত হইয়া মনপ্রাণ ঈশ্বরে অর্পণপূর্ব্বক কামারপুকুর পশ্চাতে রাখিয়া কাশীধামের পথ অবলম্বন করিলেন। ঐরূপে, প্রায় ছয় বৎসর কাল নিরন্তর ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া ব্রাহ্মণী ঠাকুরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

ঠাকুরের কলিকাতায় প্রত্যাগমন।

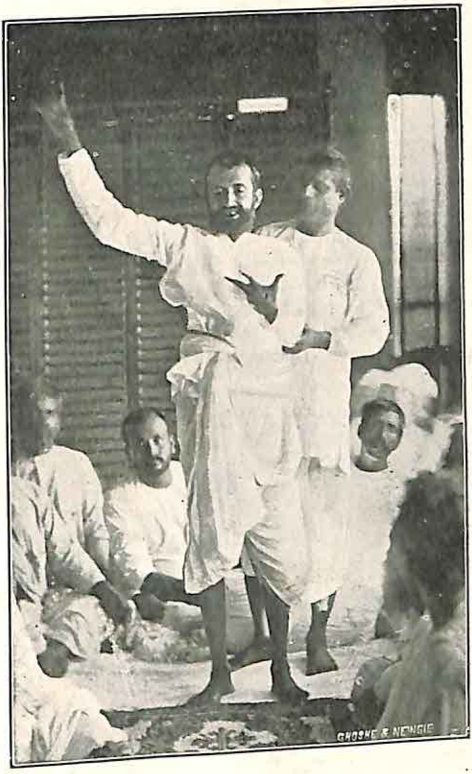
প্রায় সাতমাসকাল ঐরূপে নানাভাবে কামারপুকুরে অতিবাহিত করিয়া সম্ভবতঃ সন ১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুর পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার শরীর তখন প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হইয়াছিল। এখানে ফিরিবার স্বল্পকাল পরে তাঁহার জীবনে একটী বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। উহারই কথা আমরা এখন পাঠককে বলিব।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

তীর্থদর্শন ও হৃদয়মোহনের কথা।

ঠাকুরের তীর্থযাত্রা স্থির হওয়া।

শ্রীযুত মথুরামোহন এখন সপরিবারে ভারতের পুণ্যতীর্থসকল দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়া প্রস্তুত হইতেছিলেন। যাত্রার দিন আগামী মাঘে দেখা হইতেছিল এবং মথুরামোহনের গুরুপুত্রাদি অনেক ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল। সস্ত্রীক মথুরামোহন ঠাকুরকে সঙ্গে লইবার জন্য বিশেষরূপে অনু-



শ্রীরামকৃষ্ণ ও হৃদয়।

রোধ করিতে লাগিলেন। ফলে, বৃদ্ধা জননী * এবং ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া, ঠাকুর যাইতে সম্মত হইলেন।

অনন্তর শুভদিনের উদয় হইলে, শ্রীযুত মথুর, ঠাকুর ও অন্যান্য সকলকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। তখন সন ১২৭৪ সালের মাঘ মাসের মধ্যভাগ হইবে, ইংরাজী ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তারিখ। ঠাকুরের তীর্থযাত্রা-সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি। † সেজন্য শ্রীযুত হৃদয়ের নিকট আমরা ঐ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, কেবলমাত্র তাহারই এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

ঐ যাত্রার সময়-নিরূপণ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার জননী, শ্রীযুত মথুরামোহন, তাঁহার পত্নী, পুত্রবধূ, এবং গুরুপুত্র, হৃদয়, পাচক ব্রাহ্মণ, দ্বারবান্, এবং দাসদাসী প্রভৃতিতে সর্ব্বসমেত একশত পঁচিশ জন আন্দাজ ঐকালে তীর্থদর্শনে যাত্রা করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি এবং তৃতীয় শ্রেণীর তিনখানি গাড়ী রেলওয়ে কোম্পানির নিকট হইতে রিজার্ভ (reserve) করিয়া লওয়া হয় এবং বন্দোবস্ত থাকে, শ্রীযুত মথুরের ইচ্ছা হইলে, কলিকাতা হইতে কাশীর মধ্যে যে কোন স্থানে ঐ চারিখানি গাড়ি তাহারা কাটিয়া দিবে।

ঐ যাত্রার বন্দোবস্ত।

মথুরপ্রমুখ সকলে দেবঘরে ৺বৈদ্যনাথজীকে দর্শনপূর্ব্বক

---

* কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের জননী তাঁহার সহিত তীর্থে গমন করেন নাই। হৃদয় কিন্তু আমাদিগকে তদ্রূপ বলিয়াছিলেন।

† গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ— ৩য় অধ্যায় দেখ।

কয়েক দিন অবস্থান করেন। এখানে একটী বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। এই স্থানের এক দরিদ্র পল্লীর স্ত্রীপুরুষদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় করুণাপূর্ণ হইয়াছিল এবং মথুর বাবুকে বলিয়া তিনি তাহাদিগকে এক দিবস ভোজন এবং প্রত্যেককে এক এক খানি বস্ত্র দান করাইয়াছিলেন। *

৺বৈদ্যনাথ দর্শন ও দরিদ্র-সেবা।

বৈদ্যনাথ হইতে শ্রীযুত মথুর একেবারে ৺কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। কেবল, কাশীর সন্নিকট কোন স্থানে গাড়ী হইতে নামিয়া কার্য্যান্তরে বিলম্ব হওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও হৃদয় উঠিতে না উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দেয়। শ্রীযুত মথুর উহাতে ব্যস্ত হইয়া কাশী হইতে এই মর্ম্মে তার করিয়া পাঠান যে, পরবর্ত্তী গাড়ীতে যেন তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী গাড়ীর জন্য তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয় নাই। কোম্পানির জনৈক বিশিষ্ট কর্ম্মচারী, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কোন কার্য্যের তত্ত্বাবধানে একখানি স্বতন্ত্র (special) গাড়ীতে করিয়া স্বল্পক্ষণ পরেই ঐ স্থানে উপস্থিত হন এবং তাঁহাদিগকে ঐরূপে বিপন্ন দেখিয়া, নিজ গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া কাশীধামে নামাইয়া দেন। রাজেন্দ্র বাবু কলিকাতায় বাগবাজার পল্লীতে বাস করিতেন।

পথে বিঘ্ন।

কাশীধামে পৌঁছিয়া শ্রীযুত মথুর কেদারঘাটের উপরে পাশাপাশি দুইখানি বাটী ভাড়া লইয়াছিলেন। তিনি এখানে সকল

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৭ম অধ্যায়, ২২৬ পৃষ্ঠা দেখ।

বিষয়ে রাজা রাজড়ার ন্যায় আচরণ করিতেন।* বাটীর বাহিরে কোন স্থানে গমন করিবার কালে তাঁহার সঙ্গে রূপার ছত্র এবং অগ্র পশ্চাৎ দ্বারবানগণ রূপার আসাসোঁটা প্রভৃতি লইয়া যাইত।

কেদারঘাটে অবস্থান ও ৺বিশ্বনাথ দর্শন।

এখানে থাকিবার কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পাল্কীতে চাপিয়া প্রায় প্রত্যহই ৺বিশ্বনাথ জীউর দর্শনে যাইতেন। হৃদয় তাঁহার সঙ্গে যাইত। যাইতে যাইতেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন, দেবদর্শনকালের ত কথাই নাই! ঐরূপে সকল দেবস্থানে তাঁহার ভাবাবেশ হইলেও ৺কেদারনাথের মন্দিরে তাঁহার বিশেষ ভাবাবেশ হইত।

ঠাকুর ও শ্রীত্রৈলঙ্গস্বামি।

দেবস্থান ভিন্ন ঠাকুর কাশীর বিশিষ্ট সাধুদিগকেও দর্শন করিতে যাইতেন। তখনও হৃদয় সঙ্গে থাকিত। ঐরূপে কয়েকদিন প্রথিতনামা পরমহংসাগ্রণী শ্রীযুক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামিজীকে দেখিতে যান। স্বামিজী তখন মৌনাবলম্বনে মণিকর্ণিকার ঘাটে থাকিতেন। প্রথম দর্শনের দিন স্বামিজী আপন নস্যদানি ঠাকুরের সম্মুখে ব্যবহারের জন্য ধারণ করিয়া ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, এবং ঠাকুর তাঁহার ইন্দ্রিয় ও অবয়ব সকলের গঠনাদি পরীক্ষা করিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, ইঁহাতে যথার্থ পরমহংসের লক্ষণসকল বর্ত্তমান, ইনি সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর।' স্বামিজী তখন মণিকর্ণিকার পার্শ্বে একটি ঘাট বাঁধাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন! ঠাকুরের অনুরোধে হৃদয়, কয়েক কোদাল মৃত্তিকা ঐ স্থানে নিক্ষেপ করিয়া ঐ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন। তৎপরে ঠাকুর একদিন স্বামিজীকে মথুরের আবাসে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং স্বহস্তে তাঁহাকে পায়সান্ন খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন।

---

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৩য় অধ্যায়, ১১৮ পৃষ্ঠা।

৺প্রয়াগধামে ঠাকুরের আচরণ।

পাঁচ সাতদিন কাশীতে থাকিয়া ঠাকুর মথুরের সহিত প্রয়াগে গমন করেন এবং পুণ্যসঙ্গমে স্নান করিয়া তথায় ত্রিরাত্রি বাস করেন। মথুরপ্রমুখ সকলে তথায় শাস্ত্রীয় ব্যবহারানুসারে মস্তক মুণ্ডিত করিলেও ঠাকুর উহা করেন নাই। বলিয়াছিলেন, 'আমার করিবার আবশ্যক নাই।' প্রয়াগ হইতে মথুরপ্রমুখ সকলে পুনরায় ৺কাশীতে ফিরিয়াছিলেন এবং এক পক্ষ কাল তথায় বাস করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে নিধুবনাদি স্থান দর্শন।

শ্রীবৃন্দাবনে মথুর নিধুবনের নিকটে একটী বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। কাশীর ন্যায় এখানেও তিনি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া অবস্থান করিতেন এবং পত্নীসমভিব্যাহারে দেবস্থানসকল দর্শন করিতে যাইয়া প্রত্যেক স্থলে কয়েক খণ্ড গিনি প্রণামীস্বরূপে প্রদান করিতেন। নিধুবন দর্শন ভিন্ন ঠাকুর এখানে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড এবং গিরিগোবর্দ্ধন দর্শন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থলে তিনি ভাবাবেশে গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। এখানেও ঠাকুর বিশিষ্ট সাধক সাধিকাগণের নাম শ্রবণ করিলেই দর্শন করিতে যাইতেন। ঐরূপে নিধুবনে গঙ্গামাতার দর্শনলাভে তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন এবং হৃদয়কে তাঁহার অঙ্গের লক্ষণসকল দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'ইঁহার বিশেষ উচ্চাবস্থা লাভ হইয়াছে।'

৺কাশীতে প্রত্যাগমন ও স্থিতি।

এক পক্ষ কাল আন্দাজ শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া মথুরপ্রমুখ সকলে পুনরায় কাশীধামে আগমন করেন এবং ৺বিশ্বনাথের বিশেষ বেশ দর্শনের জন্য ১২৭৫ সালের বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত অবস্থান করেন।

ঐ সময়ে ঠাকুর এখানে সুবর্ণময়ী অন্নপূর্ণা প্রতিমা দর্শন করিয়াছিলেন।

কাশীতে ব্রাহ্মণীকে দর্শন। ব্রাহ্মণীর শেষ কথা।

হৃদয় বলেন, কাশীধামে ঠাকুরের যোগেশ্বরী নাম্নী ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহিত পুনরায় দেখা হইয়াছিল, এবং চৌষট্টী যোগিনী নামক পল্লীতে তাঁহার বাসা বাটীতে তিনি কয়েকবার গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী ঐস্থলে মোক্ষদা নাম্নী একটী রমণীর সহিত বাস করিতেছিলেন। ঐ রমণীর ভক্তি বিশ্বাস দর্শনে ঠাকুর পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন যাইবার কালে ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সঙ্গে তথায় গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণীকে ঠাকুর এখানেই অবস্থান করিতে বলেন। ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিবার স্বল্পকাল পরে ব্রাহ্মণী তথায় দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

বীণকার মহেশকে দেখিতে যাওয়া।

শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে ঠাকুরের বীণা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে তথায় কোনও বীণ্‌কার উপস্থিত না থাকায় উহা সফল হয় নাই। কাশীতে ফিরিয়া তাঁহার মনে পুনরায় ঐ ইচ্ছা উদয় হয় এবং শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সরকার নামক একজন অভিজ্ঞ বীণ্‌কারের ভবনে হৃদয়ের সহিত স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহাকে বীণা শুনাইবার জন্য অনুরোধ করেন। মহেশ বাবু কাশীস্থ মদনপুরা নামক পল্লীতে অবস্থান করিতেন! ঠাকুরের অনুরোধে তিনি সেদিন পরম আহ্লাদে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বীণা বাজাইয়াছিলেন। বীণার মধুর ঝঙ্কার শুনিবামাত্র ঠাকুর ঐদিন ভাবাবিষ্ট হয়েন, পরে অর্দ্ধবাহ্যদশা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকটে এইরূপে প্রার্থনা করিতে শুনা গিয়াছিল—'মা, আমায় হুঁস দাও, আমি ভাল করিয়া বীণা শুনিব!'

উহার পরেই তিনি বাহ্যভাবভূমিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হন, এবং সানন্দে বীণা শুনিতে এবং সময়ে সময়ে উহার স্থুরের সহিত নিজ স্বর মিলাইয়া গীত গাহিতে থাকেন। অপরাহ্ণ পাঁচটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত ঐরূপে আনন্দে অতিবাহিত হইলে মহেশ বাবুর অনুরোধে তিনি ঐস্থানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া মথুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন! মহেশ বাবু তদবধি ঠাকুরকে প্রত্যহ দর্শন করিতে আগমন করিতেন। ঠাকুর বলিতেন—বীণা বাজাইতে বাজাইতে ইনি এককালে মত্ত হইয়া উঠিতেন।

কাশী হইতে শ্রীযুত মথুর গয়াধামে যাইবার বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু ঠাকুরের ঐ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি* থাকায় তিনি ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। হৃদয় বলিতেন, ঐরূপে প্রায় চারি মাস কাল তীর্থে ভ্রমণ করিয়া সন ১২৭৫ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে ঠাকুর পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ঠাকুর রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের মাটী ও রজ আনয়ন করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া হৃদয়ের সাহায্যে তিনি উহার কিয়দংশ পঞ্চবটীর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিলেন এবং কিয়দংশ নিজ সাধনকুটীরমধ্যে স্বহস্তে প্রোথিত করিয়া বলিলেন, "আজ হইতে এই স্থল শ্রীবৃন্দাবন তুল্য দেবভূমি হইল।" হৃদয় বলিত, উহার অনতিকাল পরে তিনি মথুর বাবুকে বলিয়া নানাস্থানের বৈষ্ণব গোস্বামী ও ভক্তসকলকে নিমন্ত্রণ করাইয়া আনিয়া পঞ্চবটীতে একটী মহোৎসব করিয়াছিলেন। মথুরবাবু

দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন ও আচরণ।

---

* গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৩য় অধ্যায়, ১২৮—১৩৬ পৃষ্ঠা।

ঐ কালে গোস্বামীদিগকে ১৬৲ টাকা এবং বৈষ্ণব ভক্তদিগকে ১৲ টাকা করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন।

হৃদয়ের স্ত্রীর মৃত্যু ও বৈরাগ্য।

তীর্থ হইতে ফিরিবার অল্পকাল পরে শ্রীযুত হৃদয়ের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ঐ ঘটনায় তাহার মন, সংসারের প্রতি কিছুকালের জন্য বিরাগসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি হৃদয়রাম ভাবুক ছিল না। নিজ ক্ষুদ্র সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া যথাসম্ভব ভোগ-সুখে কালযাপন করাই তাহার জীবনের আদর্শ ছিল। ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গগুণে তাহার মনে কখন কখন অন্যভাবের উদয় হইলেও উহা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারিত না। ভোগ-বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার কোনরূপ সুযোগ উপস্থিত হইলেই হৃদয় সকল ভুলিয়া উহার পশ্চাৎ ধাবিত হইত এবং যতকাল উহা সংসিদ্ধ না হইত ততকাল তাহার মনে অন্য চিন্তা প্রবেশলাভ করিত না। সেজন্য ঠাকুরের সমগ্র সাধন হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে অনুষ্ঠিত হইলেও সে তাহার স্বল্পই দেখিবার ও বুঝিবার অবসর পাইয়াছিল। ঐরূপ হইলেও কিন্তু হৃদয় তাহার মাতুলকে যথার্থ ভালবাসিত এবং তাঁহার যখন যেরূপ সেবার আবশ্যক হইত তাহা সম্পাদন করিতে যত্নের ত্রুটি করিত না। উহার ফলে হৃদয়ের সাহস, বুদ্ধি এবং কার্য্যকুশলতা বিশেষ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। পরে বিশিষ্ট সাধককুল আসিয়া তাহার মাতুলের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে যত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং সাধনার ফলে তাঁহাতে দৈবশক্তি সকলের প্রকাশ সে যত অবলোকন করিতে লাগিল, মাতুলকে অবলম্বন করিয়া তাহার মনে ততই একটা বিশেষ বলের উদয় হইতে থাকিল। সে ভাবিতে লাগিল মাতুল যখন তাহার আপনার হইতেও আপনার এবং সেবা

দ্বারা যখন সে তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্র হইয়াছে তখন আধ্যাত্মিক রাজ্যের ফলসকল তাহার এক প্রকার করায়ত্তই রহিয়াছে। যখনি তাহার মন ঐ সকল ফল লাভ করিতে প্রয়াসী হইবে মাতুল নিজ দৈবশক্তিপ্রভাবে তাহাকে তখনি ঐ সকল লাভ করাইয়া দিবেন। অতএব পরকাল সম্বন্ধে তাহার ভাবিবার আবশ্যকতা নাই। অগ্রে কিছুকাল সংসারসুখ ভোগ করিয়া পরে সে উহাতে মনোনিবেশ করিবে। পত্নীবিয়োগবিধুর হৃদয় ভাবিল, এখন সেইকাল উপস্থিত হইয়াছে। সে পূর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠার সহিত শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় মনোনিবেশ করিল, পরিধানের কাপড় ও পৈতা খুলিয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে ধ্যান করিতে লাগিল এবং ঠাকুরকে ধরিয়া বসিল, তাহার যাহাতে তাঁহার ন্যায় আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল উপস্থিত হয়, তাহা করিয়া দিতে হইবে। ঠাকুর তাহাকে যত বুঝাইলেন যে, তাহার ঐরূপ করিবার আবশ্যকতা নাই, তাঁহার সেবা করিলেই তাহার সকল ফল লাভ হইবে, এবং হৃদয় ও তিনি উভয়েই যদি দিবারাত্র ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া আহার-নিদ্রাদি শারীরিক চেষ্টা সকল ভুলিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে কে কাহাকে দেখিবে, ইত্যাদি—সে তাহাতে কর্ণপাত করিল না। ঠাকুর অগত্যা বলিলেন, "মার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক, আমার ইচ্ছায় কি কিছু হয় রে!—মা-ই আমার বুদ্ধি পাল্টাইয়া দিয়া আমাকে এইরূপ অবস্থায় আনিয়া অদ্ভুত অদ্ভুত উপলব্ধি সকল করাইয়া দিয়াছেন—মার ইচ্ছা হয় যদি তোরও হইবে।"

হৃদয়ের ভাবাবেশ।

ঐরূপ কথাবার্ত্তার কয়েক দিন পরে পূজা ও ধ্যানকালে হৃদয়ের অল্পস্বল্প অদ্ভুত দর্শন এবং অর্দ্ধবাহ্য-ভাব হইতে আরম্ভ হইল! মথুর বাবু হৃদয়কে একদিন ঐরূপ ভাবাবিষ্ট দেখিয়া ঠাকুরকে বলিলেন,—'হৃদুর

আবার এ কি অবস্থা হইল, বাবা?' ঠাকুর তাহাতে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'হৃদয় ঢং করিয়া ঐরূপ করিতেছে না,—একটু আধটু দর্শন হ'ক্ ব'লে সে মাকে অনেক ক'রে ধ'রেছিল তাই ঐরূপ হইতেছে। ঐরূপ দেখাইয়া বুঝাইয়া মা আবার তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিবেন।' মথুর বলিলেন, 'বাবা, এসব তোমারই খেলা, তুমিই হৃদয়কে ঐরূপ অবস্থা করিয়া দিয়াছ, তুমিই এখন তাহার মন ঠাণ্ডা করিয়া দাও—আমরা উভয়ে নন্দীভৃঙ্গীর মত তোমার কাছে থাকিব, সেবা করিব, আমাদের ঐ সব অবস্থা কেন?'

শ্রীযুত মথুরের সহিত ঠাকুরের ঐরূপ কথাবার্ত্তার কয়েক দিন পরে একদিন রাত্রে ঠাকুরকে পঞ্চবটী অভিমুখে যাইতে দেখিয়া, তাঁহার প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া, হৃদয় গাড়ু ও গামছা লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে হৃদয়ের এক অপূর্ব্ব দর্শন উপস্থিত হইল। সে দেখিতে লাগিল, ঠাকুর স্থূল রক্ত-মাংসের দেহধারী মনুষ্য নহেন, তাঁহার দেহনিঃসৃত অপূর্ব্ব জ্যোতিতে পঞ্চবটী আলোকিত হইয়া উঠিতেছে, এবং চলিবার কালে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় পদযুগল ভূমি স্পর্শ না করিয়া শূন্যে শূন্যেই তাঁহাকে বহন করিয়া চলিয়াছে। চক্ষুর দোষে ঐরূপ দেখিতেছি ভাবিয়া

হৃদয়ের অদ্ভুত দর্শন।

হৃদয় বারংবার নিজ চক্ষু মার্জ্জন করিল, চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থসকল নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় ঠাকুরের দিকে দেখিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—বৃক্ষ, লতা, গঙ্গা, কুটীর প্রভৃতি পদার্থনিচয়কে পূর্ব্ববৎ দেখিতে পাইলেও, ঠাকুরকে পুনঃ পুনঃ ঐরূপ দেখিতে থাকিল! তখন বিস্মিত হইয়া হৃদয় ভাবিল, আমার ভিতরে কি কোনরূপ

পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে ঐরূপ দেখিতেছি ? ঐরূপ ভাবিয়া সে আপনার শরীরের দিকে চাহিল। দেখিল, সেও দিব্যদেহধারী জ্যোতির্ম্ময় দেবানুচর, সাক্ষাৎ দেবতার সঙ্গে থাকিয়া চিরকাল তাঁহার সেবা করিতেছে—সে যেন ঐ দেবতার জ্যোতিঃঘন অঙ্গসম্ভূত অংশবিশেষ, উঁহার সেবার জন্যই তাহার ভিন্ন শরীর ধারণপূর্ব্বক পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতি! ঐরূপ দেখিয়া এবং নিজ জীবনের ঐরূপ রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার অন্তরে আনন্দের প্রবল বন্যা উপস্থিত হইল। সে আপনাকে ভুলিল, সংসার ভুলিল, পৃথিবীর মানুষ তাহাকে ভাল মন্দ নানা কথা বলিবে তাহা ভুলিল এবং অর্দ্ধবাহ্যভাবাবেশে উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বারংবার বলিতে লাগিল,—'ও রামকৃষ্ণ, ও রামকৃষ্ণ, আমরা ত মানুষ নহি, আমরা এখানে কেন? চল দেশে দেশে যাই, জীবোদ্ধার করি! তুমি যা, আমিও তাই!'

ঠাকুর বলিতেন, "তাহাকে ঐরূপ চীৎকার করিতে শুনিয়া বলিলাম, 'ওরে থাম্, থাম্; আমাদের কি হইয়াছে যে, অমন করিতেছিস্; একটা কি হইয়াছে ভাবিয়া এখনি লোকজন সব ছুটিয়া আসিবে'—কিন্তু সে কি তা শুনে! তখন তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে আসিয়া তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিলাম, 'দে মা শালাকে জড় করে দে।' "

হৃদয়ের মনের জড়ত্ব প্রাপ্তি।

হৃদয় বলিত, ঠাকুর ঐরূপ বলিবামাত্র তাহার পূর্ব্বোক্ত দর্শন ও আনন্দ যেন কোথায় লুপ্ত হইল এবং সে পূর্ব্বে যেমন ছিল আবার তেমনি হইল! অপূর্ব্ব আনন্দ হইতে ঐরূপে সহসা বিচ্যুত হইয়া তাহার মন বিষাদে পূর্ণ হইল এবং সে রোদন করিতে

করিতে ঠাকুরকে বলিতে লাগিল, 'মামা, তুমি কেন অমন কর্‌লে, কেন জড় হতে বল্‌লে, ঐরূপ দর্শনানন্দ আমার আর হবে না।' ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিলেন, "আমি কি তোকে একেবারে জড় হতে বলেছি, তুই এখন স্থির হয়ে থাক্—এই কথা বলেছি। একটু দেখেই তুই যে গোল কর্‌লি, তাতেই ত আমাকে ঐরূপ বল্‌তে হ'ল। আমি যে চব্বিশ ঘণ্টা কত কি দেখি, আমি কি ঐরূপ গোল করি? তোর এখনও ঐরূপ দর্শন কর্‌বার সময় হয় নাই, এখন স্থির হয়ে থাক্, সময় হলে আবার কত কি দেখবি।"

হৃদয়ের সাধনায় বিঘ্ন।

ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথায় হৃদয় নীরব হইলেও নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইল। পরে অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সে ভাবিল, যেরূপেই হউক সে ঐরূপ দর্শন আবার লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। ঐরূপ ভাবিয়া সে ধ্যান-জপের মাত্রা বাড়াইল এবং রাত্রে পঞ্চবটীতলে যাইয়া ঠাকুর যেখানে বসিয়া পূর্ব্বে জপ ধ্যান করিতেন সেই স্থলে বসিয়া ৺জগদম্বাকে ডাকিবে এইরূপ মনস্থ করিল। ঐরূপ ভাবিয়া একদিন সে গভীররাত্রে শয্যাত্যাগ করিয়া পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইল এবং ঠাকুরের আসনে ধ্যান করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের মনে পঞ্চবটীতে আসিবার বাসনা হওয়াতে তিনিও ঐদিকে আসিতে লাগিলেন এবং তথায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে শুনিতে পাইলেন, হৃদয় কাতর চীৎকারে তাঁহাকে ডাকিতেছে, 'মামা গো, পুড়ে মলুম, পুড়ে মলুম!' ত্রস্তপদে অগ্রসর হইয়া ঠাকুর তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রে, কি হইয়াছে?' হৃদয় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিল, 'মামা, এইখানে ধ্যান করিতে বসিবামাত্র কে যেন এক মালসা

আগুন গায়ে ঢালিয়া দিল, অসহ্য দাহযন্ত্রণা হইতেছে!' ঠাকুর তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিলেন, 'যা' ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, তুই কেন এরূপ করিস্ বল দেখি, তোকে বলেছি, আমার সেবা কর্‌লেই তোর সব হবে।' হৃদয় বলিত, ঠাকুরের হস্তস্পর্শে বাস্তবিক তাহার সকল যন্ত্রণা তখনি শান্ত হইল। অতঃপর সে আর পঞ্চবটীতে ঐরূপে ধ্যান করিতে যাইত না এবং তাহার মনে বিশ্বাস হইল ঠাকুর তাহাকে যে কথা বলিয়াছেন তাহার অন্যথা করিলে তাহার ভাল হইবে না।

হৃদয়ের ৺দুর্গোৎসব।

ঠাকুরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া হৃদয় এখন অনেকটা শান্তিলাভ করিলেও ঠাকুরবাটীর দৈনন্দিন কর্ম্মসকল তাহার পূর্ব্বের ন্যায় রুচিকর বোধ হইতে লাগিল না। তাহার মন নূতন কোন কর্ম্ম করিয়া নবোল্লাস লাভ করিবার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সন ১২৭৫ সালের আশ্বিন মাস আগত দেখিয়া সে নিজ বাটীতে শারদীয়া পূজা করিবার মনস্থ করিল। হৃদয়রামের জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় সহোদর গঙ্গানারায়ণের তখন মৃত্যু হইয়াছে, এবং রাঘব, মথুর বাবুর জমীদারীতে খাজনা আদায়ের কর্ম্মে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে। সময় ফিরিয়া বাটীতে নূতন চণ্ডীমণ্ডপখানি নির্ম্মিত হইবার কালে গঙ্গানারায়ণ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, একবার ৺জগদম্বাকে আনিয়া তথায় বসাইবেন, কিন্তু জীবৎকালে সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবার তাঁহার সুযোগ হয় নাই। হৃদয় এখন তাঁহার ঐ ইচ্ছা স্মরণপূর্ব্বক উহা পূর্ণ করিতে যত্নপর হইল। কর্ম্মী হৃদয়ের ঐ কার্য্যে শান্তিলাভের সম্ভাবনা বুঝিয়া ঠাকুর তাহাতে সম্মত হইলেন এবং মথুর বাবু হৃদয়ের ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাহাকে আর্থিক সাহায্য করিলেন। শ্রীযুত

মথুর ঐরূপে অর্থসাহায্য করিলেন বটে কিন্তু পূজাকালে ঠাকুরকে নিজ বাটীতে রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হৃদয় তাহাতে ক্ষুণ্ণমনে পূজা করিবার জন্য একাকী দেশে যাইতে প্রস্তুত হইতে লাগিল। হৃদয় বলিত, তাহাকে ক্ষুণ্ণ দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'তুই দুঃখ করিতেছিস্ কেন? আমি নিত্য সূক্ষ্ম শরীরে তোর পূজা দেখিতে যাইব, আমাকে অপর কেহ দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তুই পাইবি। তুই অপর এক-জন ব্রাহ্মণকে তন্ত্রধার রাখিয়া নিজে আপনার ভাবে পূজা করিস্ এবং একেবারে উপবাস না করিয়া মধ্যাহ্নে দুধ গঙ্গাজল ও মিছরির সরবৎ পান করিস্। ঐরূপে পূজা করিলে ৺জগদম্বা তোর পূজা নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন।' হৃদয় বলিত ঐরূপে ঠাকুর, কাহার দ্বারা প্রতিমা গড়াইতে হইবে, কাহাকে তন্ত্রধার করিতে হইবে, কিভাবে অন্য সকল কার্য্য করিতে হইবে—সকল কথা তন্ন তন্ন করিয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন এবং সেও মহানন্দে পূজা করিতে যাত্রা করিল।

৺দুর্গোৎসবকালে হৃদয়ের ঠাকুরকে দেখা।

বাটীতে আসিয়া হৃদয় ঠাকুরের কথামত সকল কার্য্যের অনু-ষ্ঠান করিল এবং ষষ্ঠীর দিনে ৺দেবীর বোধন, অধিবাসাদি সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বয়ং পূজায় ব্রতী হইল। সপ্তমী-বিহিতা পূজা সাঙ্গ করিয়া রাত্রে নীরা-জন করিবার কালে হৃদয় দেখিতে পাইল, ঠাকুর জ্যোতির্ম্ময় শরীরে প্রতিমার পার্শ্বে ভাবাবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন! হৃদয় বলিত, ঐরূপে প্রতিদিন ঐ সময়ে এবং সন্ধিপূজাকালে সে, দেবীপ্রতিমাপার্শ্বে ঠাকুরের দিব্যদর্শন লাভ করিয়া মহোৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল। পূজা সাঙ্গ হইবার স্বল্পকাল পরে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিল এবং ঐ বিষয়ক সকল

কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিল। ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিয়-ছিলেন, "আরতি ও সন্ধিপূজার সময় তোর পূজা দেখিবার জন্য বাস্তবিকই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া আমার ভাব হইয়া গিয়াছিল এবং অনুভব করিয়াছিলাম যেন জ্যোতির্ম্ময় শরীরে জ্যোতির্ম্ময় পথ দিয়া তোর চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছি।"

৺দুর্গোৎসবের শেষ কথা।

হৃদয় বলিত, ঠাকুর তাহাকে এক সময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, 'তুই তিন বৎসর পূজা করিবি'—ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়াছিল। ঠাকুরের কথা না শুনিয়া চতুর্থবারে পূজার আয়োজন করিতে যাইয়া এমন বিঘ্নপরম্পরা উপস্থিত হইয়াছিল যে, পরিশেষে বাধ্য হইয়া তাহাকে পূজা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। সে যাহা হউক, প্রথম বৎসরের পূজার কিছুকাল পরে হৃদয় পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরের পূজাকার্য্যে এবং ঠাকুরের সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিল।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

স্বজনবিয়োগ।

ঠাকুরের অগ্রজ শ্রীযুক্ত রামকুমারের পুত্র অক্ষয়ের সহিত পাঠককে আমরা ইতিপূর্ব্বে সামান্যভাবে পরিচিত করাইয়াছি।

রামকুমার-পুত্র অক্ষয়ের কথা।

পূজ্যপাদ আচার্য্য তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের স্বল্পকাল পরে সন ১২৭২ সালের প্রথম ভাগে অক্ষয় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বিষ্ণুমন্দিরে পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার

বয়স সতর বৎসর হইবে। তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা এখানে বলা প্রয়োজন।

জন্মগ্রহণ কালে অক্ষয়ের প্রসূতীর মৃত্যু হওয়ায় মাতৃহীন বালক নিজ আত্মীয়বর্গের বিশেষ আদরের পাত্র হইয়াছিল। সন ১২৫৯ সালে ঠাকুরের কলিকাতায় প্রথম আগমনকালে অক্ষয়ের বয়স তিন চারি বৎসর মাত্র ছিল। অতএব ঐ ঘটনার পূর্ব্বে দুই তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত ঠাকুর অক্ষয়কে ক্রোড়ে করিয়া মানুষ করিতে, ও সর্ব্বদা আদর যত্ন করিতে অবসর পাইয়াছিলেন। পিতা রামকুমার কিন্তু আজীবন অক্ষয়কে কখনও ক্রোড়ে করেন নাই; কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'মায়া বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, এ ছেলে বাঁচিবে না!' পরে ঠাকুর যখন সংসার ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া সাধনায় নিমগ্ন হইলেন, তখন সুন্দর শিশু তাঁহার অলক্ষ্যে কৈশোর অতিক্রম পূর্ব্বক যৌবনে পদার্পণ করিয়া অধিকতর প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুর এবং তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়বর্গের নিকটে শুনিয়াছি, অক্ষয় বাস্তবিকই অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, অক্ষয়ের দেহের বর্ণ যেমন উজ্জ্বল ছিল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গঠনও তেমন সুঠাম ও সুললিত ছিল, দেখিলে জীবন্ত শিবমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান হইত।

অক্ষয়ের রূপ।

বাল্যকাল হইতে অক্ষয়ের মন শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। কুলদেবতা ৺রঘুবীরের সেবায় তিনি প্রতিদিন অনেক কাল যাপন করিতেন। সুতরাং দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অক্ষয় যখন পূজাকার্য্যে ব্রতী হইলেন তখন আপনার মনের মত কার্য্যেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, শ্রীশ্রীরাধা-

অক্ষয়ের শ্রীরামচন্দ্রে ভক্তি ও সাধনানুরাগ।

গোবিন্দজীর পূজা করিতে বসিয়া অক্ষয় ধ্যানে এমন তন্ময় হইত যে, সে সময় বিষ্ণুঘরে বহুলোকের সমাগম হইলেও সে জানিতে পারিত না—দুই ঘণ্টাকাল ঐরূপে অতিবাহিত হইবার পরে তাহার হুঁস হইত!' হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি মন্দিরের নিত্যপূজা সুসম্পন্ন করিবার পরে অক্ষয় পঞ্চবটীতলে আগমন-পূর্ব্বক অনেক ক্ষণ শিবপূজায় অতিবাহিত করিতেন; পরে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন সমাপনান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে নিবিষ্ট হইতেন। তদ্ভিন্ন নবানুরাগের প্রেরণায় তিনি এইকালে ন্যাস ও প্রাণায়াম এত অতিমাত্রায় করিয়া বসিতেন যে, তজ্জন্য তাঁহার কণ্ঠ-তালুদেশ স্ফীত হইয়া কখন কখন রুধির নির্গত হইত। অক্ষয়ের ঐরূপ ভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগ যে তাঁহাকে ঠাকুরের প্রিয় করিয়া তুলিবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

ঐরূপে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইয়া সন ১২৭৫ সাল সমাগত হইল। অক্ষয়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া খুল্লতাত রামেশ্বর তাহার বিবাহের জন্য এখন পাত্রী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কামারপুকুরের অনতিদূরে কুচেকোল নামক গ্রামে উপযুক্তা পাত্রীর সন্ধান পাইয়া রামেশ্বর যখন অক্ষয়কে লইয়া যাইবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন, তখন চৈত্র মাস। চৈত্রমাসে যাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া আপত্তি উঠিলেও রামেশ্বর এবং অক্ষয় উহা মানিলেন না। বলিলেন, বিদেশ হইতে নিজ বাটীতে আগমন কালে ঐ নিষেধ-বচন মানিবার আবশ্যকতা নাই। বাটীতে ফিরিয়া অনতিকাল পরে সন ১২৭৬ সালের বৈশাখে অক্ষয়ের বিবাহ হইল।

অক্ষয়ের বিবাহ।

বিবাহের কয়েক মাস পরে শ্বশুরালয়ে যাইয়া অক্ষয়ের কঠিন পীড়া হইল। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সংবাদ পাইয়া তাহাকে কামার-

পুকুরে আনাইলেন এবং চিকিৎসাদি দ্বারা আরোগ্য করাইয়া পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন। এখানে আসিয়া তাহার চেহারা ফিরিল এবং স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা একদিন অক্ষয়ের জ্বর হইল। ডাক্তারবৈদ্যেরা বলিল, সামান্য জ্বর, শীঘ্রই সারিয়া যাইবে।

বিবাহের পরে অক্ষয়ের কঠিন পীড়া ও দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন।

হৃদয় বলিতেন, বিবাহের স্বল্পকাল পরে অক্ষয়কে পূর্ব্বোক্তরূপে শ্বশুরালয়ে পীড়িত হইতে শুনিয়া ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, 'হৃদু, লক্ষণ বড় খারাপ, রাক্ষস-গণ-বিশিষ্টা কোন কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছে, ছোঁড়া মারা যাবে দেখ্‌চি!' তিন চারি দিনেও অক্ষয়ের জ্বরের উপশম হইল না দেখিয়া তিনি এখন হৃদয়কে ডাকিয়া বলিলেন, 'হৃদু, ডাক্তারেরা বুঝিতে পারিতেছে না, অক্ষয়ের বিকার হইয়াছে, ভাল চিকিৎসক আনাইয়া আশ মিটাইয়া চিকিৎসা কর্, ছোঁড়া কিন্তু বাঁচিবে না!'

অক্ষয়ের দ্বিতীয়বার পীড়া। অক্ষয়ের মৃত্যুঘটনা ঠাকুরের পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারা।

হৃদয় বলিতেন "তাঁহাকে ঐরূপ বলিতে শুনিয়া আমি বলিলাম, 'ছিঃ ছিঃ মামা, তোমার মুখ দিয়ে ও রকম কথাগুলা কেন বাহির হইল!'—তাহাতে তিনি বলিলেন, 'আমি কি ইচ্ছা করে ঐরূপ বলি? বে-একতারে বলি, মা যেমন জানান্ ও বলান্ তেমনি বলি। আমার কি ইচ্ছা, অক্ষয় মারা পড়ে!"

অক্ষয় বাঁচিবে না শুনিয়া হৃদয়ের আশঙ্কা ও আচরণ।

ঠাকুরের ঐরূপ কথা শুনিয়া হৃদয় বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং সুচিকিৎসক সকল আনাইয়া অক্ষয়ের পীড়া আরোগ্যের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রোগের ক্রমশঃ বৃদ্ধিই হইতে লাগিল; অনন্তর প্রায় মাসাবধি ভুগিবার পরে অক্ষয়ের অন্তিমকাল আগত

অক্ষয়ের মৃত্যু ও ঠাকুরের আচরণ।

দেখিয়া ঠাকুর তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'অক্ষয়, বল্ গঙ্গা নারায়ণ ওঁ রাম!'—অক্ষয় এক দুই করিয়া তিনবার ঐ মন্ত্র আবৃত্তি করিল; পরক্ষণেই তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল! হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, অক্ষয়ের ঐরূপ মৃত্যু হইলে হৃদয় যত কাঁদিতে লাগিল, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া তত হাসিতে লাগিলেন!

অক্ষয়ের মৃত্যুতে ঠাকুরের মনঃকষ্ট।

প্রিয়দর্শন পুত্রসদৃশ অক্ষয়ের মৃত্যু উচ্চ ভাবভূমি হইতে দর্শন করিয়া ঠাকুর ঐরূপে হাস্য করিলেও হৃদয়ে বিষমাঘাত যে অনুভব করেন নাই, তাহা নহে। বহুকাল পরে আমাদের নিকট ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি সময়ে সময়ে বলিয়াছেন যে, ঐ সময়ে ভাবাবেশে মৃত্যুটাকে অবস্থান্তরপ্রাপ্তিমাত্র বলিয়া দেখিতে পাইলেও ভাব-ভঙ্গ হইয়া সাধারণ ভূমিতে অবরোহণ করিবার কালে অক্ষয়ের বিয়োগে তিনি বিশেষ অভাব বোধ করিয়াছিলেন।* এবং তাহার মৃত্যুর পরে তিনি বাবুদের কুঠিতে আর কখনও বাস করিতে পারেন নাই। কারণ, অক্ষয়ের দেহত্যাগ ঐ বাটীতে হইয়াছিল।

ঠাকুরের ভ্রাতা রামেশ্বরের পূজকের পদ গ্রহণ।

অক্ষয়ের মৃত্যুর পরে ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, দক্ষিণেশ্বরে রাধাগোবিন্দজীর পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কামারপুকুরের সংসারের সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বাবধান তাঁহারই উপর ন্যস্ত থাকায় তিনি সকল সময়ে দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে পারিতেন না। উপযুক্ত বিশ্বাসী ব্যক্তির হস্তে ঐ কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া মধ্যে মধ্যে কামারপুকুর গ্রামে যাইয়া থাকিতেন।

* গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ, ১ম অধ্যায়, ২০ হইতে ২৫ পৃষ্ঠা দেখ।

শুনিয়াছি, শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দীননাথ নামক একব্যক্তি ঐ সময়ে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ঐ কর্ম্ম সম্পন্ন করিত।

মথুরের সহিত ঠাকুরের রাণাঘাটে গমন ও দরিদ্র নারায়ণগণের সেবা।

সে যাহা হউক, অক্ষয়ের মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে শ্রীযুত মথুর ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নিজ জমীদারী মহলে এবং গুরুগৃহে গমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মন হইতে অক্ষয়ের বিয়োগজনিত অভাববোধ প্রশমিত করিবার জন্যই বোধ হয়, তিনি এখন ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, পরমভক্ত মথুর, এক পক্ষে যেমন ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে সকল বিষয়ে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন, অপর পক্ষে তেমনি আবার তাঁহাকে সাংসারিক ব্যাপারমাত্রে অনভিজ্ঞ বালকবোধে সর্ব্বতোভাবে নিজ রক্ষণীয় বিবেচনা করিতেন। মথুরের জমীদারী মহল পরিদর্শন করিতে যাইয়া ঠাকুর এক স্থানের পল্লীবাসী স্ত্রী-পুরুষগণের দুর্দ্দশা ও অভাব দেখিয়া তাহাদিগের দুঃখে কাতর হন এবং তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া মথুরের দ্বারা তাহাদিগকে 'একমাথা করিয়া তেল, এক একখানি নূতন কাপড় এবং উদর পুরিয়া একদিনের ভোজন,' দান করাইয়াছিলেন। হৃদয় বলিতেন, রাণাঘাটের সন্নিকট কলাইঘাট নামক স্থানে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, এবং মথুরবাবু ঐ সময়ে ঠাকুরকে ও তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় করিয়া চূর্ণীর খালে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।

মথুরের নিজ বাটী ও গুরুগৃহ দর্শন।

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, সাতক্ষীরার নিকট সোনাবেড়ে নামক গ্রামে মথুরের নিজ বাটী ছিল। ঐ গ্রামের সন্নিহিত গ্রামসকল তখন মথুরের জমীদারীভুক্ত। ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া মথুর এই সময়ে ঐস্থানে গমন করিয়াছিলেন। এখান হইতে মথুরের গুরুগৃহ অধিক দূরবর্ত্তী

ছিল না। বিষয়সম্পত্তির বিভাগ লইয়া গুরুবংশীয়দিগের মধ্যে এই কালে বিবাদ চলিতেছিল। সেই বিবাদ মিটাইবার জন্য মথুরকে তাঁহারা আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গ্রামের নাম তালামাগ্‌রো। মথুর তথায় যাইবার কালে ঠাকুর ও হৃদয়কে নিজ হস্তীর উপর আরোহণ করাইয়া এবং স্বয়ং শিবিকায় আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছিলেন।* মথুরের গুরুপুত্রগণের সযত্ন পরিচর্য্যায় কয়েক সপ্তাহ এখানে অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

কলুটোলার হরিসভায় ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যদেবের আসনাধিকার ও কাল্‌না, নবদ্বীপাদি দর্শন।

মথুরের বাটী ও গুরুস্থান দর্শন করিয়া ফিরিবার স্বল্পকাল পরে ঠাকুরকে লইয়া কলিকাতায় কলুটোলা নামক পল্লীতে একটী বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত পল্লীবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত বা ধরের বাটীতে তখন হরিসভার অধিবেশন হইত। ঠাকুর তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গমন পূর্ব্বক ভাবাবেশে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাঠককে অন্যত্র প্রদান করিয়াছি।† উহার অনতিকাল পরে ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন করিতে অভিলাষ হওয়ায় শ্রীযুত মথুর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কাল্‌না, নবদ্বীপ প্রভৃতি

---

* হৃদয় বলিতেন, যাইবার কালে পথ বন্ধুর ছিল বলিয়া শ্রীযুত মথুর ঠাকুরকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে গমন করিয়াছিলেন এবং গ্রামে পৌঁছিবার পরে ঠাকুরের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাকে কখন কখন হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়াছিলেন।

† গুরুভাব, উত্তরার্দ্ধ—৩য় অধ্যায়।

স্থানে গমন করিয়াছিলেন। কাল্‌নায় গমন করিয়া ঠাকুর কিরূপে ভগবান দাস বাবাজী নামক সিদ্ধ ভক্তের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কিরূপ অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল, সে সকল কথা আমরা পাঠককে বলিয়াছি।* সম্ভবতঃ সন ১২৭৭ সালে ঠাকুর ঐ সকল পুণ্য স্থান দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের সন্নিকট গঙ্গায় চড়াসকলের নিকট দিয়া গমন করিবার কালে ঠাকুরের যেরূপ গভীর ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল, নবদ্বীপে যাইয়া তদ্রূপ হয় নাই। শ্রীযুত মথুর প্রভৃতি ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের লীলাস্থল পুরাতন নবদ্বীপ, গঙ্গাগর্ভে লীন হইয়াছে; ঐ সকল চড়ার স্থলেই সেই সকল বিদ্যমান ছিল, সেজন্যই ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার গভীর ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল।

সে যাহা হউক, একাদিক্রমে চতুর্দ্দশ বৎসর ঠাকুরের সেবায় সর্ব্বান্তঃকরণে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীযুত মথুরের মন এখন কতদূর নিষ্কাম ভাবে উপনীত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত- মথুরের নিষ্কাম ভক্তি। স্বরূপে হৃদয় আমাদিগকে একটী ঘটনা বলিয়াছিলেন। পাঠককে উহা এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।

এক সময়ে মথুর বাবু শরীরের সন্ধিস্থলবিশেষে স্ফোটক হইয়া শয্যাগত হইয়াছিলেন। ঠাকুরকে দেখিবার জন্য ঐসময়ে তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া হৃদয় ঐকথা ঠাকুরকে নিবেদন করিল। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, 'আমি যাইয়া কি করিব, তাহাব ফোড়া আরাম করিয়া দিবার আমার কি শক্তি আছে? ঠাকুর যাইলেন না দেখিয়া মথুর লোক পাঠাইয়া বারম্বার

* গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ৩য় অধ্যায়—১৩৭ পৃষ্ঠা।

কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। তাঁহার ঐরূপ ব্যাকুলতায় ঠাকুরকে অগত্যা যাইতে হইল। ঠাকুর উপস্থিত হইলে মথুরের আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি অনেক কষ্টে উঠিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিলেন, এবং বলিলেন 'বাবা, একটু পায়ের ধূলা দাও।'

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

ঠাকুর বলিলেন, 'আমার পায়ের ধূলা লইয়া কি হইবে, উহাতে তোমার ফোড়া কি আরোগ্য হইবে?'

মথুর তাহাতে বলিলেন, 'বাবা আমি কি এমনি, তোমার পায়ের ধূলা কি ফোড়া আরাম করিবার জন্য চাহিতেছি? তাহার জন্য ত ডাক্তার আছে। আমি ভবসাগর পার হইবার জন্য তোমার শ্রীচরণের ধূলা চাহিতেছি।'

শ্রীযুত মথুর ঐকথা বলিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং মথুর তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন—তাঁহার দুনয়নে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল! শ্রীযুত মথুর স্বল্পকালেই সে যাত্রা রোগমুক্ত হইলেন।

শ্রীযুত মথুর ঠাকুরকে এখন কতদূর ভক্তিবিশ্বাস করিতেন তদ্বিষয়ের নানা কথা আমরা ঠাকুরের এবং হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি। এক কথায় বলিতে হইলে, তিনি তাঁহাকে ইহকাল পরকালের সম্বল ও গতি বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিয়াছিলেন। অন্য পক্ষে ঠাকুরের কৃপাও তাঁহার প্রতি তেমনি অসীম ছিল। স্বাধীন-চেতা ঠাকুর মথুরের কোন কোন কার্য্যে সময়ে সময়ে বিরক্ত হইলেও ঐভাব ভুলিয়া তখনি আবার তাঁহার সকল অনুরোধ রক্ষাপূর্ব্বক তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর ও মথুরের সম্বন্ধ যে কত গভীর প্রেমপূর্ণ ও

ঠাকুরের সহিত মথুরের গভীর প্রেমসম্বন্ধ।

অবিচ্ছেদ্য ছিল তাহা নিম্নলিখিত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায়—

এক দিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া মথুরকে বলিলেন, 'মথুর, তুমি যতদিন (জীবিত) থাকিবে আমি ততদিন এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) থাকিব। মথুর শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন, সাক্ষাৎ জগদম্বাই ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন—স্নুতরাং ঠাকুরের ঐরূপ কথা শুনিয়া বুঝিলেন তাঁহার অবর্ত্তমানে ঠাকুর তাঁহার পরিবারবর্গকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন। অনন্তর তিনি দীনভাবে ঠাকুরকে বলিলেন, 'সে কি বাবা, আমার পত্নী এবং পুত্র দ্বারকানাথও যে তোমাকে বিশেষ ভক্তি করে।' ঠাকুর মথুরকে কাতর দেখিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমার পত্নী ও দোয়ারি যতদিন থাকিবে, আমি ততদিন থাকিব।' ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়াছিল। শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ও দ্বারিকানাথের দেহাবসানের অনতিকাল পরে ঠাকুর চিরকালের নিমিত্ত দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন! শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।* উহার পরে কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর মাত্র ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন।

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

অন্য এক দিবস শ্রীযুত মথুর ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, 'কৈ বাবা, তুমি যে, বলিয়াছিলে তোমার ভক্তগণ আসিবে, তাহারা কেহই ত এখন আসিল না?

ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।

---

* "Jagadamba died on or about 1st January, 1881, intestate, leaving defendant Trayluksha, then the only son of Mathura, her surviving." Quoted from Plaintiff's statement in High Court Suit no. 203 of 1889.

ঠাকুর তাহাতে বলিলেন, 'কি জানি বাবু, মা তাহাদিগকে কত দিনে আনিবেন—তাহারা সব আসিবে, একথা কিন্তু মা আমাকে স্বয়ং জানাইয়াছেন! অপর যাহা যাহা দেখাইয়াছেন সে সকলি ত একে একে সত্য হইয়াছে, এটী কেন সত্য হইল না, কে জানে!' ঐ বলিয়া ঠাকুর বিষণ্ণমনে ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার ঐ দর্শনটী কি তবে ভুল হইল? মথুর তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া মনে বিশেষ ব্যথা পাইলেন, ভাবিলেন, ঐকথা পাড়িয়া ভাল করেন নাই। পরে, বালকভাবাপন্ন ঠাকুরকে সান্ত্বনার জন্য বলিলেন, 'তারা আসুক্ আর নাই আসুক্ বাবা, আমি ত তোমার চিরানুগত ভক্ত রহিয়াছি?—তবে আর, তোমার দর্শন সত্য হইল না কিরূপে?—আমি একাই এক শত ভক্তের তুল্য, তাই মা বলিয়াছিলেন, অনেক ভক্ত আসিবে!—ঠাকুর বলিলেন, 'কে জানে বাবু, তুমি যা বল্‌চ তাই বা হবে।' মথুর ঐ প্রসঙ্গে আর অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া অন্য কথা পাড়িয়া ঠাকুরকে ভুলাইয়া দিলেন।

মথুরের ঐরূপ নিষ্কাম-ভক্তি লাভ করা আশ্চর্য্য নহে। ঐ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত।

ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গগুণে শ্রীযুত মথুরের মনে কতদূর ভাব-পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা আমরা 'গুরুভাব' গ্রন্থের অনেক স্থলে পাঠককে বলিয়াছি। শাস্ত্র বলেন মুক্ত পুরুষের সেবকেরা তদনুষ্ঠিত শুভ কর্ম্মসকলের ফলের অধিকারী হয়েন। অতএব অবতার পুরুষের সেবকেরা যে, বিবিধ দৈবী সম্পদের অধিকারী হইবেন, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

সে যাহা হউক, সম্পদ বিপদ, সুখ দুঃখ, মিলন বিয়োগ, জীবন মৃত্যু রূপ তরঙ্গসমাকুল কালের অনন্ত প্রবাহ ক্রমে সন ১২৭৮ সালকে ধরাধামে উপস্থিত করিল। ঠাকুরের

সহিত মথুরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া ঐ বৎসর পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। বৈশাখ যাইল, জ্যৈষ্ঠ যাইল, আষাঢ়েরও অর্দ্ধেক দিন অতীতের গর্ভে লীন হইল, এমন সময় শ্রীযুত মথুর জ্বররোগে শয্যাগত হইলেন। ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া উহা সাত আট দিনেই বিকারে পরিণত হইল এবং মথুরের বাক্‌রোধ হইল। ঠাকুর পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন—মা তাঁহার নিজ ভক্তকে স্নেহময় অঙ্কে গ্রহণ করিতেছেন—মথুরের ভক্তিব্রতের উদ্‌যাপন হইয়াছে! সেজন্য হৃদয়কে প্রতিদিন দেখিতে পাঠাইলেও, স্বয়ং মথুরকে দর্শন করিতে একদিনও যাইলেন না। ক্রমে শেষ দিন উপস্থিত হইল—অন্তিমকাল আগত দেখিয়া মথুরকে কালীঘাট লইয়া যাওয়া হইল। সেই দিন ঠাকুর হৃদয়কেও দেখিতে পাঠাইলেন না—কিন্তু অপরাহ্ণ উপস্থিত হইলে, দুই তিন ঘণ্টাকাল গভীর ভাবে নিমগ্ন হইলেন। শরীর দক্ষিণেশ্বরে পড়িয়া রহিল—জ্যোতির্ম্ময় বর্ত্মে দিব্য শরীরে ঠাকুর ভক্তের পার্শ্বে উপনীত হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করিলেন—বহুপুণ্যার্জ্জিত লোকে তাহাকে স্বয়ং আরূঢ় করাইলেন!

মথুরের দেহত্যাগ।

ভাবভঙ্গে ঠাকুর হৃদয়কে ডাকিলেন, তখন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে—বলিলেন, "মথুর দিব্য রথে আরোহণ করিল, শ্রীশ্রীজগদম্বার সখীগণ তাহাকে সাদরে রথে উঠাইয়াছিল এবং তাহার তেজ শ্রীশ্রীদেবীলোকে গমন করিল।"—হৃদয় শুনিয়া নীরব রহিল। পরে, গভীর রাত্রে কালীবাটীর কর্ম্মচারিগণ ফিরিয়া আসিয়া হৃদয়কে সংবাদ দিল, শ্রীযুত মথুর অপরাহ্ণে পাঁচটার সময় দেহ রক্ষা

ঠাকুরের ভাবাবেশে ঐ ঘটনা দর্শন।

করিয়াছেন! * ঐরূপে পুণ্যলোকে গমন করিলেও, ভোগবাসনার সম্পূর্ণ ক্ষয় না হওয়ায়, পরম ভক্ত মথুরামোহনকে ধরাধামে পুনরায় ফিরিতে হইবে, ঠাকুরের মুখে ঐকথা আমরা অন্যসময়ে শুনিয়াছি এবং পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।†

---

* "Mathura Mohan Biswas died in July, 1871, intestate leaving him surviving Jagadamba, sole widow, Bhupal since deceased, a son by his another wife who had pre-deceased him—and Dwarka Nath Biswas since deceased, defendant Trayluksha Nath and Thakurdas alias Dhurmadas, three sons by the said Jagadamba."

Quoted from plaintiff's statement in High Court Suit No. 230 of 1889—Shyama Churun Biswas, vs. Trayluksha Nath Biswas, Gurudas, Kalidas, Durgadas and Kumudini.

† গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ, ৭ম অধ্যায়, ২২৮ পৃষ্ঠা।

বিংশ অধ্যায়।

৺ষোড়শী-পূজা।

মথুর চলিয়া যাইলেন, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে মানবের জীবন প্রবাহ কিন্তু সমভাবেই বহিতে লাগিল। দিন, মাস অতীত হইয়া ক্রমে ছয়মাস কাটিয়া গেল এবং ১২৭৮ সালের ফাল্গুন মাস সমাগত হইল। ঠাকুরের জীবনে একটী বিশেষ ঘটনা ঐ কালে উপস্থিত হইয়াছিল। উহা জানিতে হইলে আমাদিগকে জয়রামবাটী গ্রামে ঠাকুরের শ্বশুরালয়ে একবার গমন করিতে হইবে।

বিবাহের পরে ঠাকুরকে প্রথম দর্শনকালে শ্রীশ্রীমা বালিকা মাত্র ছিলেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, সন ১২৭৪ সালে ঠাকুর যখন ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া নিজ জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার আত্মীয়া রমণীগণ তাঁহার পত্নীকে তথায় আনয়ন করিয়াছিলেন। বলিতে হইলে বিবাহের পর ঐ কালেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর স্বামিসন্দর্শন প্রথম লাভ হইয়াছিল। কামারপুকুর অঞ্চলের বালিকাদিগের সহিত কলিকাতার বালিকাদিগের তুলনা করিবার অবসর যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন, কলিকাতা অঞ্চলের বালিকাদিগের দেহের ও মনের পরিণতি স্বল্প বয়সেই

গ্রাম্য বালিকাদিগের বিলম্বে শরীরমনের পরিণতি হয়।

উপস্থিত হয়, কিন্তু কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রামসকলের বালিকাদিগের তাহা হয় না। চতুর্দ্দশ এবং কখন কখন পঞ্চদশ ও ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যা-দিগেরও সেখানে যৌবনকালের অঙ্গলক্ষণসমূহ পূর্ণভাবে উদ্গত হয় না—এবং শরীরের ন্যায় তাহাদিগের মনের পরিণতিও ঐরূপ বিলম্বে উপস্থিত হয়। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিণীসকলের ন্যায় অল্পপরিসর স্থানে কাল যাপন করিতে বাধ্য না হইয়া পবিত্র নির্ম্মল গ্রাম্য বায়ু সেবন এবং গ্রাম মধ্যে যথা তথা স্বচ্ছন্দবিহারপূর্ব্বক স্বাভাবিক ভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্যই বোধ হয় ঐরূপ হইয়া থাকে।

ঠাকুরকে প্রথমবার দেখিয়া শ্রীশ্রীমার মনের ভাব।

অতএব চতুর্দ্দশ বৎসরে প্রথমবার স্বামিসন্দর্শনকালে শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী বালিকা মাত্র ছিলেন। দাম্পত্যজীবনের গভীর উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব-বোধ করিবার শক্তি তাঁহাতে তখন বিকাশোন্মুখ হইয়াছিল মাত্র। পবিত্রা বালিকা দেহবুদ্ধিবিরহিত ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ আদরযত্ন লাভে ঐকালে অনির্ব্বচনীয় দিব্যানন্দে উল্লসিতা হইয়াছিলেন। ঠাকুরের স্ত্রীভক্তদিগের নিকটে তিনি ঐ উল্লাসের কথা অনেক সময় এই-রূপে বলিয়াছিলেন—“হৃদয়মধ্যে একটী পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐকাল হইতে সর্ব্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম—অনির্ব্বচনীয় আনন্দে অন্তর তখন নিরন্তর এমন পূর্ণ থাকিত!”

ঐভাব লইয়া শ্রীশ্রীমার জয়রামবাটীতে বাসের কথা।

কয়েক মাস পরে ঠাকুর যখন কামারপুকুর হইতে কলি-কাতায় ফিরিলেন, বালিকা তখন অনন্ত আনন্দ-সম্পদের অধিকারিণী হইয়াছেন—এইরূপ অনুভব করিতে করিতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ব্বোক্ত উল্লাসের উপলব্ধিতে তাঁহার চলন,

বলন, আচরণাদি সকল চেষ্টার ভিতর এখন একটী পরিবর্ত্তন যে, উপস্থিত হইয়াছিল একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। কিন্তু সাধারণ মানব উহা দেখিতে পাইয়াছিল কি না সন্দেহ; কারণ, উহা তাঁহাকে চপলা না করিয়া শান্তস্বভাবা করিয়াছিল, প্রগল্‌ভা না করিয়া চিন্তাশীলা করিয়াছিল, স্বার্থ-দৃষ্টি-নিবদ্ধা না করিয়া নিঃস্বার্থ প্রেমিকা করিয়াছিল, এবং অন্তর হইতে সর্ব্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত করিয়া মানব-সাধারণের দুঃখকষ্টের সহিত অনন্ত সমবেদনাসম্পন্না করিয়া ক্রমে তাঁহাকে করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল। মানসিক উল্লাসপ্রভাবে অশেষ শরীর-কষ্টকে তাঁহার এখন হইতে কষ্ট বলিয়াই মনে হইত না এবং আদর যত্নের প্রতি-দান না পাইলে মনে দুঃখ উপস্থিত হইত না। ঐরূপে শারীরিক সকল বিষয়ে সামান্যে সন্তুষ্টা থাকিয়া বালিকা আপনাতে আপনি ডুবিয়া তখন পিত্রালয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু শরীর ঐস্থানে থাকিলেও তাঁহার মন ঠাকুরের পদানুসরণ করিয়া এখন হইতে দক্ষিণেশ্বরেই উপস্থিত ছিল। ঠাকুরকে দেখিবার জন্য এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য মধ্যে মধ্যে মনে প্রবল বাসনার উদয় হইলেও বালিকা উহা যত্নে সম্বরণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেন;—ভাবিতেন, প্রথম দর্শনে যিনি তাঁহাকে কৃপা করিয়া এতদূর ভালবাসিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ভুলিবেন না,—সময় হইলেই নিজ সকাশে ডাকিয়া লইবেন। ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং হৃদয়ে বিশ্বাস স্থির রাখিয়া বালিকা ঐ শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চারিটী দীর্ঘ বৎসর একে একে কাটিয়া গেল। আশা-প্রতীক্ষার প্রবল প্রবাহ বালিকার মনে সমভাবেই বহিতে লাগিল। তাঁহার শরীর কিন্তু মনের ন্যায় সমভাবে থাকিল না, দিন দিন পরিবর্ত্তিত হইয়া সন ১২৭৮ সালের পৌষে উহা তাঁহাকে অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতীতে পরিণত করিল। দেবতুল্য স্বামীর প্রথম সন্দর্শনজনিত আনন্দ তাঁহাকে জীবনের দৈনন্দিন সুখদুঃখ হইতে উচ্চে উঠাইয়া রাখিলেও সংসারে নিরাবিল আনন্দের অবসর কোথায়?—গ্রামের পুরুষেরা জল্পনা করিতে বসিয়া যখন তাঁহার স্বামীকে 'উন্মত্ত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, "পরিধানের কাপড় পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া 'হরি' 'হরি' করিয়া বেড়ায়"—ইত্যাদি নানা কথা বলিত, অথবা সমবয়স্কা রমণীগণ যখন তাঁহাকে 'পাগলের স্ত্রী' বলিয়া করুণা বা উপেক্ষার পাত্রী বিবেচনা করিত, তখন মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার অন্তরে দারুণ ব্যথা উপস্থিত হইত। উন্মনা হইয়া তিনি তখন চিন্তা করিতেন—তবে কি পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছিলাম তিনি সেরূপ আর নাই? লোকে যেমন বলিতেছে, তাঁহার কি ঐরূপ অবস্থান্তর হইয়াছে? বিধাতার নির্ব্বন্ধে যদি ঐরূপই হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার ত আর এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে, পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার সেবাতে নিযুক্ত থাকাই উচিত। অশেষ চিন্তার পর স্থির করিলেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরে স্বয়ং গমনপূর্ব্বক চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিবেন, পরে—যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিবেন।

ঐকালে শ্রীশ্রীমার মনোবেদনার কারণ ও দক্ষিণেশ্বরে আসিবার সঙ্কল্প।

ফাল্গুনের দোলপূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতে স্নান করিবার জন্য বঙ্গের সুদূর

প্রান্ত হইতে অনেকে ঐদিন কলিকাতায় আগমন করে। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর দূরসম্পর্কীয়া কয়েক-জন আত্মীয়া রমণী ঐ বৎসর ঐজন্য আগমন করিবেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া তিনি এখন তাঁহাদিগের সহিত গঙ্গাস্নানে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার পিতার অভিমত না হইলে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে ভাবিয়া রমণীরা তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধিমান পিতা শুনিয়াই বুঝিলেন, কন্যা কেন এখন কলিকাতায় যাইতে অভিলাষিনী হইয়াছেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং কলিকাতা আসিবার জন্য সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিলেন।

ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার বন্দোবস্ত।

রেল-কোম্পানীর প্রসাদে সুদূর কাশী বৃন্দাবন কলিকাতার অতি সন্নিকট হইয়াছে, কিন্তু ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর ও জয়-রামবাটী ঐ প্রসাদে বঞ্চিত থাকিয়া যে দূরে সেই দূরেই পড়িয়া রহিয়াছে। এখনও ঐরূপ, তখনকার ত কথাই নাই—তখন বিষ্ণুপুর বা তারকেশ্বর কোন স্থানেই রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই এবং ঘাটালকেও বাষ্পীয় জলযান কলিকাতার সহিত যুক্ত করে নাই। সুতরাং শিবিকা অথবা পদব্রজে গমনাগমন করা ভিন্ন ঐ সকল গ্রামের লোকের অন্য উপায় ছিল না এবং জমীদার প্রভৃতি ধনী লোক ভিন্ন মধ্যবিৎ গৃহস্থেরা সকলেই শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিতেন। অতএব কন্যা ও সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে শ্রীরামচন্দ্র দূর পথ পদব্রজে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ধান্যক্ষেত্রের পর ধান্যক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে

নিজ পিতার সহিত শ্রীশ্রীমার পদব্রজে গঙ্গা-স্নান করিতে আগমন ও পথিমধ্যে জ্বর।

কমলপূর্ণ দীর্ঘিকানিচয় দেখিতে দেখিতে, অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষরাজির শীতল ছায়া অনুভব করিতে করিতে, তাঁহারা সকলে প্রথম দুই তিন দিন সানন্দে পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছান পর্য্যন্ত ঐ আনন্দ রহিল না। পথশ্রমে অনভ্যস্তা কন্যা পথিমধ্যে একস্থলে দারুণ জ্বরে আক্রান্তা হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিলেন। কন্যার ঐরূপ অবস্থায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া তিনি চটীতে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পীড়িতাবস্থায় শ্রীশ্রীমার অদ্ভুত দর্শন বিবরণ।

পথিমধ্যে ঐরূপে পীড়িতা হওয়ায় শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর অন্তঃকরণে কতদূর বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু এক অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়া ঐ সময়ে তাঁহাকে আশ্বস্তা করিয়াছিল। উক্ত দর্শনের কথা তিনি পরে স্ত্রীভক্তদিগকে কখন কখন নিম্নলিখিত ভাবে বলিয়াছেন—

"জ্বরে যখন একেবারে বেহুঁস্, লজ্জাসরমরহিত হইয়া পড়িয়া আছি, তখন দেখিলাম, পাশে একটী মেয়ে এসে ব'স্‌ল—মেয়েটীর রং কাল, কিন্তু এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই!—ব'সে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল—এমন নরম ঠাণ্ডা হাত, গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে যেতে লাগ্‌ল! জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কোথা থেকে আস্‌চ গা?' মেয়েটী ব'ল্লে—'আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আস্‌চি।' শুনে, অবাক্ হয়ে বল্‌লাম—'দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখ্‌ব, তাঁর সেবা ক'র্‌ব। কিন্তু পথে জ্বর হয়ে আমার ভাগ্যে সে সব আর হ'ল না।' মেয়েটী ব'ল্‌লে—'সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বৈ কি, ভাল হয়ে—সেখানে যাবে, তাঁকে দেখ্‌বে। তোমার জন্যই ত তাঁকে সেখানে আট্‌কে রেখেছি।' আমি

বলিলাম, 'বটে ? তুমি আমাদের কে হও গা ?' মেয়েটী বল্‌লে, 'আমি তোমার বোন্ হই!' আমি বলিলাম, 'বটে ? তাই তুমি এসেছ!' ঐরূপ কথাবার্ত্তার পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম!"

রাত্রে জ্বরগায়ে শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে পৌছান ও ঠাকুরের আচরণ।

প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন, কন্যার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে! পথিমধ্যে নিরুপায় হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা তিনি তাঁহাকে লইয়া ধীরে ধীরে পথ অতিবাহন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। রাত্রের পূর্ব্বোক্ত দর্শনে উৎসাহিতা হইয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী তাঁহার ঐ পরামর্শ সাগ্রহে অনুমোদন করিলেন। কিছু দূর যাইতে না যাইতে একখানি শিবিকাও পাওয়া গেল। তাঁহার পুনরায় জ্বর আসিল, কিন্তু পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় প্রবল বেগে না আসায় তিনি উহার প্রকোপে একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িলেন না। ঐবিষয়ে কাহাকে কিছু বলিলেনও না। ক্রমে পথের শেষ হইল এবং রাত্রি নয়টার সময় শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

ঠাকুর তাঁহাকে সহসা ঐরূপে রোগাক্রান্তা হইয়া আসিতে দেখিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর বাড়িবে বলিয়া নিজ গৃহে ভিন্ন শয্যায় তাঁহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং দুঃখ করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন, 'তুমি এত দিনে আসিলে ? আর কি আমার সেজ বাবু (মথুর বাবু) আছে যে তোমার যত্ন হবে ?' ঔষধ পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্তে তিন চারি দিনেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আরোগ্যলাভ করিলেন। ঐ তিন চারি দিন ঠাকুর তাঁহাকে দিবারাত্র নিজ গৃহে রাখিয়া ঔষধ পথ্যাদি সকল বিষয়ের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিলেন, পরে নহবত ঘরে নিজ জননীর নিকটে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিল ; পরের কথায় উদিত হইয়া যে সন্দেহ মেঘের ন্যায় ইতিপূর্ব্বে বিশ্বাস-সূর্য্যকে আবৃত করিতে উপক্রম করিয়াছিল, ঠাকুরের যত্ন-প্রবৃদ্ধ অনুরাগপবনে তাহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া এখন কোথায় বিলীন হইল ! শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, ঠাকুর পূর্ব্বে যেমন ছিলেন এখনও তদ্রূপ আছেন—সংসারী মানব না বুঝিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানা রটনা করিয়াছে। দেবতা, দেবতাই আছেন এবং বিস্মৃত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় সমানভাবে কৃপাপরবশ রহিয়াছেন ! অতএব কর্ত্তব্য স্থির হইতে বিলম্ব হইল না। প্রাণের উল্লাসে তিনি নহবতে থাকিয়া দেবতার ও দেবজননীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন—এবং তাঁহার পিতা ?—কন্যার আনন্দে আনন্দিত হইয়া কয়েক দিন ঐ স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক তিনি হৃষ্টচিত্তে নিজগ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ঠাকুরের ঐরূপ আচরণে শ্রীশ্রীমার সানন্দে তথায় অবস্থিতি।

সন ১২৭৪ সালে কামারপুকুরে অবস্থান করিবার কালে, শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর আগমনে ঠাকুরের মনে যে চিন্তাপরম্পরার উদয় হইয়াছিল তাহা আমরা পাঠককে বলিয়াছি। ব্রহ্মবিজ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠালাভসম্বন্ধীয় আচার্য্য শ্রীমৎ তোতাপুরীর কথা আলোচনা পূর্ব্বক তিনি ঐ কালে নিজ সাধন-লব্ধ বিজ্ঞানের পরীক্ষা করিতে এবং পত্নীর প্রতি নিজ কর্ত্তব্য পরিপালনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে তদুভয় অনুষ্ঠানের আরম্ভ মাত্র করিয়াই তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিতে হইয়াছিল। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে নিকটে পাইয়া তিনি এখন পুনরায় ঐ দুই বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন।

ঠাকুরের নিজ ব্রহ্মবিজ্ঞানের পরীক্ষা ও পত্নীকে শিক্ষা-প্রদান।

প্রশ্ন উঠিতে পারে—পত্নীকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি ইতিপূর্ব্বেই ত ঐরূপ করিতে পারিতেন, ঐরূপ করেন নাই কেন? উত্তরে বলিতে হয়—সাধারণ মানব ঐরূপ করিত, সন্দেহ নাই; ঠাকুর ঐ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না বলিয়া ঐরূপ আচরণ করেন নাই। ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যাঁহারা জীবনের প্রতিক্ষণ প্রতি কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ং মতলব আঁটিয়া কখন কোন কার্য্যে অগ্রসর হন না। আত্মকল্যাণ বা অপরের কল্যাণ সাধন করিতে তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র বুদ্ধির সহায়তা না লইয়া শ্রীভগবানের বিরাট বুদ্ধির সহায়তা ও ইঙ্গিত প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। সেজন্য স্বেচ্ছায় পরীক্ষা দিতে তাঁহারা সর্ব্বথা পরাঙ্মুখ হন। কিন্তু বিরাটেচ্ছার অনুগামী হইয়া চলিতে চলিতে যদি কখন পরীক্ষা দিবার কাল স্বতঃ উপস্থিত হয় তবে তাঁহারা ঐ পরীক্ষা প্রদানের জন্য সানন্দে অগ্রসর হন। ঠাকুর স্বেচ্ছায় আপন ব্রহ্মবিজ্ঞানের গভীরতা পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন পত্নী স্বেচ্ছায় কামারপুকুরে তাঁহার সকাশে আগমন করিয়াছেন এবং তৎপ্রতি নিজ কর্ত্তব্য প্রতিপালনে অগ্রসর হইলে তাঁহাকে ঐ বিষয়ে পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে, তখনই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আবার, ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ অবসর চলিয়া যাইয়া যখন তাঁহাকে কলিকাতায় আগমন পূর্ব্বক পত্নীর নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইল তখন তিনি ঐরূপ অবসর পুনরানয়নের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইলেন না। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী যতদিন না স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়নের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা

ইতিপূর্ব্বে ঠাকুরের ঐরূপ অনুষ্ঠান না করিবার কারণ।

করিলেন না। সাধারণ বুদ্ধিসহায়ে আমরা ঠাকুরের আচরণের ঐরূপে সামঞ্জস্য করিতে পারি, তদ্ভিন্ন বলিতে পারি যে, যোগ-দৃষ্টিসহায়ে তিনি বিদিত হইয়াছিলেন, ঐরূপ করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

ঠাকুরের শিক্ষাদানের প্রণালী ও শ্রীশ্রীমার সহিত এইকালে আচরণ।

সে যাহা হউক, পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনপূর্ব্বক পরীক্ষা প্রদানের অবসর উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ঠাকুর এখন তদ্বিষয়ে সানন্দে অগ্রসর হইলেন এবং অবসর পাইলেই মাতাঠাকুরাণীকে মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। শুনা যায় এই সময়েই তিনি মাতাঠাকুরাণীকে বলিয়াছিলেন, 'চাঁদা মামা যেমন সকল শিশুর মামা তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার; তাঁহাকে ডাকিবার সকলেরই অধিকার আছে, যে ডাকিবে তিনি তাহাকেই দর্শনদানে কৃতার্থ করিবেন, তুমি ডাক ত তুমিও তাঁহার দেখা পাইবে।' কেবল উপদেশ মাত্র দানেই ঠাকুরের শিক্ষার অবসান হইত না; কিন্তু শিষ্যকে নিকটে রাখিয়া ভালবাসায় সর্ব্বতোভাবে আপনার করিয়া লইয়া তিনি তাহাকে প্রথমে উপদেশ প্রদান করিতেন, পরে শিষ্য উহা কার্য্যে কতদূর প্রতিপালন করিতেছে সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন এবং ভ্রমবশতঃ সে বিপরীত অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে বুঝাইয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর সম্বন্ধে তিনি যে, এখন পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রথম দিন হইতে ভালবাসায় তিনি তাঁহাকে কতদূর আপনার করিয়া লইয়াছিলেন তাহা আগমনমাত্র তাঁহাকে নিজগৃহে বাস করিতে দেওয়াতে এবং আরোগ্য হইবার পরে প্রত্যহ রাত্রে নিজ শয্যায় শয়ন করিবার

অনুমতি প্রদানে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। মাতাঠাকুরাণীর সহিত ঠাকুরের এইকালের দিব্য আচরণের কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র* বলিয়াছি, এজন্য এখানে তাহার আর পুনরুল্লেখ করিব না। দুই একটী কথা, যাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হয় নাই, তাহাই কেবল বলিব।

শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর কি ভাবে দেখিতেন।

শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী এক দিন এই সময়ে ঠাকুরের পাদ-সম্বাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?' ঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, 'যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন, এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন! সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্ব্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই!'

ঠাকুরের নিজ মনের সংযম পরীক্ষা।

অন্য এক দিবস শ্রীশ্রীমাকে নিজ পার্শ্বে নিদ্রিতা দেখিয়া ঠাকুর আপন মনকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন—"মন, ইহারই নাম স্ত্রীশরীর, লোকে ইহাকে পরম উপাদেয় ভোগ্য বস্তু বলিয়া জানে এবং ভোগ করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ লালায়িত হয়; কিন্তু উহা গ্রহণ করিলে দেহেই আবদ্ধ থাকিতে হয়, সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না; পেটে একখানা, মুখে একখানা, করিও না, সত্য বল তুমি উহা গ্রহণ করিতে চাও অথবা ঈশ্বরকে চাও? যদি উহা চাও ত এই তোমার সম্মুখে রহিয়াছে গ্রহণ কর!" ঐরূপ বিচার পূর্ব্বক ঠাকুর শ্রীশ্রীমাতা

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—৪র্থ অধ্যায়,—১৪১ পৃষ্ঠা।

ঠাকুরাণীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইবামাত্র মন কুণ্ঠিত হইয়া সহসা সমাধিপথে এমন বিলীন হইয়া গেল যে, সে রাত্রিতে উহা আর সাধারণ ভাবভূমিতে অবরোহণ করিল না। ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করাইয়া পরদিন বহু যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করাইতে হইল!

পত্নীকে লইয়া ঠাকুরের আচরণের ন্যায় আচরণ কোন অবতার পুরুষ করেন নাই। উহার ফল।

ঐরূপে পূর্ণযৌবন ঠাকুর এবং নবযৌবনসম্পন্না শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর এই কালের দিব্য লীলাবিলাস-সম্বন্ধে যে সকল কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি তাহা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অপর কোনও মহাপুরুষের সম্বন্ধে শ্রবণ করা যায় না। ঐ সকল কথায় মুগ্ধ হইয়া মানব-হৃদয় স্বতঃই ইঁহাদিগের দেবত্বে বিশ্বাসবান্ হইয়া উঠে এবং অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা ইঁহাদিগের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতে বাধ্য হয়! দেহবোধবিরহিত ঠাকুরের প্রায় সমস্ত রাত্রি এইকালে সমাধিতে অতিবাহিত হইত এবং সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া বাহ্যভূমিতে অবরোহণ করিলেও তাঁহার মন এখন এত উচ্চে অবস্থান করিত যে সাধারণমানবের ন্যায় দেহবুদ্ধি উহাতে এক ক্ষণের জন্যও উদিত হইত না।

শ্রীশ্রীমার অলৌকিকত্ব-সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা।

ঐরূপে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতীত হইয়া ক্রমে বৎসরাধিক কাল অতীত হইল—কিন্তু এই অদ্ভুত ঠাকুর ও ঠাকুরাণীর সংযমের বাঁধ ভঙ্গ হইল না!—একক্ষণের জন্য ভুলিয়াও তাঁহাদিগের মন, প্রিয় বোধ করিয়া দেহের রমণ কামনা করিল না! ঐ কালের কথা স্মরণ করিয়া ঠাকুর পরে আমাদিগকে কখন কখন বলিয়াছেন, "ও (শ্রীশ্রীমাতা-

ঠাকুরাণী) যদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে আক্রমণ করিত তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেহবুদ্ধি আসিত কিনা, কে বলিতে পারে? বিবাহের পরে মাকে (৺জগদম্বাকে) ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিলাম যে, মা আমার পত্নীর ভিতর হইতে কামভাব এককালে দূর করিয়া দে—ওর (শ্রীশ্রীমার) সঙ্গে একত্র বাস করিয়া এইকালে বুঝিয়াছিলাম, মা সে কথা সত্য সত্যই শ্রবণ করিয়াছিলেন।”

বৎসরাধিক কাল অতীত হইলেও মনে একক্ষণের জন্য যখন দেহবুদ্ধির উদয় হইল না, এবং শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে কখন ৺জগদম্বার অংশভাবে এবং কখন সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মভাবে দৃষ্টি করা ভিন্ন অপর কোন ভাবে দেখিতে ও ভাবিতে যখন সমর্থ হইলেন না, তখন ঠাকুর বুঝিলেন শ্রীশ্রীজগন্মাতা কৃপা করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছেন এবং মার কৃপায় তাঁহার মন এখন সহজ স্বাভাবিক ভাবে দিব্যভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছে। শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রসাদে তিনি এখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, তাঁহার সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীপাদপদ্মে মন এতদূর তন্ময় হইয়াছে যে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে মার ইচ্ছার বিরোধী কোন ইচ্ছাই এখন আর, উহাতে উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই! অতঃপর শ্রীশ্রীজগদম্বার নিয়োগে তাঁহার প্রাণে এক অদ্ভুত বাসনার উদয় হইল এবং কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তিনি উহা এখন কার্য্যে পরিণত করিলেন। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকটে ঐ বিষয়ে সময়ে সময়ে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাই এখন সম্বদ্ধভাবে আমরা পাঠককে বলিব।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঠাকুরের সঙ্কল্প।

সন ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্দ্ধেকের উপর গত হইয়াছে। আজ অমাবস্যা, ফলহারিণী কালিকা পূজার পুণ্য-দিবস। সুতরাং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আজ বিশেষ পর্ব্ব উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে পূজা করিবার মানসে আজ বিশেষায়োজন করিয়াছেন। ঐ আয়োজন কিন্তু মন্দিরে না হইয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে গুপ্তভাবে তাঁহার গৃহেই হইয়াছে। পূজাকালে ৺দেবীকে বসিতে দিবার জন্য আলিম্পনভূষিত একখানি পীঠ পূজকের আসনের দক্ষিণপার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছে। সূর্য্য অস্তে গমন করিয়া ক্রমে গাঢ় তিমিরাবগুণ্ঠনে অমাবস্যার নিশি সমাগতা হইল। ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়কে অদ্য রাত্রিকালে মন্দিরে ৺দেবীর বিশেষপূজা করিতে হইবে, সুতরাং ঠাকুরের পূজার আয়োজনে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া সে মন্দিরে চলিয়া যাইল এবং ৺রাধাগোবিন্দের রাত্রিকালের সেবা-পূজা সমাপনানন্তর দীনু পূজারি আসিয়া ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিল। ৺দেবীর রহস্যপূজার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীকে পূজাকালে উপস্থিত থাকিতে ঠাকুর ইতিপূর্ব্বে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও ঐ গৃহে এখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর পূজায় বসিলেন।

৺ষোড়শী-পূজার আয়োজন।

পূজা-দ্রব্যসকল সংশোধিত হইয়া পূর্ব্বকৃত্য সম্পাদিত হইল। ঠাকুর এইবার আলিম্পনভূষিত পীঠে শ্রীশ্রীমাকে উপবেশনের জন্য ইঙ্গিত করিলেন। পূজা দর্শন করিতে করিতে শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণী ইতিপূর্ব্বে অর্দ্ধ-বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং কি করিতেছেন তাহা সম্যক্ না বুঝিয়া মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায়

শ্রীশ্রীমাকে অভিষেকপূর্ব্বক ঠাকুরের পূজাকরণ।

তিনি এখন পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট ঠাকুরের দক্ষিণভাগে উত্তরাস্যা হইয়া উপবিষ্টা হইলেন! সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপূত বারি দ্বারা ঠাকুর বারম্বার শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন। অনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া তিনি এখন প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—

"হে বালে, হে সর্ব্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইঁহার (শ্রীশ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্ব্বকল্যাণ সাধন কর!"

অতঃপর শ্রীশ্রীমার অঙ্গে মন্ত্রসকলের যথাবিধানে ন্যাসপূর্ব্বক ঠাকুর সাক্ষাৎ ৺দেবীজ্ঞানে তাঁহাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন এবং ভোগ নিবেদন করিয়া নিবেদিত বস্তু সকলের কিয়দংশ স্বহস্তে তাঁহার মুখে প্রদান করিলেন। বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া শ্রীশ্রীমা সমাধিস্থা হইলেন! ঠাকুরও অর্দ্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হইলেন! সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা দেবীর সহিত আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন!

পূজাশেষে সমাধি ও ঠাকুরের জপপূজাদি ৺দেবীচরণে সমর্পণ।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল! নিশার দ্বিতীয় প্রহর বহুক্ষণ অতীত হইল! আত্মারাম ঠাকুরের এইবার বাহ্যসংজ্ঞার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গেল! পূর্ব্বের ন্যায় অর্দ্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া তিনি এখন ৺দেবীকে আত্মনিবেদন করিলেন। অনন্তর আপনার সহিত সাধনার ফল এবং জপের মালা প্রভৃতি সর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীদেবীপাদপদ্মে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন—

"হে সর্ব্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্ব্বকর্ম্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনী ত্রিনয়নী শিব-গেহিনী গৌরি, হে নারায়ণি তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি।"

পূজা শেষ হইল—মূর্ত্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহালম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্ব্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল—তাঁহার দেব-মানবত্ব সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করিল!

ঠাকুরের নিরন্তর সমাধির জন্য শ্রীশ্রীমার নিদ্রায় ব্যাঘাত হওয়ায় অন্যত্র শয়ন এবং কামারপুকুরে প্রত্যাগমন।

৺ষোড়শী-পূজার পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী প্রায় পাঁচ মাস কাল ঠাকুরের নিকটে অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় ঐকালে তিনি ঠাকুর এবং ঠাকুরের জননীর সেবায় নিযুক্তা থাকিয়া দিবাভাগে নহবত ঘরে অতিবাহিত করিয়া রাত্রিকালে ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে শয়ন করিতেন। দিবারাত্র ঠাকুরের ভাব-সমাধির বিরাম ছিল না এবং কখন কখন নির্ব্বিকল্প সমাধিপথে তাঁহার মন সহসা এমন বিলীন হইত যে মৃতের লক্ষণ সকল তাঁহার দেহে প্রকাশিত হইত! কখন্ ঠাকুরের ঐরূপ সমাধি হইবে এই আশঙ্কায় শ্রীশ্রীমার রাত্রিকালে নিদ্রা হইত না। বহুক্ষণ সমাধিস্থ হইবার পরেও ঠাকুরের সংজ্ঞা হইতেছে না দেখিয়া ভীতা ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া তিনি এক রাত্রিতে হৃদয় এবং অন্যান্য সকলের নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছিলেন। পরে হৃদয় আসিয়া বহুক্ষণ নাম শুনাইলে ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইয়াছিল। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর সকল কথা জানিতে পারিয়া এবং শ্রীশ্রীমার রাত্রিকালে প্রত্যহ নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে জানিয়া নহবতে তাঁহার জননীর নিকটে মাতাঠাকুরাণীর শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ঐরূপে এক বৎসর চারি মাসকাল ঠাকুরের নিকটে দক্ষিণেশ্বরে অতিবাহিত করিয়া সম্ভবতঃ সন ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসের কোন সময়ে শ্রীশ্রীমা কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

একবিংশ অধ্যায়।

সাধকভাবের শেষকথা।

৺ষোড়শীপূজার পরে ঠাকুরের সাধনবাসনার নিবৃত্তি।

৺ ষোড়শী-পূজা সম্পন্ন করিয়া ঠাকুরের সাধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল। ঈশ্বরানুরাগরূপ যে পুণ্য হুতবহ হৃদয়ে নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকিয়া তাঁহাকে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অস্থির করিয়া নানাভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিল এবং ঐকালের পরেও সম্পূর্ণরূপে শান্ত হইতে দেয় নাই, পূর্ণাহুতি প্রাপ্ত হইয়া এতদিনে তাহা প্রশান্তভাব ধারণ করিল। ঐরূপ না হইয়াই বা উহা এখন করিবে কি—ঠাকুরের আপনার বলিবার এখন আর কি আছে, যাহা তিনি উহাতে ইতিপূর্ব্বে আহুতি প্রদান না করিয়াছেন?—ধন মান নাম যশাদি পৃথিবীর সমস্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা বহুপূর্ব্বেই তিনি উহাতে বিসর্জ্জন করিয়াছেন! হৃদয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারাদি সকলকেও উহার করাল মুখে একে একে আহুতি দিয়াছেন! ছিল কেবল বিবিধ সাধন পথে অগ্রসর হইয়া নানাভাবে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দেখিবার বাসনা—তাহাও এখন তিনি উহাতে নিঃশেষে অর্পণ করিলেন!—অতএব প্রশান্ত না হইয়া উহা এখন আর করিবে কি?

কারণ, সর্ব্বধর্ম্মমতের সাধনা সম্পূর্ণ করিয়া অপর আর কি করিবেন।

ঠাকুর দেখিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছেন—পরে, নানা অদ্ভুত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিসকলের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া বিবিধ শাস্ত্রীয় পথে অগ্রসর করিয়া ঐ দর্শন মিলাইয়া লইবার অবসর দিয়াছেন—অতএব, তাঁহার নিকটে তিনি এখন আর কি চাহিবেন! দেখিলেন—চৌষট্টিখানা তন্ত্রের

সকল সাধন একে একে সম্পন্ন হইয়াছে, বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত পঞ্চ-ভাবাশ্রিত যতপ্রকার সাধনপথ ভারতে প্রবর্ত্তিত আছে সে সকল যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সনাতন বৈদিকমার্গানুসারী হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণ নিরাকাররূপের দর্শন হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার অচিন্ত্যলীলায় ভারতের বাহিরে উদ্ভূত ইসলাম মতের সাধনায় প্রবর্ত্তিত হইয়াও যথাযথ ফল হস্তগত হইয়াছে—সুতরাং শ্রীশ্রীমার নিকটে তিনি এখন আর কি দেখিতে বা শুনিতে চাহিবেন!

শ্রীশ্রীঈশাপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে ঠাকুরের অদ্ভুত উপায়ে সিদ্ধিলাভ।

এই কালের একবৎসর পরে কিন্তু ঠাকুরের মন আবার অন্য এক সাধন পথে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দর্শন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। তখন তিনি শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিকের সহিত পরিচিত হইয়াছেন এবং তাঁহার নিকটে বাইবেল শ্রবণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীঈশার পবিত্র জীবনের এবং সম্প্রদায় প্রবর্ত্তনের কথা জানিতে পারিয়াছেন। ঐ বাসনা তাঁহার মনে ঈষন্মাত্র উদয় হইতে না হইতে শ্রীশ্রীজগদম্বা উহা অদ্ভুত উপায়ে পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, সেজন্য উহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় নাই। ঘটনা এইরূপ হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর দক্ষিণ পার্শ্বে যদুনাথ মল্লিকের উদ্যান বাটী; ঠাকুর ঐস্থানে মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে যাইতেন। শ্রীযুত যদুনাথ ও তাঁহার মাতা ঠাকুরকে দর্শন করিয়া অবধি তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, সুতরাং উদ্যানে তাঁহারা উপস্থিত না থাকিলেও ঠাকুর তথায় বেড়াইতে যাইলেই কর্ম্মচারিগণ বাবুদের বৈঠকখানা উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাকে কিছুকাল বসিবার ও বিশ্রাম করিবার জন্য অনুরোধ করিত। উক্ত গৃহের দেয়ালে অনেকগুলি উত্তম চিত্র বিলম্বিত ছিল।

মাতৃকোলে অবস্থিত শ্রীশ্রীঈশার বালগোপাল মূর্ত্তি একখানিও তন্মধ্যে ছিল। ঠাকুর বলিতেন, একদিন উক্ত ঘরে বসিয়া তিনি ঐ ছবিখানি তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলেন এবং শ্রীশ্রীঈশার অদ্ভুত জীবনকথা ভাবিতে ছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, ছবিখানি যেন জীবন্ত জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে এবং ঐ অদ্ভুত দেব-জননী ও দেব-শিশুর অঙ্গ হইতে জ্যোতিরশ্মিসমূহ তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার মানসিক ভাবসকল আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেছে! জন্মগত হিন্দুসংস্কারসমূহ অন্তরের নিভৃত কোণে লীন হইয়া ভিন্ন সংস্কার সকল উহাতে উদয় হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর তখন নানাভাবে আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বাকে কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন—'মা, আমাকে এ কি করিতেছিস্,' কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ঐ সংস্কার-তরঙ্গ প্রবলবেগে উত্থিত হইয়া তাঁহার মনের হিন্দুসংস্কার সমূহকে এককালে তলাইয়া দিল, দেবদেবীসকলের প্রতি ঠাকুরের অনুরাগ, ভালবাসা কোথায় বিলীন হইল এবং শ্রীশ্রীঈশার ও তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসিয়া হৃদয় অধিকার পূর্ব্বক, খৃষ্টীয় পাদ্‌রিসমূহ প্রার্থনামন্দিরে শ্রীশ্রীঈশার মূর্ত্তি-সম্মুখে ধূপ-দীপ দান করিতেছে, অন্তরের ব্যাকুলতা কাতর প্রার্থনায় তাঁহাকে নিবেদন করিতেছে—এই সকল বিষয় ঠাকুরকে দেখাইতে লাগিল! ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া নিরন্তর ঐ সকল বিষয়ের ধ্যানেই মগ্ন রহিলেন এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার মন্দিরে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার কথা এককালে ভুলিয়া যাইলেন! তিন দিন পর্য্যন্ত ঐ ভাবতরঙ্গ তাঁহার উপর ঐরূপে প্রভুত্ব করিয়া বর্ত্তমান রহিল। পরে তৃতীয় দিবসের অবসানে ঠাকুর পঞ্চবটী তলে বেড়াইতে বেড়াইতে

দেখিলেন, এক অদৃষ্টপূর্ব্ব দেব-মানব, সুন্দর গৌরবর্ণ, স্থির দৃষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকন করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন! ঠাকুর দেখিয়াই বুঝিলেন, ইনি বিদেশী এবং বিজাতি-সম্ভূত। দেখিলেন, বিশ্রান্ত নয়নযুগলে ইঁহার মুখের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে এবং নাসিকা 'একটু চাপা' হইলেও উহাতে ঐ সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম সাধিত হয় নাই। ঐ সৌম্যমুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব দেবভাব দেখিয়া ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং বিস্মিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—কে ইনি? দেখিতে দেখিতে ঐ মূর্ত্তি নিকটে আগমন করিল এবং ঠাকুরের পূত-হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'ঈশামসি—দুঃখযাতনা হইতে জীবকুলকে উদ্ধারের জন্য যিনি হৃদয়ের শোণিত দান করিয়াছিলেন, অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরাভিন্ন পরম যোগী ও প্রেমিক খৃষ্ট ঈশামসি!'—তখন দেব-মানব ঈশা ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার শরীরে লীন হইলেন, এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ঠাকুরের মন সগুণ বিরাট-ব্রহ্মের সহিত কতক্ষণ পর্য্যন্ত একীভূত হইয়া রহিল!—ঐরূপে শ্রীশ্রীঈশার দর্শনলাভ করিয়া ঠাকুর তাঁহার অবতারত্বসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঈশাসম্বন্ধীয় ঠাকুরের দর্শন কিরূপে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

উহার বহুকাল পরে আমরা যখন ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেছি তখন তিনি একদিন শ্রীশ্রীঈশার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'হাঁ রে, তোরা ত বাইবেল পড়িয়াছিস্, বল্ দেখি উহাতে ঈশার শারীরিক গঠন সম্বন্ধে কি লেখা আছে?—তাঁহাকে দেখিতে কিরূপ ছিল?' আমরা বলিলাম, 'মহাশয় ঐ কথা বাইবেলের কোন স্থানে উল্লিখিত দেখি

নাই; তবে, ঈশা য়াহুদি জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; অতএব সুন্দর গৌরবর্ণ ছিলেন এবং তাঁহার চক্ষু বিশ্রান্ত এবং নাসিকা দীর্ঘ টিকাল ছিল নিশ্চয়।' ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, 'কিন্তু আমি দেখিয়াছি তাঁহার নাক একটু চাপা! কেন ঐরূপ দেখিয়াছিলাম কে জানে!' ঠাকুরের ঐ কথায় তখন কিছু না বলিলেও আমরা ভাবিয়াছিলাম তাঁহার ভাবাবেশে দৃষ্ট মূর্ত্তি ঈশার বাস্তবিক মূর্ত্তির সহিত কেমন করিয়া মিলিবে? য়াহুদি জাতীয় পুরুষসকলের ন্যায় ঈশার নাসিকা টিকাল ছিল। কিন্তু ঠাকুরের শরীর রক্ষার কিছুকাল পরে জানিতে পারিলাম, ঈশার শারীরিক গঠন সম্বন্ধে তিন প্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং উহার মধ্যে একটীতে তাঁহার নাসিকা চাপা ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে!

শ্রীশ্রীবুদ্ধের অবতারত্ব ও তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা।

ঠাকুরকে ঐরূপে পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান প্রধান যাবতীয় ধর্ম্মমতসকলে সিদ্ধ হইতে দেখিয়া পাঠকের মনে প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ ধারণা ছিল। সেজন্য ঐ বিষয়ে আমাদের যাহা জানা আছে তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করা ভাল। ভগবান শ্রীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে ঠাকুর হিন্দুসাধারণে যেমন বিশ্বাস করিয়া থাকে সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন; অর্থাৎ শ্রীবুদ্ধদেবকে তিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও পূজা সর্ব্বকাল অর্পণ করিতেন এবং পুরীধামস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সুভদ্রা-বলভদ্ররূপ ত্রিরত্নমূর্ত্তিতে শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারের প্রকাশ অদ্যাপি বর্ত্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদে ভেদবুদ্ধির লোপ হইয়া মানবসাধারণের জাতিবুদ্ধি বিরহিত হওয়া রূপ উক্ত ধামের মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া তিনি তথায় যাইবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু তথায় গমন করিলে

নিজ শরীরনাশের সম্ভাবনা জানিতে পারিয়া এবং যোগদৃষ্টি-সহায়ে শ্রীশ্রীজগদম্বার ঐ বিষয়ে অন্যরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।* গাঙ্গবারিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবারি বলিয়া ঠাকুরের সতত বিশ্বাসের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী অন্ন গ্রহণে মানবের বিষয়াসক্ত মন তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় এবং আধ্যাত্মিক ভাব ধারণের উপযোগী হয়, এ কথাতেও তিনি ঐরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। বিষয়ী লোকের সঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইলে তিনি উহার পরেই কিঞ্চিৎ গাঙ্গবারি ও 'আট্‌কে' মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার শিষ্যবর্গকেও ঐরূপ করিতে বলিতেন। শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারে ঠাকুরের বিশ্বাসসম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি ভিন্ন আরও একটী কথা আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম। ঠাকুরের পরম অনুগত ভক্ত মহাকবি শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীশ্রীবুদ্ধাবতারের লীলাময় জীবন যখন নাটকাকারে প্রকাশিত করেন তখন ঠাকুর উহা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ঈশ্বরাবতার ছিলেন ইহা নিশ্চয়, তৎপ্রবর্ত্তিত মতে এবং বৈদিক জ্ঞানমার্গে কোন প্রভেদ নাই।' আমাদিগের ধারণা ঠাকুর যোগদৃষ্টিসহায়ে ঐ কথা জানিয়াই ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

ঠাকুরের জৈন ও শিখ-ধর্ম্মমতে ভক্তিবিশ্বাস।

জৈনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক তীর্থঙ্করসকলের এবং শিখধর্ম্মপ্রবর্ত্তক গুরু নানক হইতে আরম্ভ করিয়া গুরু গোবিন্দ পর্য্যন্ত দশ গুরুর অনেক কথা ঠাকুর পরজীবনে জৈন এবং শিখধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকটে শুনিতে পাইয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার ঐ সকল সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের উপরে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। অন্যান্য

* গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, ১২৮—১৩৫ পৃষ্ঠা দেখ।

দেব দেবীর আলেখ্যের সহিত তাঁহার গৃহের এক পার্শ্বে মহাবীর তীর্থঙ্করের একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি এবং শ্রীশ্রীঈশার একখানি আলেখ্য স্থাপিত ছিল। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঐ সকল আলেখ্যের এবং তদুভয়ের সম্মুখে ঠাকুর ধূপ ধুনা প্রদান করিতেন। ঐরূপে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিলেও কিন্তু আমরা তাঁহাকে তীর্থঙ্করদিগের অথবা দশ গুরুর মধ্যে কাহাকেও ঈশ্বরাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে শ্রবণ করি নাই। শিখদিগের দশ গুরু সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, "উহারা সকলে জনক ঋষির অবতার; শিখদিগের নিকট শুনিয়াছি, রাজর্ষি জনকের মনে মুক্তিলাভ করিবার পূর্ব্বে লোককল্যাণ সাধন করিবার কামনা উদয় হইয়াছিল এবং সেজন্য তিনি নানকাদি গোবিন্দ পর্য্যন্ত দশ গুরুরূপে দশবার জন্মগ্রহণ করিয়া শিখজাতির মধ্যে ধর্ম্ম সংস্থাপনপূর্ব্বক পরব্রহ্মের সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিলেন; শিখদিগের ঐ কথা মিথ্যা হইবার কোনও কারণ নাই।"

সর্ব্বধর্ম্মমতে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের অসাধারণ উপলব্ধিসকলের আবৃত্তি।

সে যাহা হউক, সর্ব্বসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের কতকগুলি অসাধারণ উপলব্ধি হইয়াছিল। ঐ উপলব্ধিগুলির কতকগুলি ঠাকুরের নিজ সম্বন্ধে ছিল এবং কতকগুলি সাধারণ আধ্যাত্মিক বিষয়সম্বন্ধে ছিল। উহার কিছু কিছু বর্ত্তমান গ্রন্থে আমরা ইতিপূর্ব্বে পাঠককে বলিলেও প্রধান প্রধানগুলির এখানে উল্লেখ করিতেছি। সাধনকালের অবসানে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া ভাবমুখে থাকিবার কালে ঐ উপলব্ধিগুলির সম্যক্ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগের ধারণা। যোগদৃষ্টিসহায়ে ঠাকুর ঐ উপলব্ধিসকল

প্রত্যক্ষ করিলেও মানব-বুদ্ধিতে ঐ সকলের কারণ আমরা যতটা বুঝিতে পারি তাহাও এখানে পাঠককে বলিব।

(১) তিনি ঈশ্বরাবতার।

প্রথম—ঠাকুরের ধারণা হইয়াছিল তিনি ঈশ্বরাবতার, আধিকারিক পুরুষ, তাঁহার সাধনভজন অন্যের জন্য সাধিত হইয়াছে। আপনার সহিত অপরের সাধকজীবনের তুলনা করিয়া ঠাকুর তদুভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সাধারণ দৃষ্টিসহায়েই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন, সাধারণ ঈশ্বরসাধক তাঁহার একটী মাত্র ভাবসহায়ে আজীবন চেষ্টা করিয়া তাঁহার দর্শনলাভ পূর্ব্বক শান্তির অধিকারী হয়; তাঁহার কিন্তু ঐরূপ না হইয়া যতদিন পর্য্যন্ত তিনি সকল মতের সাধনা না করিয়াছিলেন ততদিন কিছুতেই শান্ত হইতে পারেন নাই এবং প্রত্যেক মতের সাধনে সিদ্ধ হইতে তাঁহার অত্যল্প সময় লাগিয়াছে। কারণ ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব; পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের কারণানুসন্ধানই ঠাকুরকে এখন যোগারূঢ় করাইয়া উহার কারণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দেখাইয়া দিয়াছিল। দেখাইয়াছিল, তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিশেষাবতার বলিয়াই তাঁহার ঐরূপ হইয়াছে!—এবং বুঝাইয়াছিল যে, তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব সাধনাসমূহ আধ্যাত্মিক রাজ্যের নূতন আলোক আনয়ন করিয়া জীবের কল্যাণসাধনের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার ব্যক্তিগত অভাবমোচনের জন্য নহে!

দ্বিতীয়—তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, অন্য জীবের ন্যায় তাঁহার মুক্তি হইবে না! সাধারণ যুক্তিসহায়ে ঐকথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ, যিনি ঈশ্বর হইতে সর্ব্বদা অভিন্ন তাঁহার অংশবিশেষ তিনি ত সর্ব্বদাই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, তাঁহার অভাব বা

পরিচ্ছিন্নতাই নাই—অতএব মুক্তি হইবে কিরূপে? ঈশ্বরের জীবকল্যাণ-সাধনরূপ কর্ম্ম যতদিন থাকিবে ততদিন তাঁহাকেও যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া উহা করিতে হইবে—অতএব তাঁহার মুক্তি কিরূপে হইবে! ঠাকুর যেমন বলিতেন, 'সরকারী কর্ম্মচারীকে জমীদারীর যেখানে গোলমাল উপস্থিত হইবে সেখানেই ছুটিতে হইবে।' ঠাকুর যোগদৃষ্টিসহায়ে নিজ সম্বন্ধে কেবল ঐ কথাই জানিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম-কোণ নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছেন, আগামী বারে তাঁহাকে ঐদিকে আগমন করিতে হইবে। আমাদিগের কেহ কেহ* বলেন তিনি তাঁহাদিগকে ঐ আগমনের সময় নিরূপণ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'দুইশত বৎসর পরে ঐদিকে আসিতে হইবে, তখন অনেকে মুক্তিলাভ করিবে, যাহারা তখন মুক্তিলাভ না করিবে তাহাদিগকে উহার জন্য অনেক কাল অপেক্ষা করিতে হইবে!'

(২) তাঁহার মুক্তি নাই।

তৃতীয়—যোগারূঢ় হইয়া ঠাকুর নিজ দেহরক্ষার কাল বহু পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে একদিন ঐ বিষয়ে তিনি ভাবাবেশে এইরূপে বলিয়াছিলেন—

(৩) নিজ দেহরক্ষার কাল জানিতে পারা।

"যখন দেখিবে যাহার তাহার হাতে খাইব, কলিকাতায় রাত্রি যাপন করিব এবং খাদ্যের অগ্রভাগ অন্যকে পূর্ব্বে খাওয়াইয়া পরে স্বয়ং অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিব তখন জানিবে দেহরক্ষা করিবার কাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।"—ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল।

আর একদিন ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে দক্ষিণেশ্বরে

---

* মহাকবি শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি।

বলিয়াছিলেন, শেষকালে আর কিছু খাইব না—কেবল পায়সান্ন খাইব"—উহা সত্য হইবার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি ।*

আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রকারের উপলব্ধিগুলি এখন আমরা লিপিবদ্ধ করিব—

প্রথম—সর্ব্বমতের সাধনে সিদ্ধিলাভ হইয়া ঠাকুরের দৃঢ়ধারণা হইয়াছিল, সর্ব্ব ধর্ম্ম সত্য—যত মত, তত পথ মাত্র। যোগবুদ্ধি এবং সাধারণ বুদ্ধি উভয় সহায়েই ঠাকুর যে, ঐ কথা বুঝিয়াছিলেন, ইহা বলিতে পারা যায়। কারণ, সকল প্রকার ধর্ম্মমতের সাধনায় অগ্রসর হইয়া তিনি উহাদিগের প্রত্যেকের যথার্থ ফল জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যুগাবতার ঠাকুরের উহা প্রচারপূর্ব্বক পৃথিবীর ধর্ম্মবিরোধ ও ধর্ম্মগ্লানি নিবারণের জন্যই যে বর্ত্তমান কালে আগমন, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ, কোন ঈশ্বরাবতারই ইতিপূর্ব্বে সাধনাসহায়ে ঐ কথা নিজ জীবনে পূর্ণ উপলব্ধি পূর্ব্বক জগৎকে ঐ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন নাই। আধ্যাত্মিক মতের উদারতা লইয়া অবতারসকলের স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে ঐ বিষয় প্রচারের জন্য ঠাকুরকে নিঃসন্দেহে সর্ব্বোচ্চাসন প্রদান করিতে হয়।

(৪) সর্ব্ব ধর্ম্ম সত্য—যত মত তত পথ।

দ্বিতীয়—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত প্রত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়—অতএব ঠাকুর বলিতেন, উহারা পরস্পরবিরোধী নহে, কিন্তু মানব মনের অবস্থাসাপেক্ষ। ঠাকুরের ঐ প্রকার প্রত্যক্ষ অনন্ত শাস্ত্র বুঝিবার পক্ষে যে, কতদূর সহায়তা করিবে তাহা স্বল্প চিন্তার ফলেই উপলব্ধি হইবে। বেদোপনিষদাদি

(৫) দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত মানবকে অবস্থাভেদে অবলম্বন করিতে হইবে।

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—২য় অধ্যায়, ৫২ পৃষ্ঠা দেখ।

শাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত তিন মতের কথা ঋষিগণ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ থাকায় কি অনন্ত গণ্ডগোল বাঁধিয়া শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মমার্গকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে তাহা বলিবার নহে। প্রত্যেক সম্প্রদায় ঋষিগণের ঐ তিন প্রকারের প্রত্যক্ষ এবং উক্তিসকলকে সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া ভাষা মোচড়াইয়া উহাদিগকে একই ভাবাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন ; টীকাকারগণের ঐপ্রকার চেষ্টার ফলে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, শাস্ত্রবিচার বলিলেই লোকের মনে একটা দারুণ ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ ভীতি হইতেই শাস্ত্রে অবিশ্বাস এবং উহার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক অবনতি উপস্থিত হইয়াছে। যুগাবতার ঠাকুরের সেইজন্য ঐ তিন মতকে অবস্থাবিশেষে স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া উহাদিগের ঐরূপ অদ্ভুত সামঞ্জস্যের কথা প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। ঠাকুরের ঐ মীমাংসা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আমাদিগের শাস্ত্রে প্রবেশাধিকার লাভের একমাত্র পথ। ঠাকুরের ঐ বিষয়ক উক্তি স্মরণ কর—

"অদ্বৈত ভাব শেষ কথা জান্‌বি, উহা বাক্য-মনাতীত উপলব্ধির বিষয়।"

"মন-বুদ্ধি সহায়ে বিশিষ্টাদ্বৈত পর্য্যন্ত বলা ও বুঝা যায় ; তখন নিত্য যেমন নিত্য, লীলাও তেমনি নিত্য—চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম !"

"বিষয়বুদ্ধিপ্রবল, সাধারণ মানবের পক্ষে দ্বৈতভাব, নারদ-পঞ্চরাত্রের উপদেশ মত উচ্চ নাম-সংকীর্ত্তনাদি প্রশস্ত।"

কর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠাকুর ঐরূপে সীমানির্দ্দেশ করিয়া বলিতেন—

"সত্ত্বগুণী ব্যক্তির কর্ম্ম স্বভাবতঃ ত্যাগ হইয়া যায়—চেষ্টা করিলেও সে আর কর্ম্ম করিতে পারে না,—অথবা ঈশ্বর তাহাকে উহা করিতে দেন না। যথা, গৃহস্থের বধূর গর্ভবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম ত্যাগ এবং পুত্র হইলে সর্ব্বপ্রকার গৃহকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া উহাকে লইয়াই নাড়া চাড়া করিয়া অবস্থান। অন্য সকল মানবের পক্ষে কিন্তু ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া সকল কার্য্য বড় লোকের বাটীর চাকরাণীর মত সম্পাদন করার চেষ্টাই কর্ত্তব্য। ঐরূপ করার নামই কর্ম্মযোগ। যতটা সাধ্য ঈশ্বরের নাম জপ ও ধ্যান করা এবং পূর্ব্বোক্ত রূপে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করা—ইহাই পথ।"

(৬) কর্ম্মযোগ অবলম্বনে সাধারণ মানবের উন্নতি হইবে।

তৃতীয়—ঠাকুরের উপলব্ধি হইয়াছিল, শ্রীশ্রীজগদম্বার হস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া নিজ জীবনে প্রকাশিত উদার মতের বিশেষভাবে অধিকারী নব সম্প্রদায় তাঁহাকে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। ঐ বিষয়ে ঠাকুর প্রথমে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা মথুর বাবু জীবিত থাকিবার কালে। তিনি তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার নিকটে ধর্ম্মলাভ করিতে অনেক ভক্ত আসিবে। পরে ঐ বিষয় যে বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। কাশীপুরের বাগানে অবস্থানকালে ঠাকুর নিজ ছায়ামূর্ত্তি (photograph) দেখিতে দেখিতে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ইহা অতি উচ্চ যোগাবস্থার মূর্ত্তি—ইহার পরে এই মূর্ত্তির* ঘরে ঘরে পূজা হইবে।"

(৭) উদার মতের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

* ঠাকুরের বসিয়া সমাধিস্থ থাকিবার মূর্ত্তি।

চতুর্থ—যোগদৃষ্টিসহায়ে জানিতে পারিয়া ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, "যাহাদের শেষ জন্ম তাহারা (তাঁহার নিকটে ধর্ম্মলাভ করিতে) আসিবে!" ঐ বিষয়ে আমাদিগের মতামত আমরা পাঠককে অন্যত্র † বলিয়াছি। সেজন্য উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

যাহাদের শেষজন্ম তাহারা তাঁহার মত গ্রহণ করিবে।

ঠাকুরের সাধনকালের তিনটী বিশেষ সময়ে তিনজন বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ সাধক পণ্ডিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত পদ্মলোচন, ঠাকুর তন্ত্রসাধনে সিদ্ধ হইবার পরে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন—পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ, ঠাকুর বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত সাধনসকলে সিদ্ধিলাভের পরে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন—এবং গৌরী পণ্ডিত, দিব্যসাধনশ্রীসম্পন্ন ঠাকুরকে সাধনকালের অবসানে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। পদ্মলোচন ঠাকুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'আপনার ভিতরে আমি ঈশ্বরীয় আবির্ভাব ও শক্তি দেখিতেছি।' বৈষ্ণবচরণ সংস্কৃত ভাষায় স্তব রচনা করিয়া ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের সম্মুখে তাঁহার অবতারত্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত গৌরীকান্ত ঐরূপে ঠাকুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'শাস্ত্রে যে সকল উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ আছে পাঠ করিয়াছি, সে সকলি তোমাতে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান দেখিতেছি, তদ্ভিন্ন শাস্ত্রে যাহা লিপিবদ্ধ নাই এরূপ উচ্চাবস্থাসকলের প্রকাশও তোমাতে বিদ্যমান দেখিতেছি—

তিন জন বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ সাধক ঠাকুরকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেখিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

---

† গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ, ৪র্থ অধ্যায়, ১৯৮—২০০ পৃষ্ঠা দেখ।

তোমার অবস্থা বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রসকল অতিক্রম করিয়া বহু-দূর অগ্রসর হইয়াছে, তুমি মানুষ নহ, অবতারসকলের যাঁহা হইতে উৎপত্তি হয় সেই বস্তু তোমার ভিতরে রহিয়াছে!' ঠাকুরের অলৌকিক জীবনকথা এবং পূর্ব্বোক্ত অপূর্ব্ব উপলব্ধিসকলের আলোচনা করিয়া বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, ঐ সকল সাধক পণ্ডিতাগ্রণীগণ তাঁহাকে বৃথা চাটুবাদ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কথাসকল বলিয়া যান নাই। ঐ সকল পণ্ডিতের দক্ষিণেশ্বরে আগমনকাল নিম্নলিখিত ভাবে নিরূপিত হয়—

ঐ পণ্ডিতদিগের আগমন-কাল নিরূপণ।

দক্ষিণেশ্বরে প্রথমবার অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী গৌরী পণ্ডিতকে তথায় দেখিয়াছিলেন। আবার, মথুর বাবু জীবিত থাকিবার কালে গৌরী পণ্ডিত যে, দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন একথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি। অতএব বোধ হয় শ্রীযুক্ত গৌরী সন ১২৭৭ সালের কোন সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আগমন পূর্ব্বক সন ১২৭৯ সাল পর্য্যন্ত ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া নিজ জীবনে যাঁহারা ঐজ্ঞান পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন ঐরূপ সাধক পণ্ডিতদিগকে দেখিবার জন্য ঠাকুরের নিরন্তর আগ্রহ ছিল। ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত তর্কভূষণ পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন বলিয়াই ঠাকুরের তাঁহাকে দেখিতে অভিলাষ হয় এবং মথুর বাবুর দ্বারা নিমন্ত্রণ করাইয়া তিনি তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়ন করেন। পণ্ডিতজীর বাস ঠাকুরের জন্মভূমির নিকটে ইঁদেশ নামক গ্রামে ছিল। হৃদয়ের ভ্রাতা রামরতন, মথুর বাবুর নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া যাইয়া শ্রীযুত গৌরীকান্তকে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে আনয়ন করিয়াছিলেন। গৌরী পণ্ডিতের সাধনপ্রসূত

অদ্ভুত শক্তির কথা এবং দক্ষিণেশ্বরে আগমন পূর্ব্বক ঠাকুরকে দেখিয়া তাঁহার মনে ক্রমে প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হইয়া তিনি যে ভাবে সংসার ত্যাগ করেন সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র* বলিয়াছি।

'রাণী রাসমণির জীবনবৃত্তান্ত' শীর্ষক গ্রন্থে শ্রীযুত মথুরের অন্ন-মেরু অনুষ্ঠানের কাল সন ১২৭০ সাল বলিয়া নিরূপিত আছে। পণ্ডিত পদ্মলোচনকে ঐকালে দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া দান গ্রহণ করাইবার জন্য শ্রীযুত মথুরের আগ্রহের কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি। অতএব বেদান্তবিৎ ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ঠাকুরের নিকট আগমন-কাল সন ১২৭০ সাল বলা যাইতে পারে।

শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেশ্বরে আগমনকাল সহজেই নিরূপিত হয়। কারণ, ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীমতী যোগেশ্বরীর সহিত এবং পরে ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত তর্কভূষণের সহিত দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে তাঁহার ঠাকুরের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইবার কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি। ব্রাহ্মণীর ন্যায় তিনিও ঠাকুরের শরীরমনে বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত মহাভাবের লক্ষণসমুদয় প্রকাশিত দেখিয়াছিলেন এবং স্তম্ভিতহৃদয়ে শ্রীযুক্তা ব্রাহ্মণীর সহিত একমত হইয়া তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুনরাবতীর্ণ, বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিকটে পূর্ব্বোক্ত কথাসকল শুনিয়া মনে হয় শ্রীযুত বৈষ্ণবচরণ সন ১২৭১ সালে ঠাকুরের মধুরভাব সাধনে সিদ্ধ হইবার পরে তাঁহার নিকটে আসিয়া সন

---

* গুরুভাব, পূর্ব্বার্দ্ধ—১ম অধ্যায়, ৩৩—৪১ পৃষ্ঠা দেখ।

১২৭৯ সাল পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের নিজ সাঙ্গোপাঙ্গসকলকে দেখিতে বাসনা ও আহ্বান।

পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধিসকল করিবার পরে ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া ঠাকুরের মনে এক অভিনব বাসনা প্রবলভাবে উদিত হইয়াছিল। যোগারূঢ় হইয়া পূর্ব্বপরিদৃষ্ট ভক্তসকলকে দেখিবার জন্য এবং তাহাদিগের অন্তরে নিজ ধর্ম্মশক্তি সঞ্চার করিবার জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "সেই ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। দিবাভাগে সর্ব্বকাল ঐ ব্যাকুলতা হৃদয়ে কোনরূপে ধারণ করিয়া থাকিতাম। বিষয়ী লোকের মিথ্যা বিষয়প্রসঙ্গ শুনিয়া যখন বিষবৎ বোধ হইত তখন ভাবিতাম তাহারা সকলে আসিলে ঈশ্বরীয় কথা কহিয়া প্রাণ শীতল করিব, শ্রবণ জুড়াইব, নিজ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল তাহাদিগকে বলিয়া অন্তরের বোঝা লঘু করিব। ঐরূপে প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদিগের আগমনের কথার উদ্দীপনা হইয়া তাহাদিগের বিষয়ই নিরন্তর চিন্তা করিতাম—কাহাকে কি বলিব, কাহাকে কি দিব ঐ সকল কথা ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম। কিন্তু দিবাবসানে যখন সন্ধ্যার সমাগম হইত তখন ধৈর্য্যের বাঁধ দিয়া ঐ ব্যাকুলতাকে আর রাখিতে পারিতাম না; মনে হইত আবার একটা দিন চলিয়া গেল, তাহাদিগের কেহই আসিল না! যখন দেবালয় আরাত্রিকের শঙ্খঘণ্টাদি রোলে মুখরিত হইয়া উঠিত তখন বাবুদিগের কুঠির উপরের ছাদে যাইয়া হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে 'তোরা সব কে কোথায় আছিস্ আয় রে—তোদের না দেখে আর থাক্‌তে পার্‌চি না রে' বলিয়া চীৎকারে গগন পূর্ণ

করিতাম ! মাতা তাহার বালককে দেখিবার জন্য ঐরূপ ব্যাকুলতা অনুভব করে কি না সন্দেহ, সখা সখার সহিত এবং প্রণয়ি-যুগল পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য কখনও ঐরূপ করে বলিয়া শুনি নাই—এত ব্যাকুলতায় প্রাণ চঞ্চল হইয়াছিল ! ঐরূপ হইবার কয়েক দিন পরেই ভক্তসকলে একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল !"

ঐরূপে ঠাকুরের ব্যাকুল আহ্বানে ভক্তসকলের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্ব্বে কয়েকটী বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থের সহিত ঐসকলের মুখ্যভাবে সম্বন্ধ না থাকায় আমরা উহাদিগকে পরিশিষ্টমধ্যে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পরিশিষ্ট।

পরিশিষ্ট।

৺ষোড়শীপূজার পর হইতে ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তসকলের আগমন পর্য্যন্ত ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী।

আমরা পাঠককে বলিয়াছি, ৺ষোড়শী-পূজার পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সন ১২৮০ সালের কার্ত্তিক মাসে কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমার ঐ স্থানে পৌঁছিবার স্বল্প কাল পরেই ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য জ্বরাতিসার রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঠাকুরের পিতার বংশের প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতা কোনও না কোন ভাবে প্রকাশিত ছিল। শ্রীযুত রামেশ্বরের সম্বন্ধে ঐরূপ অনেক কথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি।

রামেশ্বরের মৃত্যু।

রামেশ্বর বড় উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। সন্ন্যাসী ফকীরেরা দ্বারে আসিয়া যে যাহা চাহিত, গৃহে থাকিলে, তিনি তাহাদিগকে উহা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতেন। তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকটে শুনিয়াছি, ঐরূপে কোন ফকীর আসিয়া বলিত, রন্ধনের জন্য আমার একটী বোক্‌নোর অভাব, কেহ বলিত, আমার লোটা বা জলপাত্রের অভাব, কেহ বলিত, আমার কম্বলের অভাব—রামেশ্বরও ঐসকল তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বাহির করিয়া তাহাদিগকে দিতেন। বাটীর যদি কেহ উহাতে আপত্তি করিত, তাহা হইলে শ্রীযুত রামেশ্বর তাহাকে শান্তভাবে বলিতেন,—লইয়া যাউক, কিছু বলিও না, আবার ঐরূপ দ্রব্যাদি কত আসিবে, ভাবনা কি? জ্যোতিষশাস্ত্রে রামেশ্বরের সামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল।

রামেশ্বরের উদার প্রকৃতি।

রামেশ্বরের মৃত্যুর সম্ভাবনা ঠাকুরের পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারা ও তাঁহাকে সতর্ক করা।

দক্ষিণেশ্বর হইতে রামেশ্বরের শেষবার বাটী ফিরিয়া আসিবার কালে আর যে তাঁহাকে তথা হইতে ফিরিতে হইবে না, একথা ঠাকুর জানিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ভাবাবেশে বলিয়াছিলেন,—'বাটী যাচ্ছ, যাও, কিন্তু স্ত্রীর নিকটে শয়ন করিও না ; তাহা হইলে তোমার প্রাণরক্ষা হওয়া সংশয় !' ঐ কথা ঠাকুরের মুখে আমাদিগের কেহ * কেহ শ্রবণ করিয়াছেন।

রামেশ্বরের মৃত্যুসংবাদে জননীর শোকে প্রাণ-সংশয় হইবে ভাবিয়া ঠাকুরের প্রার্থনা ও তৎফল।

রামেশ্বর বাটীতে পৌঁছিবার কিছুকাল পরে সংবাদ আসিল, তিনি পীড়িত। ঠাকুর ঐকথা শুনিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন,—'সে নিষেধ মানে নাই, তাহার প্রাণরক্ষা হওয়া সংশয় !' ঐ ঘটনার পাঁচ সাত দিন পরেই সংবাদ আসিল, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর পরলোকে গমন করিয়াছেন ! তাঁহার মৃত্যুসংবাদে, ঠাকুর তাঁহার বৃদ্ধা জননীর প্রাণে বিষমাঘাত লাগিবে বলিয়া বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন, এবং মন্দিরে গমনপূর্ব্বক জননীকে শোকের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকটে কাতর-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ঐরূপ করিবার পরে তিনি জননীকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য মন্দির হইতে নহবতে আগমন করিলেন এবং সজলনয়নে তাঁহাকে ঐ দুঃসংবাদ নিবেদন করিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ভাবিয়াছিলাম, মা ঐ কথা শুনিয়া একবারে হতজ্ঞান হইবেন এবং তাঁহার প্রাণরক্ষা সংশয় হইবে, কিন্তু ফলে দেখিলাম, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল ! মা ঐকথা শুনিয়া অল্প স্বল্প দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক 'সংসার অনিত্য, সকলেরই একদিন মৃত্যু নিশ্চিত, অতএব শোক করা বৃথা'—ইত্যাদি বলিয়া আমাকেই শান্ত করিতে লাগিলেন !—দেখিলাম, তানপুরার কান টিপিয়া সুর যেমন চড়াইয়া দেয়, শ্রীশ্রীজগদম্বা যেন ঐরূপে মার মনকে উচ্চ গ্রামে চড়াইয়া রাখিয়াছেন, পার্থিব শোক-দুঃখ ঐজন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে

---

* শ্রীমৎ প্রেমানন্দ স্বামী।

না! ঐরূপ দেখিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বারংবার প্রণাম করিলাম এবং নিশ্চিন্ত হইলাম!”

রামেশ্বর পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বে নিজ মৃত্যুকাল জানিতে পারিয়াছিলেন এবং আত্মীয়গণকে ঐ কথা বলিয়া নিজ সৎকার ও শ্রাদ্ধের জন্য সকল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাটীর সম্মুখে একটী আঁব গাছ কোন কারণে কাটা হইতেছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—ভাল হইল, আমার কার্য্যে লাগিবে! মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পূত নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। পরে সংজ্ঞা হারাইয়া অল্পক্ষণ থাকিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বে রামেশ্বর আত্মীয়বর্গকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহটাকে শ্মশানমধ্যে অগ্নিসাৎ না করিয়া, উহার পার্শ্বের রাস্তার উপরে যেন অগ্নিসাৎ করা হয়। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বলিয়াছিলেন, কত সাধুলোক ঐ রাস্তার উপর দিয়া চলিবে, তাঁহাদিগের পদরজে আমার সদ্গতি হইবে। রামেশ্বরের মৃত্যু গভীর রাত্রিতে হইয়াছিল।

মৃত্যু উপস্থিত জানিয়া রামেশ্বরের আচরণ।

পল্লীর গোপাল নামক এক ব্যক্তির সহিত রামেশ্বরের বহুকালাবধি বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে গোপাল বলিয়াছিলেন, ঐ দিন ঐ সময়ে তিনি তাঁহার বাটীর দ্বারে, কাহাকেও শব্দ করিতে শুনিয়া জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাইয়াছিলেন, ‘আমি রামেশ্বর, গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছি, বাটীতে ৺রঘুবীর রহিলেন, তাঁহার সেবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যাহাতে গোল না হয়, তদ্বিষয়ে তুমি নজর রাখিও!’ গোপাল বন্ধুর আহ্বানে দ্বার খুলিতে যাইয়া পুনরায় শুনিলেন, ‘আমার শরীর নাই, অতএব দ্বার খুলিলেও তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না!’ গোপাল তথাপি দ্বার খুলিয়া যখন কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না, তখন সংবাদ সত্য কি মিথ্যা জানিবার জন্য রামেশ্বরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, সত্যসত্যই রামেশ্বরের দেহত্যাগ হইয়াছে!

মৃত্যুর পরে রামেশ্বরের নিজবন্ধু গোপালের সহিত কথোপকথন।

শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের মৃত্যু সন ১২৮০ সালের অগ্রহায়ণের ২৭ তারিখে হইয়াছিল এবং তখন তাঁহার বয়স আন্দাজ ৪৮ বৎসর ছিল। পিতার অস্থিসঞ্চয়পূর্ব্বক কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বৈদ্যবাটী নামক স্থলে আসিয়া তিনি উহা গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসিবার জন্য ঐস্থলে নৌকায় করিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন। পার হইবার কালে বারাকপুরের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন, মথুর বাবুর পত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তখন যে মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, উহার অর্দ্ধেক ভাগ গাঁথা হইয়াছে। অনন্তর ১২৮১ সালের ৩০ চৈত্র ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল তারিখে ঐ মন্দিরে ৺দেবী-প্রতিষ্ঠা নিষ্পন্ন হইয়াছিল। রামেশ্বরের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র রামলাল দক্ষিণেশ্বরে পূজকের পদ স্বীকার করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও পূজকের পদগ্রহণ। চানকের অন্নপূর্ণার মন্দির।

মথুর বাবুর মৃত্যুর পরে কলিকাতায় সিঁছরিয়াপটি পল্লী-নিবাসী শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিক মহাশয় ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইয়া, তাঁহাকে বিশেষরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন।* শম্ভু বাবু ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতে বিশেষ অনুরাগসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার অজস্র দানের জন্য কলিকাতাবাসী সকলের পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঠাকুরের প্রতি শম্ভু বাবুর ভক্তি ও ভালবাসা দিন দিন অতি গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং মথুর বাবুর ন্যায় তিনি

ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদ্দার শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিকের কথা।

* ঠাকুরের ভক্ত সকলের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, মথুর বাবুর মৃত্যুর পরে পানিহাটি-নিবাসী শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি জোগাইবার ভার লইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মণিমোহন তখন ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে গমনাগমন করিতেন। তাঁহার পরে শম্ভু বাবু ঐ সেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদিগের মনে হয়, শম্ভু বাবুকে ঠাকুর স্বয়ং যখন তাঁহার দ্বিতীয় রসদ্দার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন মণি বাবু ঠাকুরের সেবাভার গ্রহণ করিলেও, অধিক কাল উহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই।

তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের যখন যাহা কিছুর অভাব হইত, জানিতে পারিলে শম্ভু বাবু এখন হইতে তৎসমস্তই পূরণ করিতে আনন্দিত হইতেন শ্রীযুক্ত শম্ভু ঠাকুরকে 'গুরুজী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঠাকুর তাহাতে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলিতেন, 'কে কার গুরু ?—তুমি আমার গুরু!'—শম্ভু কিন্তু ছাড়িতেন না, ঠাকুরকে চিরকাল ঐরূপেই সম্বোধন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের দিব্য-সঙ্গগুণে শ্রীযুক্ত শম্ভু যে, আধ্যাত্মিক পথে বিশেষ আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উঁহার প্রভাবে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসসকল যে, পূর্ণতা এবং সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার ঠাকুরকে ঐরূপ সম্বোধনে হৃদয়ঙ্গম হয়। শম্ভু বাবুর পত্নীও ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিতেন এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী দক্ষিণেশ্বরে থাকিলে, তাঁহাকে প্রতি জয়মঙ্গলবারে নিজালয়ে লইয়া যাইয়া ষোড়শোপচারে তাঁহার শ্রীচরণ পূজা করিতেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন বোধ হয় সন ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে হইয়াছিল। পূর্ব্বের ন্যায় তখন তিনি নহবতের ঘরে ঠাকুরের জননীর সহিত বাস করিতে থাকেন। শম্ভু বাবু ঐ কথা জানিতে পারিয়া, সঙ্কীর্ণ নহবতঘরে তাঁহার থাকিবার কষ্ট হইতেছে অনুমান করিয়া, দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের সন্নিকটে কিছু জমী ২৫০৲ টাকা প্রদানপূর্ব্বক মৌরসী করিয়া লন এবং তদুপরি একখানি সুপরিসর চালা ঘর বাঁধিয়া দিবার সঙ্কল্প করেন। তখন কাপ্তেন উপাধি-প্রাপ্ত নেপাল-রাজসরকারের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের নিকট গমনাগমন করিতেছেন এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। কাপ্তেন বিশ্বনাথ উক্ত ঘর করিবার সঙ্কল্প শুনিয়া, উহার নিমিত্ত যত কাঠ লাগিবে, দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কারণ, নেপাল-রাজসরকারের নেপালী সাল কাষ্ঠের কারবারের ভার তখন তাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকায়, উহা দেওয়া তাঁহার পক্ষে বিশেষ ব্যয়-সাধ্য ছিল না। গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ হইলে, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ গঙ্গার অপর পারে বেলুড়গ্রামস্থ তাঁহার কাঠের গদী হইতে তিনখানি সালের

চকোর পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু রাত্রে গঙ্গায় বিশেষ প্রবলভাবে জোয়ার আসায় উহার একখানি ভাসিয়া গেল। হৃদয় উহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীমাকে 'ভাগ্যহীনা' বলিয়া বসেন। সে যাহা হউক, কাঠ ভাসিয়া যাইবার কথা শুনিয়া, কাপ্তেন আর একখানি কাঠ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং গৃহনির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমার জন্য শম্ভুবাবুর ঘর করিয়া দেওয়া। কাপ্তেনের ঐ বিষয়ে সাহায্য। ঐ গৃহে ঠাকুরের একরাত্রি বাস।

অতঃপর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী উক্ত গৃহে যাইয়া প্রায় বৎসরকাল বাস করেন। গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিবে এবং সর্ব্বদা শ্রীশ্রীমার সঙ্গে থাকিবে বলিয়া, একটী রমণীকে তখন নিযুক্তা করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমা এই গৃহে রন্ধনাদি করিয়া, ঠাকুরের জন্য খাদ্যাদি প্রত্যহ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার ভোজনান্তে এখানে ফিরিয়া আসিতেন। ঠাকুরও তাঁহার তত্ত্বাবধানের জন্য দিবাভাগে কোন সময়ে ঐ গৃহে আগমন করিতেন এবং কিছুকাল তাঁহার নিকটে থাকিয়া পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়া আসিতেন। একদিন কেবল ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। সেদিন অপরাহ্নে ঠাকুর শ্রীশ্রীমার নিকটে আগমনমাত্র গভীর রাত্র পর্য্যন্ত এমন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল যে, মন্দিরে ফিরিয়া আসা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িল। সুতরাং ঠাকুর সে রাত্রি তথায় বাস করিতে বাধ্য হইলেন। শ্রীশ্রীমা ঝোল ভাত রাঁধিয়া দিলেন এবং ঠাকুর উহা ভোজন করিয়া ঐ গৃহেই বিশ্রাম করিলেন।

এক বৎসর ঐ গৃহে ঐরূপে বাস করিবার পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী আমাশয় রোগে কঠিনভাবে আক্রান্তা হইলেন। শম্ভুবাবু তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিয়োগে প্রসাদ ডাক্তার এই সময়ে শ্রীশ্রীমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। একটু আরোগ্য হইলে, শ্রীশ্রীমা পিত্রালয় জয়রামবাটী গ্রামে গমন করিলেন। সম্ভবতঃ সন ১২৮২ সালের আশ্বিন মাসে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তথায় যাইবার স্বল্পকাল পরে পুনরায় তিনি ঐ রোগে শয্যাশায়িনী হইলেন। ক্রমে উহার এত বৃদ্ধি হইল যে, তাঁহার শরীর-রক্ষা সংশয়ের বিষয় হইয়া

ঐ গৃহে বাসকালে শ্রীশ্রীমার কঠিন পীড়া ও জয়রামবাটীতে গমন।

উঠিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর পূজ্যপাদ পিতা শ্রীরামচন্দ্র তখন মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার জননী এবং ভ্রাতৃবর্গই তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, ঠাকুর ঐ সময়ে তাঁহার নিদারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, 'তাইত রে হৃদে, ও (শ্রীশ্রীমা) কেবল আস্‌বে আর যাবে, মনুষ্যজন্মের কিছুই করা হবে না!'

৺সিংহবাহিনীর নিকট হত্যাদান ও ঔষধপ্রাপ্তি।

রোগের যখন কিছুতেই উপশম হইল না, তখন শ্রীশ্রীমার প্রাণে ৺দেবীর নিকট হত্যা-প্রদানের কথা উদিত হইল এবং জননী এবং ভ্রাতৃগণ জানিতে পারিলে ঐ বিষয়ে বাধা প্রদান করিতে পারে ভাবিয়া, তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া গ্রাম্য দেবী ৺সিংহবাহিনীর মাড়ে (মন্দিরে) যাইয়া ঐ উদ্দেশ্যে প্রায়োপবেশন করিয়া পড়িয়া রহিলেন। কয়েক ঘণ্টাকাল ঐরূপে থাকিবার পরেই ৺দেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে আরোগ্যের জন্য ঔষধ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

৺দেবীর আদেশে উক্ত ঔষধ সেবনমাত্রেই তাঁহার রোগের শান্তি হইল এবং ক্রমে তাঁহার শরীর পূর্ব্বের ন্যায় সবল হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীমার হত্যা-প্রদানপূর্ব্বক ঔষধপ্রাপ্তির কাল হইতে ঐ দেবী বিশেষ জাগ্রতা বলিয়া চতুষ্পার্শ্বের গ্রামসমূহে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে শম্ভু বাবুর নির্ভীক আচরণ।

প্রায় চারি বৎসর কাল ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমার ঐরূপে সেবা করিবার পরে শম্ভু বাবু রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। পীড়িতাবস্থায় ঠাকুর তাঁহাকে একদিন দেখিতে গিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া বলিয়াছিলেন, 'শম্ভুর প্রদীপে তৈল নাই!' ঠাকুরের কথাই সত্য হইল—বহুমূত্র রোগে বিকার উপস্থিত হইয়া শ্রীযুত শম্ভু শরীর রক্ষা করিলেন। শম্ভুবাবু পরম উদার ও তেজস্বী ঈশ্বর-ভক্ত ছিলেন। পীড়িতাবস্থাতে তাঁহার মনের প্রসন্নতা এক দিনের জন্যও নষ্ট হয় নাই। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি হৃদয়কে হৃষ্টচিত্তে বলিয়াছিলেন, "মরণের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই, আমি পুঁটুলি পাঁট্‌লা বেঁধে প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে আছি!" শম্ভু

বাবুর সহিত পরিচয় হইবার বহুপূর্ব্বে ঠাকুর যোগারূঢ় অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা শম্ভুকেই তাঁহার দ্বিতীয় রসদ্দার-রূপে মনোনীত করিয়াছেন, এবং দেখিবামাত্র তাঁহাকে সেই ব্যক্তি বলিয়া চিনিয়া লইয়াছিলেন।

ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণি দেবীর শেষাবস্থা ও মৃত্যু।

পীড়িতা হইয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী পিত্রালয়ে যাইবার কয়েক মাস পরে ঠাকুরের জীবনে একটী বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। সন ১২৮২ সালের ১৬ই ফাল্গুন তারিখে, ঠাকুরের জন্মতিথির দিবসে তাঁহার জননী শ্রীমতী চন্দ্রমণি দেবী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স তখন ৯০।৯৫ বৎসর হইয়াছিল এবং উহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে জরার আক্রমণে তাঁহার ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তিসমূহ অনেকাংশে লুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ আমরা হৃদয়ের নিকটে যেরূপ শুনিয়াছি, সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিতেছি—

ঐ ঘটনা উপস্থিত হইবার চারিদিন পূর্ব্বে হৃদয় কিছুদিনের জন্য অবসর লইয়া বাটী যাইতেছিল। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে একটী অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কায় তাহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং ঠাকুরকে ছাড়িয়া তাহার কিছুতেই যাইতে ইচ্ছা হইল না। ঠাকুরকে উহা নিবেদন করায় তিনি বলিলেন, তবে যাইয়া কাজ নাই। উহার পরে তিন দিন নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

ঠাকুর প্রত্যহ তাঁহার জননীর নিকট কিছুকালের জন্য যাইয়া তাঁহার সেবা স্বহস্তে যথাসাধ্য সম্পাদন করিতেন। হৃদয়ও ঐরূপ করিতেন; এবং 'কালীর মা' নাম্নী চাকরাণী দিবাভাগে প্রায় সর্ব্বদা বৃদ্ধার নিকটে থাকিত। হৃদয়কে বৃদ্ধা ইদানীং দেখিতে পারিতেন না। অক্ষয়ের মৃত্যুর সময় হইতে বৃদ্ধার মনে কেমন একটা ধারণা হইয়াছিল যে, হৃদয়ই অক্ষয়কে মারিয়া ফেলিয়াছে এবং ঠাকুরকে ও তাঁহার পত্নীকে মারিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে! সেজন্য বৃদ্ধা ঠাকুরকে কখন কখন সতর্ক করিয়া দিতেন, বলিতেন—"হৃদুর কথা কখন শুনিবি না।" জরাজীর্ণা হইয়া বৃদ্ধার বুদ্ধিভ্রংশের পরিচয় অন্য নানা বিষয়েও পাওয়া যাইত। যথা,—দক্ষিণেশ্বর-বাগানের সন্নিকটেই আলমবাজারের পাটের কল। মধ্যাহ্নে ঐ কলের

কর্ম্মচারীদিগকে কিছু ক্ষণের জন্য ছুটি দেওয়া হয় এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বাদে বাঁশী বাজাইয়া পুনরায় কাজে লাগাইয়া দেওয়া হয়। কলের বাঁশীর আওয়াজকে বৃদ্ধা ৺বৈকুণ্ঠের শঙ্খধ্বনি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং যতক্ষণ না ঐ ধ্বনি শুনিতে পাইতেন, ততক্ষণ আহারে বসিতেন না। ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিলে বলিতেন—'এখন কি খাব গো, এখন শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের ভোগ হয় নাই, বৈকুণ্ঠে শঙ্খ বাজে নাই, এখন কি খাইতে আছে?' কলের যেদিন ছুটি থাকিত, সেদিন বাঁশী বাজিত না, বৃদ্ধাকে আহারে বসান সেদিন বিষম মুস্কিল হইত; হৃদয় এবং ঠাকুরকে ঐদিন নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া বৃদ্ধাকে আহার করাইতে হইত!

সে যাহা হউক, চতুর্থ দিবস সমাগত হইল, বৃদ্ধার অসুস্থতার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। সন্ধ্যার পরে ঠাকুর তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বজীবনের নানা কথার উত্থাপন ও গল্প করিয়া বৃদ্ধার মন আনন্দে পূর্ণ করিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় ঠাকুর তাঁহাকে শয়ন করাইয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন প্রভাত হইয়া ক্রমে আটটা বাজিয়া গেল, বৃদ্ধা তথাপি ঘরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন না। 'কালীর মা' নহবতের উপরের ঘরের দ্বারে যাইয়া অনেক ডাকাডাকি করিল, কিন্তু বৃদ্ধার সাড়া পাইল না। দ্বারে কান পাতিয়া শুনিতে পাইল, তাঁহার গলা হইতে কেমন একটা বিকৃত রব উত্থিত হইতেছে। তখন ভীত হইয়া সে, ঠাকুর ও হৃদয়কে ঐবিষয় নিবেদন করিল। হৃদয় যাইয়া কৌশলে বাহির হইতে দ্বারের অর্গল খুলিয়া দেখিল, বৃদ্ধা সংজ্ঞারহিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন কবিরাজী ঔষধ আনিয়া হৃদয় তাঁহার জিহ্বায় লাগাইয়া দিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিন্দু করিয়া দুগ্ধ ও গঙ্গাজল তাঁহাকে পান করাইতে লাগিল। তিন দিন ঐভাবে থাকিবার পরে বৃদ্ধার অন্তিম কাল উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহাকে অন্তর্জলি করা হইল এবং ঠাকুর ফুল, চন্দন ও তুলসী লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। পরে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে উহা করিতে নাই বলিয়া ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল তাঁহার নিয়োগে বৃদ্ধার দেহের সৎকার করিল। অনন্তর অশৌচ উত্তীর্ণ হইলে, ঠাকুরের

নির্দ্দেশে রামলালই বৃষোৎসর্গ করিয়া ঠাকুরের জননীর শ্রাদ্ধক্রিয়া যথারীতি সম্পাদন করিল।

মাতৃবিয়োগ হইলে, ঠাকুর শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সন্ন্যাস গ্রহণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অশৌচগ্রহণাদি কোন কার্য্য করেন নাই। জননীর পুত্রোচিত কোন কার্য্য করিলাম না ভাবিয়া একদিন তিনি তর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিবামাত্র ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গুলিসকল অসাড় ও অসংলগ্ন হইয়া সমস্ত জল হস্ত হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। বারম্বার চেষ্টা করিয়াও তখন তিনি ঐ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েন নাই এবং দুঃখিত অন্তরে ক্রন্দন করিয়া পরলোকগতা জননীকে নিজ অসামর্থ্য নিবেদন করিয়াছিলেন। পরে এক পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছিলেন, গলিত-কর্ম্ম অবস্থা হইলে অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে স্বভাবতঃ কর্ম্ম উঠিয়া যাইলে ঐরূপ হইয়া থাকে; শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিতে পারিলেও, তখন ঐরূপ ব্যক্তিকে দোষ স্পর্শে না।

মাতৃবিয়োগ হইলে ঠাকুরের তর্পণ করিতে যাইয়া তৎকরণে অপারগ হওয়া। তাঁহার গলিত-কর্ম্মাবস্থা।

ঠাকুরের মাতৃবিয়োগের একবৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছায় তাঁহার জীবনে একটী বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। সন ১২৮১ সালের চৈত্র মাসের মধ্যভাগে, ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে ঠাকুরের প্রাণে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে দেখিবার বাসনা উদয় হইয়াছিল। যোগারূঢ় ঠাকুর উহাতে শ্রীশ্রীমাতার ইঙ্গিত দেখিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত কেশব তখন কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে বেলঘ'রে নামক স্থানে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন মহাশয়ের উদ্যানবাটিকায় সশিষ্যে সাধনভজনে নিযুক্ত আছেন জানিতে পারিয়া, হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া ঐ উদ্যানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, তাঁহারা কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের গাড়ীতে করিয়া গমন করিয়াছিলেন এবং অপরাহ্নে আন্দাজ এক ঘটিকার সময় ঐ স্থানে পৌছিয়াছিলেন। ঠাকুরের পরিধানে সে দিন একখানি লালপেড়ে কাপড় মাত্র ছিল এবং

ঠাকুরের কেশব বাবুকে দেখিতে গমন।

উহার কোঁচার খুঁট্‌টী তাঁহার বাম স্কন্ধোপরি লম্বিত হইয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলিতেছিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া হৃদয় দেখিলেন, শ্রীযুক্ত কেশব অনুচরবর্গের সহিত উদ্যানমধ্যস্থ পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া আছেন। অগ্রসর হইয়া তিনি তাঁহাকে নিবেদন করিলেন 'আমার মাতুল হরিকথা ও হরিগুণগান শুনিতে বড় ভাল-বাসেন এবং উহা শ্রবণ করিতে করিতে মহাভাবে

বেলঘরিয়া উদ্যানে কেশব।

তাঁহার সমাধি হইয়া থাকে; আপনার নাম শুনিয়া আপনার মুখে ঈশ্বরগুণানুকীর্ত্তন শুনিতে তিনি এখানে আগমন করিয়াছেন, আদেশ পাইলে তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিব।' শ্রীযুত কেশব সম্মতিপ্রকাশ করিলে, হৃদয় গাড়ী হইতে ঠাকুরকে নামাইয়া সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কেশব প্রভৃতি সকলে ঠাকুরকে দেখিবার জন্য এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া এখন স্থির করিলেন, ইনি সামান্য ব্যক্তি মাত্র।

ঠাকুর কেশবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'বাবু তোমরা নাকি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া থাক। ঐ দর্শন কিরূপ, তাহা জানিতে বাসনা, সেজন্য তোমাদিগের নিকটে আসিয়াছি।' ঐরূপে সৎপ্রসঙ্গ আরব্ধ হইল। ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত কথার উত্তরে শ্রীযুত কেশব কি বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর যে, "কে জানে মন কালী কেমন—ষড়্‌দর্শনে দর্শন মিলে না"-রূপ রামপ্রসাদী সঙ্গীতটী গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, একথা আমরা হৃদয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুরের ভাবাবস্থা দেখিয়া তখন কেশব প্রভৃতি সকলে উহাকে আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা বলিয়া মনে করেন নাই; ভাবিয়াছিলেন, উহা একটা মিথ্যা ভাণ বা মস্তিষ্কের বিকার-প্রসূত। সে যাহা হউক, ঠাকুরের বাহ্যচৈতন্য আনয়নের জন্য হৃদয় তাঁহার কর্ণে এখন প্রণব শুনাইতে লাগিলেন এবং উহা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মুখমণ্ডল মধুর

কেশবের সহিত প্রথমালাপ।

হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঐরূপে অর্দ্ধবাহ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর

এখন গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়সকল সামান্য সামান্য দৃষ্টান্ত সহায়ে এমন সরল ভাষায় বুঝাইতে লাগিলেন যে, সকলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন! স্নানাহারের সময় অতীত হইয়া ক্রমে পুনরায় উপসনার সময় উপস্থিত হইতে বসিয়াছে, সেকথা কাহারও মনে হইল না! ঠাকুর তাঁহাদিগের ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "গরুর পালে অন্য কোন পশু আসিলে, তাহারা তাহাকে গুঁতাইতে যায়, কিন্তু গরু আসিলে গা চাটাচাটি করে—আমাদের আজ সেইরূপ হইয়াছে।" অনন্তর কেশবকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তোমার ল্যাজ্ খসিয়াছে!" শ্রীযুত কেশবের অনুচরবর্গ ঐ কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া যেন অসন্তুষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, ঠাকুর তখন ঐ কথার অর্থ বুঝাইয়া সকলকে মোহিত করিলেন। বলিলেন, "দেখ, ব্যাঙ্গাচির যতদিন ল্যাজ্ থাকে, ততদিন সে জলেই থাকে, স্থলে উঠিতে পারে না; কিন্তু ল্যাজ্ যখন খসিয়া পড়ে, তখন জলেও থাকিতে পারে, ড্যাঙ্গাতেও বিচরণ করিতে পারে—সেইরূপ মানুষের যতদিন অবিদ্যারূপ ল্যাজ্ থাকে, ততদিন সে সংসারজলেই কেবল থাকিতে পারে; ঐ ল্যাজ্ খসিয়া পড়িলে, সংসার এবং সচ্চিদানন্দ উভয় বিষয়েই ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে। কেশব তোমার মন এখন ঐরূপ হইয়াছে, উহা সংসারেও থাকিতে পারে এবং সচ্চিদানন্দেও যাইতে পারে!" ঐরূপে নানাপ্রসঙ্গে অনেক ক্ষণ অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুর ও কেশবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

ঠাকুরের দর্শন পাইবার পরে শ্রীযুত কেশবের মন তাঁহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, এখন হইতে তাঁহার দেহরক্ষার কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি প্রায়ই ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আগমন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তাঁহার কলিকাতার 'কমল কুটীর' নামক বাটীতেও লইয়া যাইয়া তাঁহার দিব্যসঙ্গ লাভে আপনাকে সৌভাগ্যবান্ বিবেচনা করিতেন। ঠাকুর ও কেশবের সম্বন্ধ, ক্রমে এত গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, পরস্পর পরস্পরকে কয়েক দিন

দেখিতে না পাইলে উভয়েই বিশেষ অভাব বোধ করিতেন; তখন ঠাকুর কলিকাতায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন অথবা শ্রীযুত কেশব দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের সময় প্রতি বৎসর ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া অথবা ঠাকুরকে লইয়া যাইয়া তাঁহার সহিত ঈশ্বর প্রসঙ্গে একদিন অতিবাহিত করাকে শ্রীযুত কেশব ঐ উৎসবের অঙ্গমধ্যে পরিগণিত করিতেন। ঐরূপে কতবার ঐ সময়ে তিনি জাহাজে করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বদলবলে দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক ঠাকুরকে উহাতে উঠাইয়া লইয়া, তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শুনিতে শুনিতে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া কেশবের আচরণ।

দক্ষিণেশ্বরে আগমনকালে শ্রীযুত কেশব শাস্ত্রীয় প্রথা স্মরণ করিয়া কখন রিক্তহস্তে আসিতেন না, ফলমূলাদি কিছু আনয়নপূর্ব্বক ঠাকুরের সম্মুখে রক্ষা করিতেন এবং অনুগত শিষ্যের ন্যায় তাঁহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইতেন। ঠাকুর রহস্য করিয়া তাঁহাকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, “কেশব তুমি এত লোককে বক্তৃতায় মুগ্ধ কর, আমাকে কিছু বল।” শ্রীযুত কেশব তাহাতে বিনীতভাবে উত্তর করিয়াছিলেন, ‘মহাশয়, আমি কি কামারের দোকানে ছুঁচ বেচিতে বসিব! আপনি বলুন, আমি শুনি। আপনার মুখের দুই চারিটী কথা লোককে বলিবামাত্র তাহারা মুগ্ধ হয়!’

ঠাকুরের কেশবকে—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ এবং ভাগবত, ভক্ত, ভগবান্, তিনে এক, একে তিন—বুঝান।

ঠাকুর একদিন কেশবকে দক্ষিণেশ্বরে বুঝাইয়াছিলেন যে, ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মশক্তির অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হয় এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সর্ব্বদা অভেদ ভাবে অবস্থিত। শ্রীযুত কেশব ঠাকুরের ঐ কথা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। অনন্তর ঠাকুর তাঁহাকে বলেন যে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির সম্বন্ধের ন্যায় ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্ রূপ তিন পদার্থ অভিন্ন বা নিত্যযুক্ত—ভাগবত ভক্ত, ভগবান্, তিনে এক, একে তিন। কেশব তাঁহার ঐ কথা বুঝিয়া উহাও অঙ্গীকার করিয়া লইলেন। অতঃপর

ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, 'গুরু, কৃষ্ণ, ও বৈষ্ণব তিনে এক, একে তিন—তোমাকে এখন একথা বুঝাইয়া দিতেছি।' কেশব তাহাতে কি চিন্তা করিয়া বলিতে পারি না, বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, 'মহাশয়, পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিক এখন আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না, অতএব বর্ত্তমান প্রসঙ্গ এখন আর উত্থাপনে প্রয়োজন নাই।' ঠাকুরও তাহাতে বলিলেন, "বেশ, বেশ এখন ঐ পর্য্যন্তই থাক্।" ঐরূপে পাশ্চাত্যভাবভাবিত শ্রীযুত কেশবের মন ঠাকুরের দিব্য সঙ্গলাভে জীবনে বিশেষালোক উপলব্ধি করিয়াছিল এবং বৈদিক ধর্ম্মের সার রহস্য দিন দিন বুঝিতে পারিয়া সাধনায় নিমগ্ন হইয়াছিল। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পর হইতে তাঁহার ধর্ম্মমত দিন দিন পরিবর্ত্তিত হওয়ায় ঐকথা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

আঘাত না পাইলে মানবমন সংসার হইতে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরকে নিজ সর্ব্বস্ব বলিয়া ধারণে সমর্থ হয় না। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার প্রায় তিন বৎসর পরে শ্রীযুত কেশব কুচবিহার প্রদেশের রাজার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া ঐরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐবিবাহ লইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে বিশেষান্দোলন উপস্থিত হইয়া উহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং শ্রীযুত কেশবের বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা আপনাদিগকে পৃথক করিয়া সাধারণ সমাজ নাম দিয়া অন্য এক নূতন সমাজের সৃষ্টি করিয়া বসে। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া সামাজিক সামান্য বিষয় লইয়া উভয় পক্ষীয়গণের ঐরূপ বিরোধ শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স সম্বন্ধীয় ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ঈশ্বরেচ্ছাধীন ব্যাপার। উহা-ঐ দিগকে কঠিন নিয়মে নিবদ্ধ করা চলে না; কেশব কেন ঐরূপ করিতে গিয়াছিল! কুচবিহার-বিবাহের কথা তুলিয়া ঠাকুরের নিকটে যদি কেহ শ্রীযুত কেশবের নিন্দাবাদ করিত, তাহা হইলে তিনি তাহাকে উত্তরে বলিতেন, কেশব উহাতে নিন্দনীয় এমন কি করিয়াছে? কেশব সংসারী, নিজ পুত্রকন্যাগণের যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহা করিবে না? সংসারী

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ কুচবিহার বিবাহ। ঐ কালে আঘাত পাইয়া কেশবের আধ্যাত্মিক গভীরতা লাভ। ঐবিবাহ সম্বন্ধে ঠাকুরের মত।

ব্যক্তি ধর্ম্মপথে থাকিয়া ঐরূপ করিলে নিন্দার কথা কি আছে? কেশব উহাতে ধর্ম্মহানিকর কিছুই করে নাই, পরন্তু পিতার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছে। ঠাকুর ঐরূপে সংসারধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিয়া কেশবকৃত ঐ ঘটনা নির্দ্দোষ বলিয়া সর্ব্বদা প্রতিপন্ন করিতেন। সে যাহা হউক, কুচবিহার-বিবাহ-রূপ ঘটনায় বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া শ্রীযুত কেশব যে আপনাতে আপনি ডুবিয়া দিন দিন আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঠাকুরের ভাব কেশব সম্পূর্ণরূপে ধরিতে পারেন নাই। ঠাকুরের সম্বন্ধে কেশবের দুই প্রকার আচরণ।

পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের বিশেষ ভালবাসা প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহাকে দেখিবার বহু অবসর পাইয়াও কিন্তু তাঁহাকে সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। কারণ দেখা যায়, একপক্ষে তিনি ঠাকুরকে জীবন্ত ধর্ম্মমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন—নিজ বাটীতে লইয়া যাইয়া তিনি যেথানে শয়ন, ভোজন, উপবেশন ও সমাজের কল্যাণ চিন্তা করিতেন সেই সকল স্থান ঠাকুরকে স্বয়ং দেখাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে বলিয়াছিলেন, যাহাতে ঐ সকল স্থানের কোথাও অবস্থান করিয়া তাঁহার মন ঈশ্বরকে ভুলিয়া সংসারচিন্তা না করে—আবার যেথানে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেন, ঠাকুরকে সেথানে লইয়া যাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন। * দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্ব্বক 'জয় বিধানের জয়' বলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আমাদিগের অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছে।

নববিধান ও ঠাকুরের মত।

সেইরূপ অন্যপক্ষে আবার দেখা গিয়াছে, তিনি ঠাকুরের 'সর্ব্ব ধর্ম্ম সত্য - যত মত, তত পথ'-রূপ বাক্য সম্যক্ লইতে না পারিয়া, নিজ বুদ্ধির সহায়ে সকল ধর্ম্মমত হইতে সারভাগ গ্রহণ এবং অসারভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক 'নববিধান' আখ্যা দিয়া এক নূতন মতের স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে উক্ত মতের আবির্ভাবে

* শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আমরা এই ঘটনা শুনিয়াছি।

হৃদয়ঙ্গম হয়, শ্রীযুত কেশব ঠাকুরের সর্ব্বধর্ম্মমত-সম্বন্ধীয় চরম মীমাংসাটীকে ঐরূপ আংশিক ভাবে প্রচার করিয়াছিলেন ।

পাশ্চাত্যবিদ্যা ও সভ্যতার প্রবল তরঙ্গ আসিয়া ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যা ও সামাজিক রীতি নীতি প্রভৃতির যখন আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে বসিল, তখন ভারতের প্রত্যেক মনীষী ব্যক্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রভৃতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশব প্রভৃতি মনীষিগণ বঙ্গদেশে যেমন ঐ চেষ্টায় জীবনপাত করিয়াছেন, ভারতের অন্যত্রও সেইরূপ অনেক মহাত্মার ঐরূপ করিবার কথা শ্রুতিগোচর হয়। কিন্তু ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের কেহই ঐবিষয়ের সম্পূর্ণ সমাধান করিয়া যাইতে পারেন নাই। ঠাকুর নিজ জীবনে ভারতের ধর্ম্মমতসমূহের সাধনা যথাযথ সম্পন্ন করিয়া এবং উহাদিগের প্রত্যেকে সাফল্য লাভ করিয়া বুঝাইলেন যে, ভারতের ধর্ম্ম ভারতের অবনতির কারণ নহে ; উহার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। দেখাইলেন যে, ঐ ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতের সমাজ, রীতি, নীতি, সভ্যতা প্রভৃতি সকল বিষয় দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাচীনকালে ভারতকে গৌরব-সম্পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এখনও ঐধর্ম্মের সেই জীবন্ত শক্তি রহিয়াছে এবং উহাকে সর্ব্বতোভাবে অবলম্বন করিয়া আমরা সকল বিষয়ে সচেষ্ট হইলে, তবেই সকল বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে পারিব, নতুবা নহে। ঐ ধর্ম্ম যে মানবকে কতদূর উদার করিতে পারে, তাহা ঠাকুর নিজ জীবনাদর্শে দেখাইয়া যাইলেন এবং পরে পাশ্চাত্যভাবভাবিত নিজ শিষ্যবর্গের বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর ঐ উদার ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক তাহাদিগকে সংসারের সকল কার্য্য কি ভাবে ধর্ম্মের সহায়করূপে সম্পন্ন করিতে হয় তৎশিক্ষা প্রদান করিয়া ভারতের পূর্ব্বোক্ত জাতীয় সমস্যার এক অপূর্ব্ব সমাধান করিয়া যাইলেন। সর্ব্ব ধর্ম্মমতের সাধনে সাফল্য লাভ করিয়া ঠাকুর যেমন পৃথিবীর আধ্যাত্মিক বিরোধ তিরোহিত করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন—ভারতীয় সকল

ভারতের জাতীয় সমস্যার ঠাকুরই সমাধান করিয়াছেন।

ধর্ম্মমতের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তেমনি আবার তিনি ভারতের ধর্ম্মবিরোধ নাশপূর্ব্বক কোন্ বিষয়াবলম্বনে আমাদিগের জাতিত্ব সর্ব্বকাল প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে থাকিবে, তদ্বিষয়েরও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

কেশবের দেহত্যাগে ঠাকুরের আচরণ।

সে যাহা হউক, শ্রীযুত কেশবের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা যে কি অদ্ভুত ছিল, তাহা আমরা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কেশবের শরীর-রক্ষার পরে ঠাকুরের আচরণে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি তিন দিন শয্যা ত্যাগ করিতে পারি নাই; মনে হইয়াছিল, যেন আমার একটা অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে!"

ঠাকুরের সঙ্কীর্ত্তনে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন।

কেশবের সহিত প্রথম পরিচয়ের পরে ঠাকুরের জীবনের অন্য একটী ঘটনার এখানে উল্লেখ করিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব। ঠাকুরের ঐ সময়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বজনমোহকর নগর-সঙ্কীর্ত্তন দেখিতে বাসনা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বা তখন তাঁহাকে নিম্নলিখিত ভাবে ঐ বিষয় দেখাইয়া পূর্ণমনোরথ করিয়াছিলেন—নিজ গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, পঞ্চবটীর দিক হইতে ঐ অদ্ভুত সঙ্কীর্ত্তন-তরঙ্গ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণেশ্বর-উদ্যানের প্রধান ফটকের দিকে প্রবাহিত হইতেছে এবং বৃক্ষান্তরালে লীন হইয়া যাইতেছে; দেখিলেন, নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বরপ্রেমে তন্ময় হইয়া ঐ জনতরঙ্গের মধ্যভাগে ধীরপদে আগমন করিতেছেন এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলে তাঁহার প্রেমে ভাবতন্ময় হইয়া কেহ বা অবশ ভাবে এবং কেহ বা উদ্দাম তাণ্ডবে আপনাপন অন্তরের উল্লাস প্রকাশ করিতেছে! এত জনতা হইয়াছে যে, মনে হইতেছে, লোকের যেন আর অন্ত নাই। ঐ অদ্ভুত সঙ্কীর্ত্তনদলের ভিতর কয়েকখানি মুখ ঠাকুরের স্মৃতিপটে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল এবং ঐ দর্শনের কিছুকাল পরে তাহাদিগকে নিজ ভক্তরূপে আগমন করিতে দেখিয়া,

ঠাকুর তাহাদিগের সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, পূর্ব্বজীবনে তাহারা শ্রীচৈতন্যদেবের সাঙ্গোপাঙ্গ ছিল!

সে যাহা হউক, ঐ দর্শনের কিছুকাল পরে ঠাকুর কামারপুকুরে এবং হৃদয়ের বাটী সিহড়গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থানের কয়েক ক্রোশ দূরে ফুলুই শ্যামবাজার নামক স্থান। সেখানে অনেক বৈষ্ণবের বসতি আছে এবং তাহারা নিত্য কীর্ত্তনাদি করিয়া ঐস্থানকে আনন্দপূর্ণ করে শুনিয়া, ঠাকুরের ঐস্থানে যাইয়া কীর্ত্তন শুনিতে অভিলাষ হয়। শ্যামবাজার গ্রামের পার্শ্বেই বেলটে নামক গ্রাম। ঐ গ্রামের শ্রীযুক্ত নটবর গোস্বামী ঠাকুরকে ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার বাটীতে পদধূলি দিবার জন্য নিমন্ত্রণও করিয়াছিলেন। ঠাকুর এখন হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাটীতে যাইয়া সাত দিন অবস্থানপূর্ব্বক শ্যামবাজারের বৈষ্ণব সকলের কীর্ত্তনানন্দ দর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত স্থানের শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র মল্লিক তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাকে নিজ বাটীতে কীর্ত্তনানন্দে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন! কীর্ত্তনকালে তাঁহার অপূর্ব্বভাব দেখিয়া বৈষ্ণবেরা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে এবং ক্রমে সর্ব্বত্র ঐকথা প্রচার হইয়া পড়ে। শুধু শ্যামবাজার গ্রামেই যে ঐ কথা প্রচার হইয়াছিল, তাহা নহে, কিন্তু রামজীবনপুর, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি চতুষ্পার্শ্বস্থ দূর দূরান্তর গ্রাম সকলেও ঐকথা রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। ক্রমে ঐ সকল গ্রাম হইতে দলে দলে সঙ্কীর্ত্তনদলসমূহ তাঁহার সহিত আনন্দ করিতে আগমনপূর্ব্বক শ্যামবাজারকে বিষম জনতাপূর্ণ করে এবং দিবারাত্র কীর্ত্তন চলিতে থাকে। ক্রমে রব উঠিয়া যায় যে একজন ভগবদ্ভক্ত একক্ষণে মৃত এবং পরক্ষণেই জীবিত হইয়া উঠিতেছে। তখন ঠাকুরকে দর্শনের জন্য লোকে গাছে চড়িয়া, ঘরের চালে উঠিয়া আহার-নিদ্রা ভুলিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। ঐরূপে তিন দিবারাত্র তথায় আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হইয়া লোকে ঠাকুরকে দেখিবার ও তাঁহার পদস্পর্শ করিবার জন্য যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ঠাকুর স্নানাহারের অবকাশ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই! পরে হৃদয় তাঁহাকে লইয়া লুকাইয়া

ঠাকুরের ফুলুইশ্যামবাজারে গমন ও অপূর্ব্ব কীর্ত্তনানন্দ। ঐ ঘটনার সময় নিরূপণ।

সিহড়ে পলাইয়া আসিলে, ঐ আনন্দমেলার অবসান হয়। শ্যামবাজার গ্রামের ঈশান চৌধুরী, নটবর গোস্বামী, ঈশান মল্লিক, শ্রীনাথ মল্লিক প্রভৃতি ব্যক্তি সকল ও তাঁহাদের বংশধরগণ ঐ ঘটনার কথা এখনও উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। কৃষ্ণগঞ্জের প্রসিদ্ধ খোলবাদক শ্রীযুত রাইচরণ দাসের সহিতও ঠাকুরের পরিচয় হইয়াছিল। ইঁহার খোলবাদন শুনিলেই ঠাকুরের ভাবাবেশ হইত। ঘটনাটীর পূর্ব্বোক্ত বিবরণ আমরা কিয়দংশ ঠাকুরের নিকটে এবং কিয়দংশ হৃদয়ের নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলাম এবং উহার সময় নিরূপণ করিতে নিম্নলিখিত ভাবে সক্ষম হইয়াছি—

বরানগর আলমবাজার নিবাসী ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ পাল কবিরাজ মহাশয়, কেশব বাবুর পরে ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন! তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুরকে যখন তিনি প্রথমবার দর্শন করিতে গমন করেন, তখন ঠাকুর ঐ ঘটনার পরে সিহড় হইতে অল্পদিন মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐ দিন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবুর নিকট ফুলুই শ্যামবাজারের ঘটনার কথা গল্প করিয়াছিলেন।

৺যোগানন্দ স্বামিজীর বাটী দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের অনতিদূরে ছিল। সেজন্য তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলে, ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তগণ সন ১২৮৫ সাল, ইংরাজী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার নিকটে আগমন করিতে আরম্ভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ সন ১২৮৭ সালে, ইংরাজী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। উহার অনতিকালপরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের প্রথম তারিখে শ্রীমতী জগদম্বা দাসী মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঐ ঘটনার ছয় মাস আন্দাজ পরে হৃদয় বুদ্ধিহীনতা-বশতঃ মথুর বাবুর স্বল্পবয়স্কা পৌত্রীর চরণ পূজা করে। কন্যার পিতা উহাতে তাহার অকল্যাণ আশঙ্কা করিয়া বিশেষ রুষ্ট হয়েন এবং হৃদয়কে কালীবাটীর কর্ম্ম হইতে চিরকালের জন্য অবসর প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে সাধকভাবপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

সন ১২৫৯ সাল হইতে ১২৮৭ সাল পর্য্যন্ত ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর সময় নিরূপণ।

ঠাকুরের জন্ম, সন ১২৪২ সাল, ৬ই ফাল্গুন, শুক্লপক্ষ, দ্বিতীয়ায়, ইংরাজী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ, ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাত্রি ৪টার সময় হইয়াছিল।

সন	খৃষ্টাব্দ	ঘটনা
১২৫৯	১৮৫২—১৮৫৩	কলিকাতারচতুষ্পাঠীতে আগমন। (ঠাকুরের বয়স ১৬ পূর্ণ হইয়া কয়েক মাস।)
১২৬০	১৮৫৩ – ১৮৫৪	চতুষ্পাঠীতে বাস, পাঠ ও পূজাদি।
১২৬১	১৮৫৪—১৮৫৫	ঐ ঐ
১২৬২	১৮৫৫—১৮৫৬	১৮ই জ্যৈষ্ঠ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা; বিষ্ণু-বিগ্রহ ভগ্ন হওয়া; ঠাকুরের বিষ্ণুঘরের পূজকের পদগ্রহণ; ১৪ই ভাদ্র, ইং ২৯শে আগষ্ট রাণীর দেবসেবার জন্য জমীদারী কেনা; কেনারাম ভট্টের নিকট ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহণ; রাম কুমারের মৃত্যু।
১২৬৩	১৮৫৬—১৮৫৭	ঠাকুরের ৺কালীর পূজকের পদ ও হৃদয়ের বিষ্ণুপূজকের পদ গ্রহণ; ঠাকুরের পাপপুরুষ দগ্ধ হওয়া ও গাত্রদাহ; ঠাকুরের প্রথম বার দেবোন্মত্তভাব ও দর্শন; ভূকৈলাসের বৈদ্যের ঔষধ সেবন।
১২৬৪	১৮৫৭—১৮৫৮	ঠাকুরের রাগানুগা পূজা দেখিয়া মথুরের আশ্চর্য্য হওয়া; ঠাকুরের রাণী রাসমণিকে দণ্ড দান; হলধারীর পূজকরূপে নিযুক্ত হওয়া ও ঠাকুরকে অভিশাপ; কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদের চিকিৎসা।
১২৬৫	১৮৫৮—১৮৫৯	আশ্বিন বা কার্ত্তিকে ঠাকুরের কামারপুকুর গমন; চণ্ড নামান।

১২৬৬	১৮৫৯—১৮৬০	বৈশাখ মাসে ঠাকুরের বিবাহ।
১২৬৭	১৮৬০—১৮৬১	ঠাকুরের দ্বিতীয় বার জয়রামবাটী গমন, পরে কলিকাতায় প্রত্যাগমন, মথুরের শিব ও কালীরূপে ঠাকুরকে দর্শন।
১২৬৮	১৮৬১—১৮৬২	১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাণী রাসমণির দেবোত্তর দলিলে সহি করা ও পরদিন মৃত্যু; ঠাকুরের দ্বিতীয়বার দেবোন্মত্ততা। ঠাকুরের জননীর বুড়ো শিবের নিকটে হত্যা দেওয়া। ব্রাহ্মণীর আগমন ও ঠাকুরের তন্ত্র সাধন আরম্ভ।
১২৬৯	১৮৬২—১৮৬৩	ঠাকুরের তন্ত্রসাধন।
১২৭০	১৮৬৩—১৮৬৪	ঠাকুরের তন্ত্রসাধন সম্পূর্ণ হওয়া; পদ্মলোচন পণ্ডিতের সহিত দেখা; মথুরের অন্নমেরু অনুষ্ঠান; ঠাকুরের জননীর গঙ্গাবাস করিতে আগমন।
১২৭১	১৮৬৪—১৮৬৫	জটাধারীর আগমন, ঠাকুরের বাৎসল্য ও মধুর ভাব সাধন; তোতাপুরীর আগমন ও ঠাকুরের সন্ন্যাসগ্রহণ।
১২৭২	১৮৬৫—১৮৬৬	হলধারীর কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ ও অক্ষয়ের পূজকের পদ গ্রহণ; শ্রীমৎ তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যাওয়া।
১২৭৩	১৮৬৬—১৮৬৭	ঠাকুরের ছয়মাস কাল অদ্বৈত ভূমিতে অবস্থান সম্পূর্ণ হওয়া; শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর কঠিন পীড়া আরোগ্য করা; পরে ঠাকুরের শারীরিক পীড়া ও মুসলমান ধর্ম্মসাধন।
১২৭৪	১৮৬৭—১৮৬৮	ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের কামারপুকুরে গমন; শ্রীশ্রীমার কামারপুকুরে আগমন; কার্ত্তিকমাসে ঠাকুরের কলিকাতায় প্রত্যাগমন ও মাঘমাসে তীর্থযাত্রা।

১২৭৫	১৮৬৮—১৮৬৯	জ্যৈষ্ঠ মাসে তীর্থ হইতে ফিরা; হৃদয়ের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু, দুর্গোৎসব ও দ্বিতীয় বার বিবাহ।
১২৭৬	১৮৬৯—১৮৭০	অক্ষয়ের বিবাহ ও মৃত্যু।
১২৭৭	১৮৭০—১৮৭১	ঠাকুরের মথুরের বাটীতে ও গুরুগৃহে গমন, কলুটোলায় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আসন গ্রহণ, পরে কাল্‌না নবদ্বীপ ও ভগবান দাস বাবাজীকে দর্শন।
১২৭৮	১৮৭১—১৮৭২	জুলাই মাসের ১৬ই তারিখে (১লা শ্রাবণ) মথুরের মৃত্যু। ফাল্গুন মাসে রাত্রি ৯টার সময় শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন।
১২৭৯	১৮৭২—১৮৭৩	শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে বাস।
১২৮০	১৮৭৩—১৮৭৪	জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরের ৺ষোড়শী-পূজা, শ্রীশ্রীমার গৌরী পণ্ডিতকে দর্শন ও আন্দাজ আশ্বিনে কামারপুকুরে প্রত্যাগমন; অগ্রহায়ণে রামেশ্বরের মৃত্যু।
১২৮১	১৮৭৪—১৮৭৫	শ্রীশ্রীমার দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আসা; শম্ভু মল্লিকের ঘর করিয়া দেওয়া, চানকে ৺অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা। ঠাকুরের শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনকে প্রথমবার দেখা।
১২৮২	১৮৭৫—১৮৭৬	পীড়িতা হইয়া শ্রীশ্রীমার পিত্রালয়ে গমন; ঠাকুরের জননীর মৃত্যু।
১২৮৩	১৮৭৬—১৮৭৭	কেশবের সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।
১২৮৪	১৮৭৭—১৮৭৮	ঐ ঐ
১২৮৫	১৮৭৮—১৮৭৯	ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তগণের আগমন আরম্ভ।
১২৮৬	১৮৭৯—১৮৮০	শ্রীবিবেকানন্দস্বামীর ঠাকুরের নিকট আগমন।
১২৮৭	১৮৮০—১৮৮১	শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর মৃত্যু; হৃদয়ের পদচ্যুতি ও দক্ষিণেশ্বর হইতে অন্যত্র গমন।